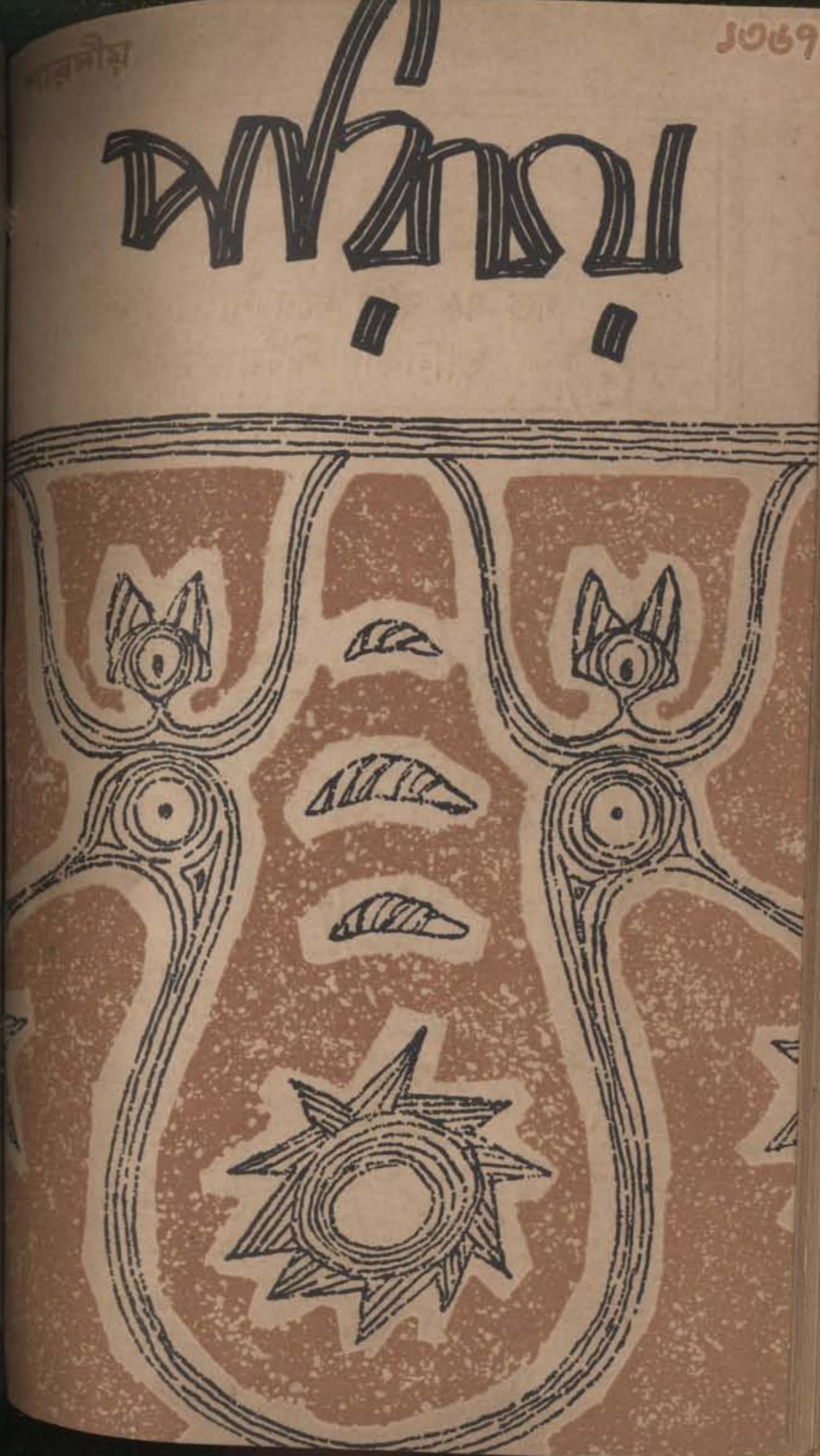
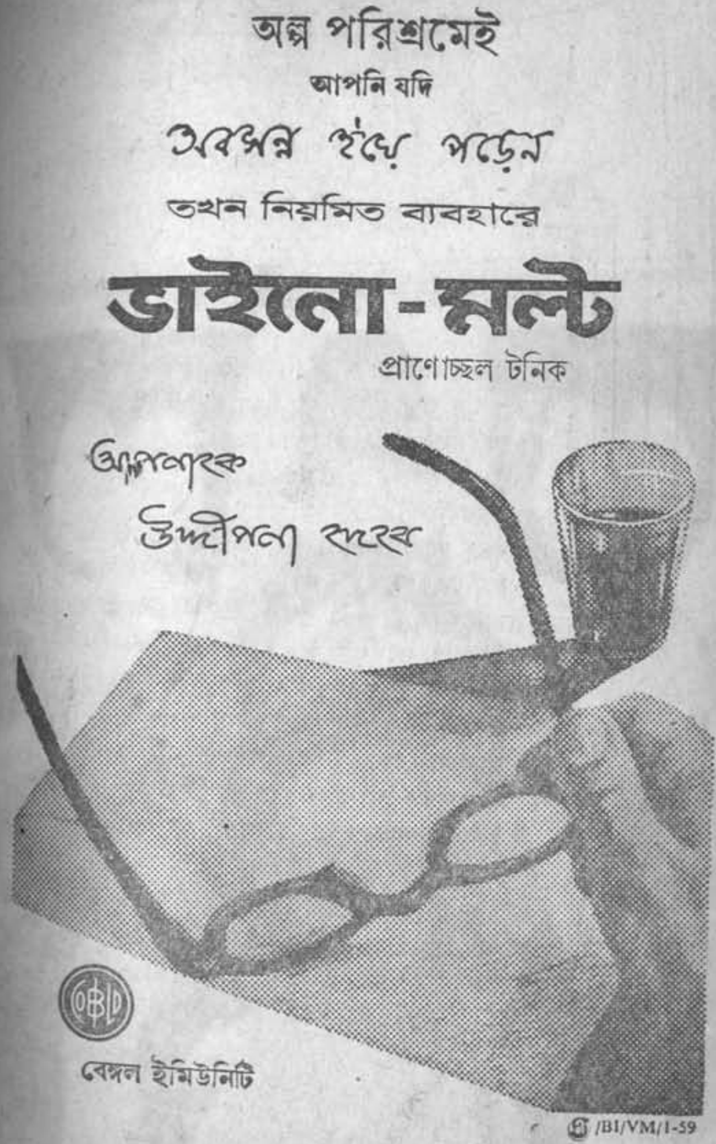


দাম : এক টাকা পঁচিশ ন.প.




ব্যালে
THE RALEIGH
গত ৭৫ বছর ধরে সাইকেলের
তালিকায় শীর্ষতম নাম
১৮৮৬ সাল থেকেই র‍্যালের
শ্রেষ্ঠত্ব সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ
মানুষের দ্বারা পরীক্ষিত ও স্বীকৃত।
গত ৭৫ বছর ধ'রে নানা রকম
পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে র‍্যালে
ক্রমাগতই উন্নততর হ'য়ে উঠেছে।
আজ তাই আগের তুলনায়
সব চাইতে উন্নত যে র‍্যালে আপনি
পাচ্ছেন তা' গুণে অতুলনীয়
এবং কাজের দিক থেকে
সম্পূর্ণ নির্ঝঞ্ঝাট।
র‍্যালে কেনা সব সময়ই লাভজনক
SEN RALEIGH
অধিকতর আরামের জন্য
উইট্‌কপ
সীট লাগান
সেন - র‍্যালে


অল্প পরিশ্রমেই
আপনি যদি
অবসন্ন হ'য়ে পড়েন
তখন নিয়মিত ব্যবহারে
ভাইনো-মল্ট
প্রাণোচ্ছল টনিক
আপনাকে
উদ্দীপনা দেবে
বেঙ্গল ইমিউনিটি
/BI/VM/1-59

সূচীপত্র

ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭১ ; ১৮৮২

শারদীয় সংখ্যা

প্রবন্ধ

কবিতা

প্রবন্ধ

গল্প

চিত্র : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্কেচ্ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী

বর্ণলিপি ও অঙ্গসজ্জা : প্রকাশ কর্মকার, সুধীর মৈত্র, সুবোধ দাশগুপ্ত, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক

গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সত্য-গুপ্ত কর্তৃক গণশক্তি প্রিণ্টার্স (প্রাঃ) লিঃ ৩৩ আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত



অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স মু দ্র-মা নু ষ
* পাঁচ টাকা *

বই কিনতে
মিত্রালয়ে
আসুন

ইন্দ্রজিতের
মা ন স-সু ন্দ রী
* চার টাকা *

'একটি সুন্দরী রমণীর অঙ্গ মানুষ যে আদর এবং আবেগ দিয়ে স্পর্শ করে, কবি এবং শিল্পী ঠিক সেই আবেগ দিয়ে তাঁর মানস-মূর্তিকে গড়ে তোলেন।.........আমি এদের ভালবাসি, এরাই আমার মানস-সুন্দরী।'

ভো ল গা থে কে গ ঙ্গা
—দ্বিতীয় পর্ব—
* সাড়ে তিন টাকা *

সুভাষ সরকারের
গোড়ার কবিতা
(উপন্যাস)
জীবনের গভীরতার উপলব্ধির তীব্রতায় এ উপন্যাস যুগান্তর এনে দেবার দাবি নিয়ে এসেছে! সাম্প্রতিক প্রকাশনা।
* সাড়ে পাঁচ টাকা *

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের
ডা ক্তা রে র দু নি য়া
* ছয় টাকা *
অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চোখে দেখা মানুষের মনের ছবি উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক। অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠকসমাজে আলোড়ন এনেছে।

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্যের
রূ প সী ন গ রী
সহর কলকাতার ঘোমটাখোলা রূপ।
* সাড়ে পাঁচ টাকা *

চ র্যা প দে র হ রি ণী
* তিন টাকা *
বইটির প্রতিটি আখ্যায়িকা প্রথম প্রকাশকালে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়বস্তু হইয়াছিল। বাংলা কথাসাহিত্যে বইটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বই কিনতে
মিত্রালয়ে
আসুন

বিমল করের
নি শি গ ন্ধ
—দ্বিতীয় মুদ্রণ—
* সাড়ে তিন টাকা *
উপন্যাসটি সম্বন্ধে লেখক লিখেছেন :......আর এককথা, এই কাহিনীতে প্রেম বিবেচ্যবিষয় হিসেবে গৃহীত—লভ্য বস্তু হিসেবে নয়।

মিত্রালয় : ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ১২ : ফোন ৩৪-২৫৬৩



রূপকথার রাজকুমারী



মুন্নি যখন আমার নতুন তৈরী করা ফ্রকটা পরলো তখন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। ফ্রকটাও আমি অনেক যত্ন করে তৈরী করেছিলাম—সাদা ধব্‌ধবে জামার ওপর ছোট্ট নীল ফুলের পাড় দিয়ে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে মুন্নি আয়নার সামনে গেলো। ঘুরে ফিরে চারিদিক থেকে মুন্নি তার ফ্রকটা দেখলো তারপর ছুটলো তার বন্ধুদের দেখাতে তার নতুন জামা, তক্ষুনি বিকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করতে পেরে। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম ওকে, "মুন্নি, মুন্নি নতুন ফ্রকটা খুলে যা—ওটা ময়লা হয়ে যাবে যে ওটা পরে বিয়ের নেমন্তন্নে যাবিনা?" মুন্নি ততক্ষণে বাড়ীর থেকে বহুদূরে। নতুন ফ্রকটা পরে মুন্নিকে দেখে মনে হলো আমার যেন কোন এক পরীর দেশের রাজকন্যা, ওকে সত্যিই মানিয়েছিলো। সত্যিই এত সুন্দর লাগছিল। একবার ভাবলাম ডাকি ওকে কারণ ফ্রকটা ওকে পরতে দিয়েছিলাম শুধু ঠিক হয় কিনা দেখার জন্য। ইতিমধ্যে রান্না ঘরের থেকে কি যেন একটা পোড়ার গন্ধ পেয়ে আমি ওঠে গেলাম, তারপর আর আমার খেয়ালই ছিলনা। আমার হুঁস হল যখন রাধার গলা শুনলাম দরজার কাছে। রাধাকে দেখে খুব খুশী হলাম এবং ওকে নিয়ে যখন বসার ঘরে এলাম, দেখি মুন্নি দরজায় দাঁড়িয়ে।

ওকে দেখেই আমি রেগে আগুন—ফ্রকটা একদম নোংরা করে ফেলেছে—বিয়েতে যাওয়ার সময় পরবেই বা কি?

S/P. 3 A-50 BG



"ফ্রকটার কি ছিরিই করেছো, এখন পরবে কি বিকালে" বলে আমি ওকে মারতে যাচ্ছিলাম এখন সময় রাধা মুন্নিকে সরিয়ে নিয়ে আমায় ধম্‌কালো—" তোর মাথা খারাপ হল নাকি, এতটুকু বাচ্চাকে মারছিস।" মুন্নি বাঁচলো আর ফ্রকটা খুলে রাখলো তাড়াতাড়ি।

ফ্রকটা নিয়ে আমি কলতলায় পরিষ্কার করতে এলাম এবং যখন ফ্রকটাকে আছড়াতে যাচ্ছি, রাধা বললো" মেয়ের ওপর রাগটা কি ফ্রকের ওপর ফলাবি?"

"এটা না কাচলে ও পরবেটা কি? অন্য ভাল জামা যে আর নেই" আমি বললাম। রাধা বললো," কিন্তু ওটা আছড়ালে ছিঁড়ে যাবে যে।"



আমি বললাম "না আছড়ালেই বা কাচবো কি করে।" "আছড়াবার কি দরকার—ভাল সাবান ব্যবহার করলেই হয়। আমি তো সানলাইট ব্যবহার করি।" "কিন্তু সানলাইট কি সত্যিই এত ভাল সাবান?" "সত্যিই সানলাইটে জামাকাপড় সাদা ও উজ্জ্বল হয়। এবং এটা এত বিশুদ্ধ যে এতে কাপড়ের কিছু ক্ষতি হয়না।"

"কিন্তু সানলাইটে খরচা বেশী পড়েনা?" রাধা তো হেসেই আকুল—" সে কিরে, ভেবে দ্যাখ্ একটু ঘষলেই সানলাইটে এত ফেনা হয় যে একগাদা জামাকাপড় কাচা চলে অল্প সময়েই সাদা ধব্‌ধবে করে! এছাড়া পিটে আছড়ে কাপড়ের সর্ব্বনাশও হয়না, নিজেরও ঝামেলা বাঁচে কতো—এর পরেও তুই বলবি খরচা বেশী।"

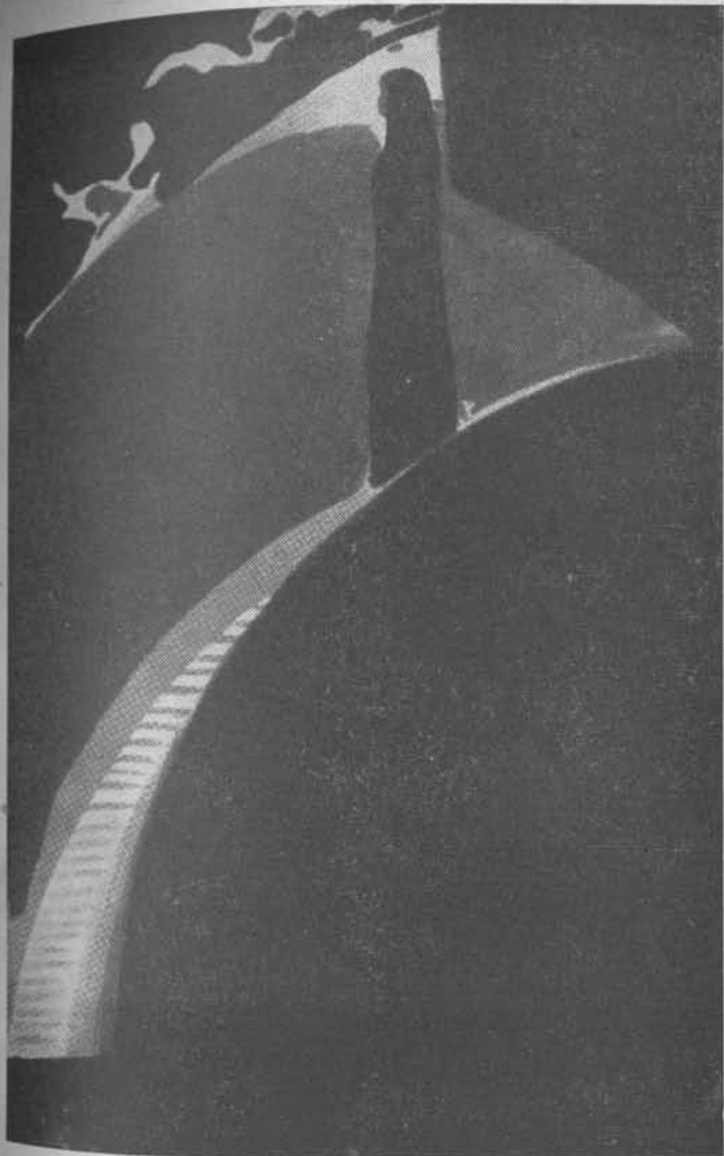
তক্ষুনি আমি একটা সানলাইট সাবান আনালাম এবং কাচা শুরু করতেই ফ্রকটা ফেনার স্তূপে ভরে গেলো আর দেখতে দেখতে সাদা ধব্‌ধবে হলো। সন্ধ্যেবেলা নতুন কাচা ফ্রকটা পরে মুন্নিকে সত্যিই পরীদের গল্পের রাজকুমারীর মত লাগছিলো। আমি মুন্নিকে কপালে কাজলের টীপ্ পরিয়ে দিলাম।



S/P. 3 B-50 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিঃ, বোম্বাই





বন্দিনী

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর



সাতভাই চম্পা — গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরিচয়

৩০শ বর্ষ ॥ ২য়-৩য় সংখ্যা
ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬৭; ১৮৮২

অবিস্মরণীয় ভ্রমণ কাহিনী

মুজফ্ফর আহ্মদ

[১৯২০ সালে তেইশ বছর বয়সে রফীক আহ্মদ ভ্রমণে বার হয়েছিলেন। এখন তাঁর বয়স তেষট্টি বছর। চল্লিশ বছর পরে তাঁর মুখে তাঁর ভ্রমণের কথা শুনে আমি তা বাঙলায় টুকেছি, তিনি বলেছেন উর্দুতে। এটা অবশ্য পুরোপুরি অনুলিখন নয়। এমনভাবে তাঁর কথাগুলি টুকেছি যেন দরকার হলে আমার নিজের ভাষায় আমি একটি লেখা দাঁড় করাতে পারি। এই বিষয়ে কিছু লেখার আমার পক্ষে অন্য একটি সুবিধাও আছে। রফীক আহ্মদের ভ্রমণের সাথীদের অনেকে পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে আমার সহকর্মী ছিলেন। তাঁদের দুজনের সঙ্গে আমি জেলও খেটেছি। তাঁদের মুখে একাধিক বার তাঁদের ভ্রমণের কথা আমি শুনেছি। তখন-অবশ্য কোনও লিখিত নোট আমি রাখি নি। তাই, রফীক আহ্মদের মুখে আবারও কথাগুলি শুনে নিয়ে আমি লিখে রাখার চেষ্টা করেছি। আগে যা কবার শুনেছি তা আবার নূতন করে শোনার জন্যে আমি তাঁকে কষ্ট দিয়ে গত জুলাই মাসে কলকাতায় আনিয়েছিলাম।

রফীক আহ্মদের ভ্রমণের সাথীদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেছেন, কেউ কেউ রাজনীতি ছেড়েছেন, আবার দেশ ভাগ হওয়ার সময়ে প্রায় সকলেই পাকিস্তানের ভাগে পড়েছেন। একমাত্র রফীক আহ্মদ বর্তমান ভারতের ভাগে পড়েছেন। তাঁর বাড়ি ভোপাল শহরে।

চল্লিশ বছর পরে স্মৃতিচারণ করলে তারিখের ভুল হওয়া অনিবার্য। বিদেশের দুর্গম এলাকার পথঘাট মনে রাখা প্রায় অসম্ভব। সোবিয়েৎ ভূমির মধ্য এশীয় অঞ্চলে আজ যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে তাতে পুরানো জায়গাগুলি চেনাও মুশ্কিল। এই সব দিক থেকে ভ্রমণ বৃত্তান্তে কিছু ত্রুটি থাকবে তবুও এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত অত্যন্ত মূল্যবান। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার প্রথম যুগের অনেক খবর এতে পাওয়া যাবে।

ব্যক্তির মূল্যায়ণে কোথাও রফীক আহ্‌মদের সঙ্গে আমার মতের গরমিল হলে, কিংবা তিনি কোনও কথা বলেন নি মনে হলে আমি নিজের কথা এই বন্ধনীর [ ] ভিতরে বলেছি। এই বৃত্তান্ত লিখতে গিয়ে আমি রফীক আহ্‌মদকে উত্তমপুরুষরূপে ব্যবহার করেছি। —লেখক]

যাত্রার শুরু

১৯২০ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে দিল্লীতে একটা খিলাফত কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হয়। আমার বড় ভাই কবীর আহ্‌মদ আর আমি এই কনফারেন্সে যোগ দেওয়ার জন্যে ভোপাল হতে দিল্লী যাই। আমাদের বাড়ি ভোপাল শহরে। এই সম্মেলনে হিজরতের ওপরেই বেশী বক্তৃতা হয়। পাঞ্জাবের মাওলানা সানাউল্লা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আরও কে কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা এখন ভালো মনে নেই। হিজরত আন্দোলনের বড় প্রবক্তা ছিলেন গোলাম মুহম্মদ নামে একজন। তিনি সম্ভবত অমৃতসরের বাসিন্দা ছিলেন। শুনেছি এই আন্দোলনে তলে তলে মাওলানা আবুল কালাম আজাদেরও সমর্থন ছিল।

হিজরত শব্দের অর্থ ক্রমাগত অত্যাচারের হাত হতে দেশত্যাগ করা পলায়ন। যাঁরা হিজরতের প্রচার করছিলেন তাঁরা বলছিলেন ইংরেজের অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া গতি নেই। তুরস্কের ব্যাপারে ব্রিটিশ যত ওয়াদা করেছিল তার কোনো ওয়াদা পালিত হয় নি। এই হতাশা হতেই হিজরত আন্দোলনের শুরু হয়। এই সময়ে আফগানিস্তানের বাদশাহ্ আমানুল্লা ঘোষণা করলেন যে যাঁরা ভারতবর্ষ হতে হিজরত করবেন আফগানিস্তানে তাঁদের স্বাগত জানানো হবে। বাদশাহের মনে ধারণা জন্মেছিল যে বড় বড় মগজওয়ালা লোকেরা হিজরৎ করবেন। তাঁর দেশে মগজওয়ালা লোকের দরকার ছিল।

আমরা দুভাই স্থির করে ফেললাম, আর বাড়ি ফেরা নয়,—দিল্লী হতে আমরা আফগানিস্তানের দিকে রওয়ানা হয়ে যাব। কন্‌ফারেন্সে মাস্টার লাল মুহম্মদ নামে গুজরানওয়ালার এক জনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তিনি বললেন, আমাদের যাওয়ার সব ব্যবস্থা তিনি করে দিবেন। প্রথমে আমরা তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ি গেলাম। পেশোয়ারের এক জনের নামে একখানা পত্র দিয়ে তিনি আমাদের বিদায় দিলেন। কিন্তু পেশোয়ারে

পৌঁছে ওই ঠিকানায় ওই নামের কোনও লোকের পাত্তাই পাওয়া গেল না। ওই নামের কোনও লোক ওখানে কোনও সময়ে ছিলেন বলেও স্থানীয় লোকেরা খবর দিতে পারলেন না। সৌভাগ্যক্রমে হাজী জান মুহম্মদ নামে একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়ে যায়। তিনি আমাদের সব রকমের সাহায্য করলেন। পথঘাট সম্বন্ধেও উপদেশ দিলেন। আমরা আবার রওয়ানা হলাম। জমরুদে পৌঁছানোর পরে ব্রিটিশ সরকারের তহ্‌সীলদার আমাদের নানান রকমের প্রশ্ন করলেন। আমার বড় ভাই কবীর আহ্‌মদ যখন জানালেন যে তিনি ভোপাল রাজ্য সরকারের একজন কর্মচারী তখন তাঁকে আর যেতে দেওয়া হল না। আমায় এগিয়ে যাওয়ার হুকুম তিনি দিলেন। একলাই যাত্রা করলাম আমি। আমার পকেটে তখন মাত্র ছয়টি টাকা ছিল। পায়ে হেঁটেই যাচ্ছিলাম। লাণ্ডিকোটাল হয়ে প্রথম আফগান এলাকা ডাক্কায় পৌঁছাই। এখানে কোনও রকম বাধার সম্মুখীন আমায় হতে হল না। এগিয়ে গেলাম জালালাবাদের পথে। জেনারেল নাদির খান তখন জালালাবাদের ভার নিয়ে ছিলেন। [পরে তিনি বাচ্চা-ইসকাকে পরাজিত ক'রে আফগানিস্তানের বাদ্‌শাহ্ হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র মুহম্মদ জহীর শাহ্ এখন আফগানিস্তানের বাদ্‌শাহ্।] জালালাবাদে পৌঁছানোর পরে জেনারেল নাদির খানের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমার খাওয়া ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন। পরে যখন কাবুলের পথে রওয়ানা হলাম তিনি আমার জন্যে ঘোড়ারও ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

কাবুলে

মে মাস ছিল। একদিন অপরাহ্ন চারটার সময় আমি কাবুলে পৌঁছে গেলাম। আমি যে কাবুলের পথে রওয়ানা হয়েছিলাম এ খবর নিশ্চয় বাদশাহ আমানুল্লার জানা ছিল। আমার কাবুলে পৌঁছানোর পরক্ষণেই তাঁর সামনে আমায় হাজির করা হল। বেশী কিছু কথা হল না। হিজরতকারীদের ভিতরে আমিই প্রথম কাবুলে পৌঁছেছিলাম। আমার মনে হয় কি ধরনের লোক আফগানিস্তানে আসছেন তিনি তা বুঝতে চেয়েছিলেন। যাক, আমার জন্যে সব ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে তিনি হুকুম দিলেন।

সে দিনই সন্ধ্যার পরে আরও চার জন কাবুলে পৌছে গেলেন। সকলেই শিক্ষিত যুবক। তাদের নাম ১। মুহম্মদ আকবর খান; তিনি ছিলেন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের হাজারা জিলার বাশিন্দা, পেশাওয়ার ইস্‌লামীয়া কলেজে বি. এ. পড়ছিলেন। ২। গওহর রহমান খান, হাজারা জিলার হরিপুরের নিকটবর্তী দরবেশ গ্রামের বাশিন্দা। ৩। সুলতান মাহ্‌মুদ; হাজারা জিলার হরিপুরের বাশিন্দা। ৪। মির্জা মুহম্মদ আকবর শাহ্‌; পেশাওর জিলার নৌ-শহ্‌রার বাশিন্দা। এই চার জন বন্ধুকেও বাদশাহের সামনে হাজির করা হয়েছিল কিনা তা আমি জানতে চাই নি। আমি ছিলাম ভোপাল রাজ্যের লোক, আর তাঁরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের। ঘনিষ্ঠতা হতে সময় লেগেছিল। শুরুর দিকে আমরা খানিকটা ষড়যন্ত্রকারীর পদ্ধতি মেনে চলতাম। কার মনে কি আছে, কে জানে?

আমাদের ক'জনের নির্বিঘ্নে কাবুলে পৌছানোর খবর ভারতের কাগজে ছাপা হতেই দেশ হতে দলে দলে লোক আফগানিস্তানের দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁদের অনেকে জাককা পৌছেছেন এই খবর পেয়েই আফগান সরকার আমাদের জব্‌লুস্‌ সিরাজে পাঠিয়ে দিলেন,—বললেন নূতন লোকদের জন্যে জায়গা চাই। জব্‌লুস্‌ সিরাজ কাবুল হতে ক'মাইল দূরে তা জানিনে, তবে হেঁটে যেতে প্রায় দুদিন লাগে। একটি কথা বলতে ভুলে গেছি। কাবুলে কয়েক জন নির্বাসিত ভারতীয়ের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল। তাঁরা আমাদের চা খেতে নিমন্ত্রণও করেছিলেন। এই নির্বাসিতদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা ওবায়দুল্লা সিন্ধী ও আরও কয়েক জন। তা ছাড়া ছিলেন আবদুর রব পেশোয়ারী ও ত্রিমূল আচারিয়া (আচার্য)। আবদুর রব আমাদের রুশ দেশে যাওয়ার জন্যে বিশেষভাবে উপদেশ দিলেন। বললেন, সেদেশে বিপ্লব হয়ে গেছে, ক্ষমতা দখল করেছে শ্রমজীবী জনগণ। আমরা সেদেশে গেলে অনেক কিছু দেখতে ও শিখতে পারব। আমরা ক'জন তো তখনই রাজী হয়ে গেলাম। সেই থেকে আমাদের ক'জনের চিন্তা হয়ে দাঁড়াল কখন আমরা সেই বিপ্লবের দেশে পৌছাব।

হিজরতকারীদের ভিতরে নানান ধরনের লোক ছিলেন। কে কিছু লোক তো সত্য সত্যই ধর্মোন্মাদনার বশে গিয়েছিলেন। তাঁরা

প্রচারকারীদের প্রচারে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। যুবকদের ভিতরে বেশীরভাগ ভেবেছিলেন ইংরেজরা যখন ওয়াদা রাখলেন না তখন তাঁরাই আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে তুর্কিতে গিয়ে তুর্কির হয়ে লড়াই করবেন। আর, অল্প সংখ্যক যুবকের চিন্তায় ছিল যে তাঁরা দেশের বাইরে চলে গিয়ে বাইরে থেকে পন্থা বা'র করবেন কি করে ভারতে ইংরেজের ওপরে আঘাত হানা যায়। হিজরতকারীদের সঙ্গ নেওয়া ছিল তাঁদের পক্ষে পরম সুযোগ।

ক্রমে জব্‌লুস্‌ সিরাজে ১৮০ জন হিজরতকারী জমায়েৎ হলেন। আবদুর রব আফগান সরকারের নিকট হতে অনুমতি চেয়েছিলেন যে কয়েক জন হিজরতকারীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি সোবিয়েৎ দেশে যেতে চান। সেই অনুমতি পাওয়া গেল না। অবশ্য, আবদুর রব ও তাঁর সাথীদের যাওয়ার পথে কোনও বাধা ছিল না। এদিকে জব্‌লুস্‌ সিরাজে আমাদের ভিতরে একটি আলোচনা শুরু হয়ে গেল। সেই আলোচনা এই ধরনের। বাদশাহ্‌ আমানুল্লা লড়াই করার কোনও সুযোগ আমাদের দিবেন না। আমাদের আফগানিস্তানে আসার সুযোগ নিয়ে তিনি ভারতের ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ওপরে একটি চাপ সৃষ্টি করতে চান মাত্র। তাঁর উদ্দেশ্য, খুব ভালো শর্তে ইংরেজের সহিত সন্ধি করে নেওয়া। ১৯১৯ সালের আফগান যুদ্ধের পরে এই সময়ে মসৌরিতে সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনা চলেছিল।

জব্‌লুস্‌ সিরাজে আমাদের ভিতরে যে এই জাতীয় আলোচনা চলেছিল সে-খবর আফ্‌গান সরকার পেয়ে গিয়েছিলেন। তাই, এরপরে ওখানে লোক পাঠানো সরকার বন্ধ করে দিলেন। আমরা কয়েকজন সোবিয়েৎ দেশে যাওয়ার জন্যে বিচলিত হয়ে উঠেছিলাম। আমাদের সম্বন্ধে আবদুর রবের দরখাস্ত আফগান সরকার না-মঞ্জুর করেছিলেন। এই কারণে অন্যদের সঙ্গে আমরাও বাদশাহের নিকটে দরখাস্ত করলাম যে আমাদের অবিলম্বে আনাতোলিয়া (তুরস্কে) যেতে দেওয়া হোক। আমাদের দরখাস্ত নিয়ে গড়িমসি করা হচ্ছিল। তখন আমরা লিখলাম বাদশাহ্‌ যদি আমাদের অনুমতি না দেন তবে আমরা বিনা-অনুমতিতেই রওয়ানা হয়ে যাব। রাস্তার পাশে তোপ বসিয়ে আমাদের ভয় দেখানো হল। কিন্তু আমরা কিছুতেই বাগ মানলাম না। শেষ পর্যন্ত আমরা যাওয়ার অনুমতি পেলাম।

তিরমিজের পথে

জব্‌লুস্ সিরাজে যে আমরা ১৮০ জন হিজরতকারী ছিলাম তাকে দুটি কাফেলায় (যাত্রীদলে) ভাগ করা হল। প্রথম কাফেলায় ছিলাম আমরা ৮০ জন। হাজারা জিলার মুহম্মদ আকবর খান আমাদের নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁর নাম আমি আগে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় কাফেলায় শেষ পর্যন্ত কজন ছিলেন তা জানিনে, তবে তার নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন পেশোয়ারের মুহম্মদ আকবর জান। তিনি লোক তেমন ভালো ছিলেন না। যাক, আমাদের কাফেলার নেতা মুহম্মদ আকবর খানের অধিনায়কত্বে আমরা ৮০ জন একদিন রওনা হলাম। আমাদের মধ্যে মীর আবদুল মজীদ, ফিরোজুদ্দীন মনসুর, শওকত উস্‌মানী, মস্‌উদ আলী শাহ্, গওহর রহমান খান, মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ্, আবদুল কাদির সোহ্‌রাই, ফেদা আলী ও গোলাম মুহম্মদ প্রভৃতি ছিলেন। পথের একটি ঘটনার কথা এখানে বলব। মজার-ই-শরীফে পৌছে একদিন রাত্রে আমরা একটি সরাইতে ছিলাম। সেই সময়ে একজন তুর্কি এসে আমাদের নিকটে প্রস্তাব করেন যে তিনিও আমাদের কাফেলার সঙ্গে যেতে চান। সেদিন আমাদের সঙ্গের সরফরাজ নামক একজনকে পাওয়া যাচ্ছিল না। তার জায়গায় এই তুর্কিকেই সরফরাজ নাম দিয়ে আমরা সঙ্গে নিয়ে নিলাম। তাঁকে সঙ্গে নেওয়াতে যে আমাদের উপকার হয়েছিল সে-কথা পরে বলা হবে। তাঁকে আমরা আমাদের মতো পোশাকও পরিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা হচ্ছে এই : তিনি এক সময়ে তুরস্কের সৈন্য ছিলেন। জারের আমলে কখন কিভাবে রুশ এলাকায় ধরা পড়ে সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। বিপ্লবের পরে তিনি মুক্তি পান। তবে, তুরস্কে ফিরে যেতে তখন তাঁর সাহসে কুলায় নি কিংবা যাওয়ার সুযোগ পান নি। তারপরে তিনি আফগানিস্তানের মজার-ই-শরীফে এসে থাকছিলেন। তুর্কি তাঁর মাতৃভাষা। দীর্ঘকাল সাইবেরিয়ায় থাকার কারণে রুশ ভাষাও কিছু শিখেছিলেন, আর আফগানিস্তানে বাস করে পারসী ভাষাও আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।

হিন্দুকুশ অতিক্রম করা কিছু সুখের পথচলা নয়। যদি প্রতিদিন ডায়েরী লিখে রাখতাম তবে বিস্তৃতভাবে বলতে পারতাম কী দুঃখের পথ

ছিল। তখনও স্থানে স্থানে বরফ গলে নি। ঠাণ্ডা ছিল খুবই। হিন্দুকুশের মতো পাহাড়ের পথের দুর্গমতা সহজেই অনুমেয়। এই পথেরও একদিন শেষ হল। আমরা নীচে নামলাম। আমুদরিয়া সেখানে পাহাড় হতে নেমে খুবই চওড়া হয়েছে। পার হতে পারলেই তিরমিজ—সোবিয়েৎ দেশের এলাকা। অনেক বালি ও কাদা ডিঙিয়ে আমরা নৌকায় নদী পার হলাম। আমাদের অনেকের জুতো হারাল, অনেকের ছিঁড়ল পরনের পায়জামা। জারের আমলে মধ্য এশিয়ার শহরগুলি দুটি এলাকায় বিভক্ত ছিল—রুশীয় এলাকা ও দেশীয় এলাকা। তিরমিজের দুর্গ ছিল রুশীয় এলাকায়। আমরা দেশীয় এলাকার একটি সরাইতে গিয়ে উঠলাম। আমাদের পৌছানোর খবর পেয়ে দুর্গ হতে দুজন এলেন, তার মধ্যে একজন ছিলেন অনুবাদক। রুশ ভাষার কথা আমাদের পারসীতে বোঝানো হচ্ছিল। আমাদের জন্যে ব্যবস্থা হচ্ছে, তখন আমরা যেন ওখানেই থাকি, এই কথা জানিয়ে তাঁরা চলে গেলেন। তার কিছু সময় পরে ব্যাণ্ড বাজিয়ে দুর্গ হতে লাল সৈনিক ও অফিসাররা আমাদের স্বাগত জানাতে এলেন। তাঁরা আমাদের সঙ্গে করে দুর্গে নিয়ে গেলেন, ধরে নিয়েছিলেন যে আমরা ভারতীয় বিপ্লবী। যতটা মনে পড়ে সময়টা ১৯২০ সালের জুলাই মাস ছিল। হিন্দুকুশ অতিক্রম করতে গিয়ে আমাদের শরীরে বড় ক্লান্তি এসেছিল। তিরমিজের দুর্গে কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে আমরা এই ক্লান্তি দূর করলাম। তারপরে আমরা এগিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠি। দুর্গাধ্যক্ষ বললেন, স্টীমার আসার পরে আমরা যেন যাই। তিনি আমাদের বিপ্লবের পরের সোবিয়েৎ দেশ দেখার জন্যেও অনুরোধ করলেন। স্টীমার কোন্ দিন যে এসে পৌছুবে তা তিনি বলতে পারলেন না। আমাদের সঙ্গীরা আর বেশী দিন অপেক্ষা করতে চাইছিলেন না। তাঁদের ভিতরে বেশীর ভাগই আনাতোলিয়ায় গিয়ে তুর্কির হয়ে লড়াই করার জন্যে উদ্‌গ্রীব ছিলেন।

কির্কির পথে

তুর্কমেনিস্তানের কির্কিতে একটি দুর্গ আছে। এই দুর্গই যে আমাদের লক্ষ্য হবে তা আমরা জানতাম না। স্টীমার আসার তারিখ যখন আমাদের জানা নেই তখন আমরা স্থির করলাম নৌকাতেই যাব। আমরা আশি জন

দু'খানা নৌকায় চড়ে আমুদরিয়ার জলপথে রওয়ানা হলাম। তিরমিজ (এখন উজবেকিস্তান রিপাবলিকের এলাকা) হতে কিছু দূর এগিয়ে গেলে তুর্কমেনদের এলাকা পড়ে। এই এলাকা এখন তুর্কমেনিস্তান রিপাব্লিকে পরিণত হয়েছে। সেই সময়ে তুর্কমেনরা বিপ্লবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। আমরা যখন তাদের এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তারা মাল্লাদের ডেকে নৌকা কূলে ভিড়াতে বলল। কেন তারা আমাদের নৌকা কূলে ভিড়াতে বলছে তার কারণ আমরা বুঝতে পারি নি। একথা আমাদের কল্পনায়ও আসে নি যে ব্রিটিশের অত্যাচারে দেশত্যাগী আমরা—আমাদের কোনও ক্ষতি মুস্‌লিম তুর্কমেনরা করতে পারে। ঘুণাক্ষরেও তাদের মনের ইচ্ছা বুঝতে পারলে নৌকা আমরা আফগান এলাকায় ভিড়িয়ে দিতে পারতাম। নদীর অপর পারে তখনও আফগান এলাকা ছিল। নৌকা তুর্কমেনদের তীরে ভিড়িয়ে ডাঙায় নামা মাত্রই তারা এসে আমাদের চারদিক হতে ঘিরে ফেলল। বলল, "তোমরা এখন এখানেই থাকবে, আমাদের কালান্তর এসে অনুমতি দিলে তবে যেতে পাবে।" আমরা কেউ তুর্কি ভাষা জানিনে। সরফরাজ আমাদের পার্‌সী ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন তুর্কমেনরা কি বলল। 'কালান্তর' শব্দের মানে সর্দার। বুঝতে পারলাম আমরা বন্দী হয়েছি। সেই রাত্রি তুর্কমেনদের পাহারায় আমাদের নদীর কূলেই কাটাতে হল। ভোর হতেই দেখলাম লাঠি হাতে প্রায় এক হাজার তুর্কমেন সেখানে জড়ো হয়ে গেছে। প্রথমেই তারা আমাদের প্রত্যেকের শরীরের ও জিনিস-পত্রের তলাশি নিল। আমাদের নিকটে কোনো হাতিয়ার নেই এই বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তারা 'হাইকো' 'হাইকো' বলে আমাদের তাড়া করা শুরু করে দিল। 'হাইকো'র মানে নাকি জলদি চল। আমরা সরফরাজের মারফতে অনেক অনুনয় করে তাদের বোঝালাম যে আমরা ভারতের মুসলমান, ইংরেজের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে দেশত্যাগ করে এসেছি। শুনেই তারা বলল, "ইংরেজ? তারা তো ভালো মানুষ। তাদের নিকট হতেই তো আমরা সাহায্য পাচ্ছি।" আমাদের কোনো কথাই তারা শুনতে চাইল না। তারা ধরে নিয়েছিল আমরা বল্‌শেভিক। মির্জা মুহম্মদ আকবর শাহের চেহারা এমন যে অনায়াসে তাঁকে ইউরোপীয় বলে সন্দেহ করা যায়। তাঁর গায়ের রং শুধু ফরসা নয়, তাঁর চোখও নীল।

তুর্কমেনরা আমাদের পশুর মতো তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের পিঠের ওপরে মারও পড়ছিল। দুপুরের সময় আমাদের আশি জনকে একটি কামরায় ঠাসাঠাসি বন্ধ করে দিয়ে তারা সকলে খেতে চলে গেল। কিছু সময় পরে ফিরে এসে আবার আমাদের মার্চ করানো শুরু করে দিল। আমাদের এইভাবে চলার সময়ে গ্রামের ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ি সকলেই বাড়ির বা'র হয়ে আসছিল এবং প্রত্যেকেই অন্তত কোনো কিছু দিয়ে একটি আঘাত আমাদের ওপরে হানছিল। তাদের ধারণা ছিল যে তারা ধর্ম-যুদ্ধের পুণ্য হাসিল করছে। রাত হয়ে যাওয়ায় আমাদের একটি সরাই-খানায় আটক করে রাখা হল। তারা বলল, আমাদের নিকটে পয়সা থাকলে আমরা রুটি কিনে খেতে পারি। গ্রামের ছেলেরা রুটি নিয়ে এসেছিল। খুব চড়া দামে তা আমাদের নিকটে বেচল। এক ক'দিন আমরা এই সরাইখানাতেই থাকলাম। আমাদের ভিতরে অনেকে নামাজ পড়ছিলেন এবং কোরান পাঠ করছিলেন। তা দেখে তুর্কমেনরা বলতে লাগল, "দেখ দেখ, কাফেরেরা নামাজ পড়ছে আর কোরান পাঠ করছে!"

এরই মধ্যে এক দুপুর বেলা কয়েক জন মৌলবী সাহেব তাঁদের ছোকরা চেলাদের সঙ্গে নিয়ে ওখানে এলেন। তাঁদের পোশাক ভালো তো ছিলই, চেহারা দেখে মনে হল তাঁরা খানাপিনাও করেন ভালো। তাঁরা আমাদের বললেন, "আপনাদের কিছু জিনিস তো এরই মধ্যে লুঠ হয়ে গেছে, বাকী জিনিসগুলিও আপনারা হারাতে পারেন। ভালো হবে আপনারা যদি জিনিসগুলি আমাদের হাতে সোপর্দ করে দেন।" তাঁরাই জিনিসগুলির পৃথক পৃথক তালিকা তৈয়ার করে নিলেন। আমাদের ভিতরে এমন সব বোকাও কিছু কিছু ছিলেন যাঁরা তাঁদের টাকা-কড়িও মৌলবী সাহেবদের হাতে সঁপে দিলেন। মৌলবী সাহেবেরা আমাদের জিনিসগুলি উটের পিঠে বোঝাই করে নিয়ে চলে গেলেন।

তারপরে আবার আমাদের মার্চ করানো শুরু হল। আমাদের এমন একটি খোলা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল যার চার দিক গাছে ঘেরা। এখানেই আমাদের বিচার আরম্ভ হয়ে গেল। আমাদের গুলি ক'রে মারা হবে এই আলোচনা চলছিল। তা শুনে আমাদের তুর্কি সঙ্গী সরফরাজ কাঁদছিলেন এবং আমাদেরও তিনি বলে দিচ্ছিলেন কি ঘটতে যাচ্ছে। আমাদের

ভিতরেও অনেকে কান্না জুড়ে দিল। তখন আমাদের নেতা মুহম্মদ আকবর থান চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন: "ভাইরা, তোমরা ঘাবড়িও না। মরণ আমরা কিছুতেই মরব না। হিন্দুকুশের দুর্বিষহ কষ্টে যখন আমরা মরি নি তখন এখানেও আমরা মরব না।" আমাদের ভিতরে কেউ কেউ একথাও ভাবছিল যে যখন আমাদের ওপরে ওরা গুলি করতে আসবে তখন আমরা প্রত্যেকেই একজন তুর্কমেনকে সর্বশক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরব।

আমাদের গুলির মুখে মৃত্যুর হুকুম হয়েই গিয়েছিল এমন সময়ে ঘোড়ায় চড়ে এক বৃদ্ধ সেখানে এল। এই বৃদ্ধের ঘোড়ার রং সাদা ছিল, তার চুল দাড়ি সবই ছিল সাদা, এমনকি তার পোশাকও ছিল সাদা। বৃদ্ধ ঘোষণা করল:

"বন্দীদের নিকটে আফগান সরকারের কাগজ-পত্র পাওয়া গেছে। আমরা যদি এখন তাদের মেরে ফেলি তবে আফগান সরকার আমাদের ওপরে হামলা করতে পারে। আর, এদিকে লাল ফৌজ তো আক্রমণ করবেই। ভালো হবে এই লোকগুলিকে এখন বন্দী ক'রে রাখা।" তুর্কমেনরা এই নির্দেশ মেনে নিল। আমাদের তখন ছোট ছোট দলে ভাগ করা হল এই জন্যে যে আমাদের বিভিন্ন তাঁবুতে বন্দী করে রাখা হবে। এটা কিরকি দুর্গের কাছাকাছি একটা স্থান ছিল। এই দুর্গের এক দিকে আমুদরিয়া আর এর তিন দিকে দূরে দূরে তুর্কমেনরা তাঁবু ফেলে থাকত। তাছাড়া কিছু দূরে ছিল তুর্কমেনদের গ্রাম। এই সকল তাঁবু ও গ্রাম হতে দুর্গ আক্রমণ করার চেষ্টা তখন চলছিল। প্রত্যেক তাঁবুতে গ্রাম হতে খাবার আসত। আমাদের এইসব তাঁবুতে রাখা হল। তাঁবুওয়ালারা রাত্রে বাইরে শুতে যেত। একটি তাঁবুতে আমরা চারজন ছিলাম। রাত্রে শুয়ে পড়লে আমাদের প্রত্যেকের দুখানা পা তাঁবুর কিনারা দিয়ে বাইরে গলিয়ে দিতে হত। তখন তুর্কমেনরা পা দুখানা এমনভাবে বেঁধে দিত যে পা টেনে চেষ্টা করলে ভিতরে নিয়ে আসা যেত না। আমাদের এই বন্দী অবস্থায় তুর্কমেনরা তাদের খাওয়া হতে আমাদের ভাগ দিত। প্রায় এক মাস আমাদের এইভাবে কেটে যায়।

আর তিন জনের সঙ্গে যে তাঁবুতে আমি ছিলাম তা থেকে ২০।২৫ গজ দূরে কাঁচা রাস্তা ছিল। একদিন রাত্রি আন্দাজ দুটার সময় সেই রাস্তায়

আমরা নানান রকম পায়ের শব্দ শুনতে লাগলাম। চাঁদনি রাত ছিল। আমরা মাথা উঁচু করে তাঁবুর ফুটোর ভিতর দিয়ে দেখলাম বহু লোক জিনিস-পত্র ও জন্তু-জানোয়ার নিয়ে পালাচ্ছে। আরও দেখলাম আমাদের ৭।৮ জন সাথীকেও তারা তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। পা-বাঁধা অবস্থায় আমাদের নড়চড় করার কোনও উপায় ছিল না। তাই, আমরা নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকলাম। সকাল হওয়ার পরে মানুষের সাড়াশব্দ কোথাও পাওয়া যাচ্ছিল না। ভাবলাম আমাদের পাহারাওয়ালাও পালাল নাকি। খানিকটা পরে কিন্তু সে এসে আমাদের পায়ের বাঁধন খুলে দিল। বলল, "তাঁবুর ভিতরেই তোমরা বসে থাকবে। বাইরে বেরুবার চেষ্টা করলেই তোমাদের গুলি করে মারব।" কিছুক্ষণ আমরা তাঁবুর ভিতরে বসে থাকলাম। তার পরে বোঝা গেল এই লোকটিও পালিয়েছে। আমরা বের হয়ে রাস্তায় এলাম। কোথাও কেউ নেই। পরিষ্কারভাবে কিছু ভাবতেও পারছিলাম না যে কোন্ দিকে যাই। এক রকম না ভেবেই রাত্রে যে দিকে লোকেরা গেছে সে দিকেই চললাম। বেশ কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে দেখলাম একটি গাছের তলায় আমাদের ৭।৮ জন বসে আছে। আরও দেখা গেল আমাদের আরও কিছু কিছু লোক নানান দিক হতে আসছে। সব নিয়ে চল্লিশ জন ওখানে আমরা জমায়েৎ হলাম। ইতিমধ্যে রাত হয়ে গেছে। ওখানে শুয়েই আমরা রাত কাটালাম। নিকটে ক'টি তাঁবুও খাটানো ছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলাম ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে। গত রাত্রে ও আগের সমস্ত দিন কিছুই পেটে পড়ে নি। আমরা ৩।৪ জন গাঁয়ের দিকে গেলাম যদি কিছু খাওয়ার জিনিস পাওয়া যায়। গ্রামে ঢুকেই দেখি এক ঠেলা ভর্তি পাঁচ পড়ে আছে। একটি ঘরে ঢুকে দেখলাম এক কড়াই দুধ চুলোর ওপরে রয়েছে।' এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে ডিম ও শুকনো রুটি প্রভৃতি অনেক কিছু পাওয়া গেল। সব জিনিস বন্ধুদের নিকটে পাঠিয়ে দিলাম। আমরা আরও এগিয়ে গেলাম। একটা বাড়ির দরজায় দেখা গেল একজন বৃদ্ধা, একটি যুবতী ও একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। আমরাও তাদের নিকটে এগিয়ে গেলাম। আমার মাথায় কি ভাব এসেছিল জানি না। আমি বাঁ হাতে যুবকটির হাত চেপে ধরে ডান হাতে খুব কষে তার গালে এক চড় মারলাম। ওরা তিনজনেই চেঁচিয়ে উঠল। যুবকটি ইশারা করে আমাকে একটা ঘরের

দুয়ার দেখিয়ে দিল। এর মধ্যে সরফরাজ ওখানে পৌছে গেছেন। আমি দুয়ার খুলেই দেখলাম ঘরের অর্ধেকটায় অনেকগুলি চায়ের পেটি স্তূপীকৃত হয়ে আছে, আর অর্ধেকে রয়েছে আমাদের জিনিসগুলি—যে জিনিসগুলি মৌলবী সাহেবেরা নিয়েছেন সেগুলি তো বটেই, যেগুলি লুট হয়েছিল সেগুলিও। তবে, কিছু কিছু মাল নেই দেখা গেল। যুবকটি এগিয়ে এসে কিছু বলল। সরফরাজ বুঝিয়ে দিলেন আমাদের মালগুলি আমরা নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু চায়ের পেটিগুলি নয়। ওগুলি তার মনিবের। আমরা হাতে হাতে আমাদের মালগুলি নিয়ে নিলাম।

আমরা ঠিক করলাম রুশীয় দুর্গের দিকেই আমাদের যেতে হবে, কিন্তু কোন্ দিকে আছে সেই দুর্গ? সরফরাজ একটি দিক দেখিয়ে বললেন ওই দিকেই হবে দুর্গটি। কারণ তোপের আওয়াজ ওই দিক থেকে এসেছিল। আমরা সেই দিকে চললাম। কিন্তু শত্রু ভেবে আমাদের ওপরে রুশরা যদি গুলি চালিয়ে দেন? আমরা খুঁজে খুঁজে জওয়ার বা ভুট্টার শক্ত ডাঁটা বের করলাম। তাতে সাদা কাপড় বেঁধে দিলাম। এই সাদা পতাকা উঁচিয়ে একজন আগে আগে চলল, আর সকলে চলল তার পিছে পিছে। দুর্গের বাইরে কাঁটা তারের বেড়া। বেড়ার ভিতরে আছে ব্যারাক। আমরা দেখলাম কাঁটা তারের বেড়ার ভিতরে ঘোড়ার পিঠে একজন রুশ সৈন্য বসে আছেন। সরফরাজ রুশ ভাষায় আমাদের সব কথা এই সৈনিককে বললেন। আমরা হাতে যে জিনিসগুলি বয়ে নিয়েছিলাম সেইগুলি মাটিতে নামিয়ে সৈনিকটি আমাদের দুহাত তুলে দাঁড়াতে বললেন। আমরা সকলে তা করলাম। তারপরে আমাদের সকলকে বেড়ার ভিতরে ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হল। একজন রুশ অফিসার আমাদের সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন এবং আমরা সে সব কথার জওয়াব দিলাম। সেই সময়ে একজন আফগান ব্যবসায়ী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই আমাদের অনুবাদকের কাজ করলেন। আমরা পারসীতে যা বলছিলাম তিনি রুশ ভাষায় তা অফিসারকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সৈনিক ব্যারাকে আমাদের থাকার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। আমাদের প্রত্যেককে বিছানা দেওয়া হয়েছিল। লাল সৈনিকেরা আমাদের সাথীদের খুঁজে খুঁজে আনলেন। তৃতীয় দিনে এসে পৌছুলেন মুহম্মদ আকবর খান, আমাদের কাফেলার নেতা।

আমরা সব মিলিয়ে ষাট জন হলাম। আর বিশ জনের কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না। মনে হয় তুর্কমেনরা তাদের মেরে ফেলেছিল।

আমরা স্থির করলাম আর নৌকাতে নয়, স্টীমার আসলে তাতেই চারজও যাব। সেখানে রেলওয়ে স্টেশন আছে। [চারজও এখন তুর্কমেনিস্তান রেপাবলিকের একটি বড় শহর]

একদিন আমি আমাদের ব্যারাকের বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। দেখলাম একজন রুশ ঘোড়সওয়ার তাঁর ঘোড়ায় একজন সৈনিকের মৃতদেহ নিয়ে ছুটে আসছেন। তিনি ইশারায় জলপান করতে চাইলেন। আমি তখনই জলপাত্র নিয়ে তাঁর সামনে ধরলাম। জলপান করে তিনি দুর্গের দিকে ছুটে গেলেন। আগেই বলেছি আমাদের ব্যারাকটি ছিল দুর্গ সংলগ্ন ব্যারাক। দুর্গ হতে খুব জোরে জোরে ঘণ্টা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যিনি যেখানে ছিলেন মোর্চার দিকে ছুটে এলেন। ব্যারাকের অফিসার এসে আমাদের বললেন—"এখানে আপনাদের থাকা নিরাপদ নয়। আপনারা আমাদের অতিথি। আপনাদের নিরাপদে রাখা আমাদের কর্তব্য। এখনই অপনারা দুর্গের ভিতরে চলে যান। সেটা হবে আপনাদের জন্যে নিরাপদ স্থান।" আমরা ২০ জন এগিয়ে এসে বললাম, "আমাদের হাতে হাতিয়ার দিন, আমরাও লড়াই করব।" অফিসার খুশী হয়ে আমাদের রাইফল দিয়ে বললেন, "আমুদরিয়ার দিকটা আপনাদের রক্ষা করতে হবে।" প্রতি ট্রেঞ্চে আমরা দুজন করে ডিউটি দিতে লাগলাম। এইভাবে আমরা এক সপ্তাহ প্রতি-বিপ্লবীদের আক্রমণের প্রতিরোধ করলাম। এর পরে দুর্গের কমাণ্ডার এসে আমাদের জানালেন, "আমাদের ওপরে প্রতি-বিপ্লবীদের যে আক্রমণ চলেছিল তা আমরা সফলভাবে রুখেছি। স্টীমার যোগে আমাদের নূতন সৈন্যরা এসে গেছেন। এবারে আমরা আমাদের শত্রুদের ওপরে আক্রমণ চালাব। এই আক্রমণে আপনারা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলেও চলতে পারে। তবে যদি ইচ্ছা করেন আপনারাও যোগ দিতে পারেন।" শত্রুদের ওপরে আক্রমণেও আমরা তিনজন যোগ দিয়েছিলাম—শওকৎ ওস্মানী, মসূউদ আলী শাহ্ ও আমি। [শওকত উস্মানী, মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চলার সময়ে দুর্বলতা প্রকাশের অপরাধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি হতে বহিষ্কৃত হয়েছে। কার্যকলাপ হতে পরে বোঝা গিয়েছে

যে মসুউদ আলি শাহ্ ব্রিটিশের চর। কিন্তু ব্রিটিশের চররূপেই সে প্রথমে দেশত্যাগ করেছিল কি তা বলা কঠিন। আশ্চর্য নয় যে চরবৃত্তি নিয়েই দেশ ছেড়েছিল।]

মাত্র তিনদিনের আক্রমণের পরে তুর্কমেন প্রতি-বিপ্লবীরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়ে যায়।

তাসখন্দের পথে

এবারে আমাদের কিকি ছাড়ার পালা। সৈন্য নিয়ে যে স্টীমার এসেছিল আমারা ষাট জন তাতেই চড়ে বসলাম। স্টীমার আমাদের চারজও নিয়ে গেল। লালফৌজের সৈন্যরা ব্যাণ্ড বাজিয়ে স্টীমার ঘাটে এসে আমাদের স্বাগত জানালেন। চারজওতে আমরা তিন দিন ছিলাম। এখানে আমাদের খুবই অতিথি-আপ্যায়ন হয়। চারজওতে থাকাকালেই আমরা নিজেদের ভিতরে পরস্পরের মনের পরিচয় পেলাম। তার আগে আমাদের নিকটে পরিষ্কার হয় নি কার মনে কি আছে। চারজও একটি রেলওয়ে জংশন। এখান থেকে নানান দিকে ট্রেন যায়। আমাদের ভিতরে অনেক লোক বললেন তাঁরা আনাতোলিয়া যাবেন। সোবিয়েৎ সরকারের তরফ হতে সেই ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। আর বাকী আমরা তাসকন্দ যাওয়ার উদ্দেশে ট্রেনে চড়ে বসলাম। আমাদের দলে ছিল আমাদের কাফেলার নেতা ১। মুহম্মদ আকবর খান, ২। মীর আবহুল মজীদ, ৩। সুলতান মাহ্মুদ, ৪। ফিরোজুদ্দীন মন্সুর, ৫। গওহর রহমান খান, ৬। মিয়া মুহম্মদ আকবর শাহ্, ৭। আবহুল কাদির সেহরাই, ৮। ফেদা আলী ৯। গোলাম মুহম্মদ, ১০। জাফর, ১১। ফজল ইলাহী কুরবান ১২। আবহুল্লা সফদর, ১৩। আবহুল মতীন, ১৪। আবহুর রহীম ১৫। শওকৎ উস্মানী ১৬। তাজুদ্দীন, ১৭। মসুউদ আলী শাহ্ ১৮। মুহম্মদ হোসায়ন, ১৯। আবহুল কাইয়ুম ও ২০। রফীক আহমদ প্রভৃতি। আমরা চারজও হতে বুখারায় গেলাম। বুখারা রেলওয়ের শাখা লাইনে ছিল। বুখারায় না গিয়েও আমরা তাসকন্দে যেতে পারতাম। কোথায় কি অসুবিধা ছিল জানি না, বুখারায় আমাদের তিন দিন থাকতে হল। আমীরের অতিথিশালাতে আমরা ছিলাম। আমীর তখন পালিয়েছেন। রাজভাণ্ডার হতে আমাদের প্রত্যেককে

একটি করে কারুগুল (জোব্বা) দেওয়া হয়। বুখারা হতে রওয়ানা হয়ে আমরা শেষ পর্যন্ত তাসকন্দ পৌছি। ইতোমধ্যে আবহুর রব পেশোয়ারী তাঁর দলবল নিয়ে তাসকন্দে পৌছে গিয়েছিলেন। তাঁর লোকেদের সঙ্গে আমাদের কাবুলে দেখা হয়েছিল। এই লোকেরাই স্টেশন হতে 'ইণ্ডিয়া হাউসে' আমাদের নিয়ে যায়। একটি বাড়ির নাম 'ইণ্ডিয়া হাউস' রাখা হয়েছিল। আবহুর রব এই বাড়িতে থাকতেন। পরে বোঝা গিয়েছিল আমরা যে ওখানে পৌছাব সে-খবর এই বাড়িতে পৌছেছিল। আবহুর রব আর কাউকে এই সংবাদ না দিয়ে তাঁর লোক পাঠিয়ে আমাদের রেলওয়ে স্টেশন হতে আনান।

আমরা পৌছাবার কিছুক্ষণ পরে মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম. এন. রায়), তাঁর স্ত্রী এভেলিন রায়, অবনী মুখার্জি ও তাঁর রুশীয় স্ত্রী এবং মুহম্মদ শফীক আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। শফীক যে কখন কিভাবে ওদেশে গিয়েছিলেন তা আমি জানতাম না। আবহুর রব আমাদের তাঁর দলে ভেড়াবার জন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কি যে তাঁর দল ও রাজনীতি তার কিছুই আমরা বুঝলাম না। তিনি যে বারেবারে নিজেকে বিপ্লবীদের পিতা বলছিলেন এটাই শুধু আমরা বুঝলাম। পরে এম. এন. রায়ও আমাদের সঙ্গে সুবিস্তৃত আলোচনা করলেন। ভারতে বিপ্লব কোন্ পথে অগ্রসর হবে এই সব কথা তিনি আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন। আমাদের রাজনীতিক জ্ঞানের পরিধি সঙ্কীর্ণ ছিল। তবুও আমরা এম. এন. রায়ের কথা সব না বুঝলেও অনেক কিছু বুঝলাম। তখনও আমরা কমিউনিস্ট পার্টি বুঝতাম না। স্থির করলাম এম. এন. রায়ের নেতৃত্বে আমরা কাজ করব। পরে ত্রিমূল আচারিয়া এসেও আবহুর রবের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমরা এম. এন. রায়ের সঙ্গে যোগ দেওয়ার ফলে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে ভারত সম্পর্কিত ব্যাপারে তাঁর আসন অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হয়েছিল। যতটা মনে পড়ে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমরা তাসকন্দে পৌছেছিলাম।

একটি কথা এখনও বলা হয় নি। আমি আগেই বলেছি আফগানিস্তানের জবলুস্ সিরাজ হতে দুটি কাফেলা রওয়ানা হয়েছিল। মুহম্মদ আকবর খানের নেতৃত্বে প্রথম কাফেলায় আমরা ছিলাম, আর দ্বিতীয় কাফেলা রওয়ানা

হয়েছিল পেশোয়ারের মুহম্মদ আকবর জানের নেতৃত্বে। পরে খবর পেয়েছিলাম এই কাফেলা বুখারায় পৌঁছেছিল। মুহম্মদ আকবর জানের এক ভাই বুখারায় আফগান কন্সালের অফিসে কাজ করত। সম্ভবত এই কারণেই সে কাফেলাকে বুখারা নিয়ে গিয়েছিল। এই কাফেলায় হবীব আহ্মদ নসীম ছিল। তার সঙ্গে মুহম্মদ আকবর জানের মনোমালিন্য হওয়ায় তাকে আকবর জান গিরেফ্তার করিয়ে দেয়। হবীব প্রথমে বুখারার জেলে ছিল। তার পরে তাকে তাসকন্দের জেলে পাঠানো হয়। এই খবর পাওয়ার পরে আমরা এম. এন. রায়কে তা জানাই এবং তাঁর হস্তক্ষেপে হবীব জেল থেকে মুক্তি পায়। মুহম্মদ আকবর জানের কাফেলার বেশীর ভাগ লোক দেশে ফিরে গিয়েছিল। আর, যারা দেশে ফিরে নি তারা আনওয়ার পাশার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। আন্ওয়ার প্রথমে সোবিয়েৎ সরকারের আশ্রয়ে মস্কোতে ছিলেন। পরে মধ্য এশিয়ায় গিয়ে সোবিয়েতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যুদ্ধে নিহত হন।

আমরা তাসকন্দে পৌঁছানোর কদিন পরে দেখা গেল যে উস্মানী কোথায় চলে গেছে। তারপরে একদিন এম. এন. রায় আমাকে ডেকে আন্দিজান ও ওসে যেতে বলেন। আন্দিজান সম্রাট বাবরের জন্মস্থান ছিল। আমাকে ওই সব জায়গায় পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল ভারতে যাওয়ার পথ বার করার চেষ্টা করা। মুন্শী ফাজিলের কোর্স পর্যন্ত আমি পার্সী ভাষা পড়েছিলাম। সম্ভবত এই কারণে আমায় আন্দিজানে পাঠানো হয়। আমি আন্দিজানে পৌঁছে দেখলাম শওকৎ উস্মানী ওখানেই আছে একই উদ্দেশ্যে। ... অধিবাসী কিছু সংখ্যক হিন্দু ব্যবসায় উপলক্ষে স্থায়ীভাবে আন্দিজানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। শওকৎ উস্মানী তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। আন্দিজান হতে আমি ওসে যাই। ওস পার্বত্য এলাকা, তখনই বরফে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। আমি নিশ্চিত বলতে পারি না, হয়তো এই এলাকাকেই তখ্তে সুলায়মান বলা হত। ওসে আমার কাজ কিছু হল না। তুষারপাতের ভিতর দিয়ে পথ কোথায় খুঁজে পাব? অত্যধিক শীতে ও বরফের কামড়ে আমার পা ফুলে গিয়েছিল। তাসকন্দে ফিরে এলাম এবং নবপ্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান মিলিটারি স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ শুরু করলাম।

মিলিটারি শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারি স্কুলে আমাদের রাজনীতির

শিক্ষাও দেওয়া হত। আমরা মেশিনগান চালানোর শিক্ষা পেয়েছিলাম। তোপ চালানোর শিক্ষাও আমাদের আংশিকভাবে হয়েছিল। একজন হাওয়াই জাহাজ চালানো শিখছিল। ড্রিল ইত্যাদি তো হতই।

ব্রিটিশের সঙ্গে সোবিয়েৎ দেশের বাণিজ্যিক চুক্তির কথাবার্তা চলেছিল। তার একটি শর্ত ছিল তাসকন্দের মিলিটারি স্কুলটি তুলে দিতে হবে। ব্রিটেন চাইত না যে মধ্য এশিয়াতেই কোনো ভারতীয় থাকেন।

আমরা তাসকন্দে থাকার সময়কার একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করব। ইণ্ডিয়া হাউসে থাকার সময়ে আবদুল কাদির এক দিন রাস্তায় হাওয়া খাচ্ছিল। সেই সময়ে কি করে জানিনে, গোলা-গুলি ইত্যাদির গুদামে (magazine-এ) আগুন লেগে যায়। আগুন দেখে আবদুল কাদির পালাতে শুরু করে। তাকে পালাতে দেখে কর্মরত সৈনিক তার পায়ে গুলি করে দেয়। আবদুল কাদির পড়ে যায়। যখন দেখা গেল সে ভারতীয়দের একজন তখন তাকে হস্পিটালে ভর্তি করে দিয়ে ইণ্ডিয়া হাউসে খবর দেওয়া হয়। হস্পিটালে তাকে খুবই যত্ন করা হয়েছিল। [এই আবদুল কাদির পরে পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় অভিযুক্ত হয়েছিল। মোকদ্দমা হতে সে ছাড়া পেয়ে যায়। ছাড়া পাওয়ার পরে কিন্তু সে চুপ ক'রে বসে থাকে নি। ভারতীয় পুলিস ও ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সঙ্গে মিশে গিয়ে অনেক কুকর্মই সে করেছে। সে সোবিয়েৎ দেশ, কমিউনিস্ট ইনটারন্যাশনাল ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে বহু প্রবন্ধ লিখে লণ্ডনের কাগজে ছেপেছে। এই সবের পুরস্কার স্বরূপ সে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে পশ্তু ভাষা পড়াবার চাকরিও পেয়েছিল। সে পেশোয়ারের অধিবাসী। হিজরতকারীদের সঙ্গে দেশের বাইরে যাওয়ার আগে সে পেশোয়ারের ব্রিটিশ অফিসারদের পশ্তু ভাষা শিক্ষা দিত। তার পরবর্তী কার্যকলাপ হতে তার ওপরে এ সন্দেহও করা যেতে পারে যে ব্রিটিশ অফিসাররাই তাকে হিজরতকারীদের সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। তাসকন্দের ম্যাগাজিনে আগুনও কি সেই লাগিয়েছিল? কে জানে?]

মস্কোর ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে

যতটা মনে পড়ে ১৯২১ সালের মে মাস ছিল। তাসকন্দের মিলিটারি স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে আমরা মস্কো চলে গেলাম। প্রাচ্য দেশের লোকদের মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মস্কোতে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা তাতে ভর্তি হলাম। আমাদের শিক্ষাও আরম্ভ হল। কিছুদিনের ভিতরে আমরা অনেকেই পার্টিতে যোগ

দিলাম। মস্কো যাওয়ার পরে প্রথমে শওকৎ উস্‌মানী পার্টিতে যোগ দিল। তার পরে এক সঙ্গে পার্টিতে যোগ দিল গওহর রহমান খান, মিঞা মুহম্মদ আকবর সাহ ও সুলতান মাহ্‌মুদ। তারও পরে মীর আবদুল মজীদ, ফিরোজুদ্দীন মন্‌সুর ও ফিদা আলী জাহিদ পার্টিতে এল। তাদের অনুসরণ করল রফীক আহ্‌মদ ও হবীব আহ্‌মদ নসীম। তার কিছু পরে পার্টিতে এল ফজলে ইলাহী কুরবান ও আবদুল্লা সফ্‌দর। আবদুল কাদির সেহরাইয়ের নাম পার্টি সভ্য হওয়ার জন্যে গওহর রহমান খান ও মিঞা আকবর শাহ্‌ সুপারিশ করেছিল, কিন্তু শওকৎ উস্‌মানী ও মস্‌উদ আলী শাহের তীব্র বিরোধিতায় প্রথমে তাকে মেম্বর করা হল না। মস্‌উদ আলী শাহ্‌ তাসকন্দেই পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। কিছু দিন পরে অবশ্য আবদুল কাদির পার্টি মেম্বর হতে পেরেছিল। আবদুল কাইয়ুম পার্টি সভ্য হওয়ার জন্যে দরখাস্ত করেছিল, কিন্তু তার নাম কেউ সুপারিশ করে নি।

জাকারিয়া আগে হতে পার্টি সভ্য ছিলেন। তিনিও ওই সময়ে মস্কোতে ছিলেন। ১৯১৫ সালে লাহোরে কলেজে অধ্যয়নরত ১৫ জন ছাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের বাইরে চলে যান। মুহম্মদ আলী ও জাকারিয়া তাঁদের ভিতরে ছিলেন। মুহম্মদ আলীও কমিউনিস্ট পার্টি সভ্য হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমার কোনও যোগ হয় নি। শুনেছিলাম জাকারিয়া পরে ইউরোপের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে ডক্টরেট পেয়েছিলেন। আজ তিনি কোথায়, বেঁচে আছেন কিনা, আমি তার কিছুই জানি না।"

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি

আগে হতে কয়েক জন ভারতীয় সোবিয়েৎ দেশে থাকার সময় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। হিজরতকারীদের ভিতরে মস্কো ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে প্রবেশ ও শিক্ষা লাভের পরে কয়েক জন যে পার্টিতে যোগ দিয়েছিল সে কথা ওপরে বলেছি। এই সকল সভ্য একত্র হয়ে ১৯২১ সালে মস্কোতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করলেন। প্রবাসেই আমরা পার্টি গঠন করলাম, কারণ আমরা বুঝেছিলাম যে তার প্রয়োজন আছে। [১৯২১ সালে ভারতেও কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার চেষ্টা শুরু হয়েছি

আমি বাঙলা ভাষা জানি না। জানতে পারলাম ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বাঙলায় একখানা পুস্তক লিখেছেন। তাতে নাকি তিনি হিজরতকারী যুবকদের নিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বনিয়াদ পত্তন করার জন্যে খুব কুপিত হয়েছেন। পার্টি নাকি ডক্টর দত্তের মতো পুরনো বিপ্লবীদের নিয়েই গড়া উচিত ছিল। ডক্টর দত্তরা কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করে থাকলে তাঁদের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়াই তো উচিত ছিল। তাঁরা তা করলেন না কেন? আমাদের উপস্থিতিতেই তাঁরা মস্কো গিয়েছিলেন। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ব্যবহার খুব মিষ্ট ছিল। তার ওপরে তিনি ভালো উর্দু জানতেন। এই জন্য আমি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মিশেছি। তখন তাঁর মত শুনে আমার এই বিশ্বাস হয়েছিল যে তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে মস্কো আসেন নি। ডক্টর দত্ত যাই বলুন না কেন, আমরা কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ অর্জন করেছিলাম, পার্টির সভ্যপদ আমরা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিই নি। দুনিয়ার মজুরশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্রের পক্ষ নিয়ে আমরাই অস্ত্র ধারণ করেছিলাম। এটা ডক্টর দত্তের মনে রাখা উচিত ছিল।

মস্কোতে ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার পরে তা কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশনালের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। মুহম্মদ শফীক হয়েছিল পার্টির প্রথম সেক্রেটারী। মানবেন্দ্রনাথ রায়, শফীক ও অবনী মুখার্জিকে নিয়ে পার্টির একটি ওয়ার্কিং কমিটিও গঠিত হয়েছিল। মস্কোতে ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার ফলেই রায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারলেন। তা না হলে কমিউনিস্ট ইন্‌টারন্যাশানালের ভিতরেই তিনি শুধু একজন নেতা হয়ে থাকতেন, ভারতের বিশেষ প্রতিনিধিত্ব পেতেন না।

একদিন আমরা দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলাম। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার পরে আবার আমরা দেশে ফেরার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। কারণ, দেশেই তো আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের দেশে পাঠানোর কথা স্থিরও হয়ে গেল। আমাদের বলা হল আমরা প্রত্যেকেই যেন একজন সাথী বেছে নিই। এক সঙ্গে দুজন পাঠানোই প্রথমে ঠিক ছিল। শওকৎ ওস্‌মানী সাথী বেছে নিল মস্‌উদ আলী শাহ্‌কে, আর গওহর রহমান খানের সাথী হল মিঞা মুহম্মদ আকবর

শাহ্। আবদুল মজীদ সাথী করে নিল ফিরোজুদ্দীনকে, আর আমার সাথী হলো হবীব আহ্মদ। প্রথমে গেল শওকৎ উস্মানী আর মন্সুর আলী শাহ্, তার পরে গওহর রহমান খান ও মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ্। এদের দুপক্ষই বোধ হয় ইরানের ভিতর দিয়ে পথ পেয়ে গিয়েছিল। মীর আবদুল মজীদ ও ফিরোজুদ্দীন মন্সুর ইরানের রাস্তা ধরার জন্যে আজরবাইজান পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু কোনও খোলাসা পথ না পেয়ে তাদের আবার মস্কোতে ফিরে আসতে হল।

যে-পথে আমরা এসেছিলাম সে-পথে ফেরার সুবিধা ছিল না। ফিরে দেশে ফিরতে তো আমাদের হবেই। একটি দুরতিক্রম্য পথের কথাই তখন শুধু আমরা চিন্তা করতে পারছিলাম—পামীরের পথ। আজকার পামীর নয়, ১৯২২ সালের পামীর।

পামীরের পথে

আমরা জীবনের কঠোরতম অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। ১৯২২ সালের মার্চ মাসের শেষভাগে এক দিন আমরা মস্কো ছাড়লাম। আমরা যারা সহযাত্রী ছিলাম তাদের নাম নীচে দেওয়া হল :

১। মীর আবদুল মজীদ	২। রফীক আহ্মদ
৩। ফিরোজুদ্দীন মন্সুর	৪। হবীব আহ্মদ নসীম
৫। সুলতান মাহ্মুদ	৬। ফেদা আলী জাহিদ
৭। আবদুল কাদির সেহ্রাই	৮। সঈদ
৯। আবদুল হামীদ	১০। নিজামুদ্দীন

ফজলে ইলাহী কুরবান ও আবদুল্লা সফদরেরও আমারের সঙ্গে রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা আসেন নি। সঈদ, আবদুল হামীদ ও নিজামুদ্দীন কখনও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য হন নি। আবদুল হামীদ—মাস্টার আবদুল হামীদ নামে খ্যাত ছিলেন। কারণ, তিনি কাবুলে উর্দু পড়াতেন। আমাদের সব ব্যবস্থা করার ভার সোবিয়েৎ দেশের কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে ছিল। প্রথমে রেলপথে এক ছুটে আমরা তাসখন্দ গেলাম। সেখানে পৌঁছে আমরা পরের যাত্রা-পথের খবরের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। খবর পেলেই বের হয়ে পড়ব। রুশীয় বন্ধুরা বললেন

তাঁরা খবর পেয়েছেন মর্গেলান হতে লালফৌজ পামীরের দিকে যাবেন। তাঁদের সঙ্গে যদি আমাদের পাঠানো যায় তবে আমাদের পক্ষে সুবিধা হবে। যখন খবর পাওয়া গেল, অমুক তারিখে লালফৌজ রওয়ানা হবেন তখন আমাদের ট্রেন যোগে মরগেলান পাঠানো হল। একজন রুশীয় বন্ধু আমাদের সঙ্গে চললেন। আমরা মরগেলান পৌঁছানোর পরে সৈন্যরা ওখান হতে ট্রেনে ওসের পথে যাত্রা করলেন। আমরাও ওই ট্রেনেই গেলাম। ওসের পরে আর কোনও ট্রেন নেই। রসদ ও ভারবাহী পশু জোগাড় করার জন্যে ওখানে সৈন্যদের কয়েক দিন থাকতে হবে। মরগেলানে আমাদের মিলিটারি কমিসারের হাতে সোপর্দ করে রুশীয় কমরেড আমাদের নিকট হতে বিদায় নিয়েছিলেন। লালফৌজের ভিতরে কমিউনিস্ট পার্টির পুরো সংগঠন ছিল। আসলে তাঁদেরই নজর ছিল আমাদের ওপরে। পশু ও রসদ জোগাড়ের পরে আমরা ওস ছাড়লাম। শুরু হল আমাদের দুঃখের পথ-যাত্রা। এই পথের ডায়েরী লেখার অনুমতি আমাদের ছিল না। প্রতি ঘন্টার ও প্রতি দিনের ডায়েরী যদি আমরা লিখে রাখতে পারতাম তবেই আজ বোঝাতে পারতাম কী ধরনের ছিল সেই পথ, আর কীভাবে আমরা তা অতিক্রম করেছিলাম। আজ সব জায়গার নামও আমি ভুলে গেছি। ওস হতে রওয়ানা হওয়ার সময়ে আমাদের প্রত্যেককে পোস্তিন (চামড়ার পোশাক) দেওয়া হয়। পামীরের শীত অসহনীয়। এক জায়গায় আমরা আমুদরিয়া পার হলাম। আমুদরিয়া আমরা একবার পার হয়েছিলাম তিরমিজের কাছে। সেখানে নদী পাহাড় হতে সমতল ভূমিতে নেমেছিল। তারপরে আমুদরিয়ার জলপথে রওয়ানা হয়েই আমরা তুর্কমেনদের কবলে পড়েছিলাম। আবার হাতিয়ার হাতে নিয়ে কিকিতে আমুদরিয়ার কিনারা আমরা রক্ষা করেছিলাম। আমুদরিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল। ওস হতে রওয়ানা হওয়ার পর যে নদী আমরা পার হলাম তা ছিল পাহাড়ের ওপরের আমুদরিয়া। চওড়া কম, কিন্তু খরস্রোতা। জল ঘোড়ার পেট পর্যন্ত ছিল। নদী পার হওয়ার পরে দুদিন আমরা কুবাসায় ছিলাম। তার পরে আবার এগুলাম। মুরগাবে পৌঁছুবার আগে পথের কষ্টে অনেক ঘোড়া মরে গেল। এত বেশী চড়াই পশুগুলি কিছুতেই চড়তে পারছিল না। আমাদের চিনির কিউব দেওয়া হয়েছিল। শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হলে আমরা তা মুখে

রাখতাম। আমাদের ঘোড়া মরে গেলে লালফৌজের সৈন্যরা তাঁদের ঘোড়া আমাদের দিয়ে তাঁরা পায়ে হাঁটতেন। রসদ যাচ্ছিল উটের পিঠে। রসদ খরচ হতে হতে উটের পিঠ খালি হচ্ছিল। আমরা উটের পিঠেও যেতে লাগলাম। ঘোড়াগুলি মরছিলই। শেষ পর্যন্ত সৈন্যদের হেঁটেই চলতে হলো। উট যখন মরতে লাগল তখন আমরা এক উটের পিঠে দুজন করে চড়লাম। সমস্ত পশু যখন মরে গেল তখন আমরা হাঁটতে লাগলাম। অবশেষে আমরা খরোগে পৌছালাম। এটা ছিল সৈন্যদের যাত্রার শেষ জায়গা। খরোগের উচ্চারণ সম্ভবত হরোগ। রুশরা 'হ' কে 'খ' উচ্চারণ করেন। হরোগে আমরা আট দিন বিশ্রাম নিলাম। আবার নূতন করে আমাদের (সৈন্যদের নয়) যাত্রা শুরু হবে।

আমরা যাত্রার আয়োজন করতে লাগলাম। যে পোশাক পরে এতদিন পথ চলেছি সে পোশাক আর আমাদের ব্যবহার করা চলবে না। ওখানকার স্থানীয় লোকদের মতো পোশাক-পরিচ্ছদ আমাদের ধারণ করতে হবে। আমাদের পোশাকের বদলে স্থানীয় লোকদের পোশাক জোগাড় করা নেওয়া হল। তারা কম্বলের পায়জামা, কম্বলের কোর্তা, আর কম্বলের ফারগুল (জোব্বা) পরে। আমরাও তাই পরলাম। প্রত্যেকটি জিনিস হাজার হাজার উকুনে ভর্তি ছিল। স্থানীয় লোকের মতো টুপিও আমরা মাথায় পরলাম। মুশ্‌কিল হল জুতো নিয়ে। স্থানীয় লোকদের চা... নামক জুতোও আমাদের পরতে হল। এই জুতায় 'সোল্' নেই। পায়ের তলায় কাঁকর পড়লে প্রাণ বের হয়ে যেতে চায়। স্থানীয় লোকেরা ... জুতো পরতে পারত। তাদের কষ্ট-সহিষ্ণুতা অসীম, পায়ের তলাও শক্ত।

হরোগে আমরা নিজেদের আরও ছোট দলে ভাগ করে নিলাম। ... সঙ্গে এত লোকের ওই পথে যাত্রা করা উচিত নয়। প্রথম দলে আমরা ... জন যাত্রা করলাম। (১) মীর আবদুল মজীদ, (২) ফিরোজুদ্দীন ম... (৩) হবীব আহ্‌মদ নসীম ও (৪) রফীক আহ্‌মদ।

আমরা ওখান হতে যাত্রা ক'রে ইসকাশিম দুর্গের (হরোগের ... নাম) নীচে নেমে গেলাম। নীচে গ্রাম ছিল। রাত হয়ে গিয়েছিল। আমরা একটি বাড়িতে রাত কাটাতে চাইলাম; বাড়ির মালিক আ... সব ব্যবস্থা তো করে দিল, কিন্তু আমরা শুয়ে পড়ার পরে দুর্গে গিয়ে

দিল যে গ্রামে গুপ্তচর এসেছে। দুর্গাধ্যক্ষ কয়েকজন সৈনিক সঙ্গে নিয়ে নিজেই ছুটে এলেন এবং এসেই আমাদের বুকের কাছে রাইফল উচিয়ে ধরলেন। আমরা কথা বলতেই তিনি আমাদের চিনলেন। অনেক উপদেশও তিনি দিলেন। বললেন, "এরা লোক ভাল নয়। এদের জানতে দেওয়া উচিত নয় তোমরা কোনদিকে যাচ্ছ। রাত্রেই তোমরা এখান থেকে চলে যাবে।" তার পরে তিনি দুর্গে ফিরে গিয়ে একটি বাণ্ডিলে বেঁধে কিছু খাওয়ার জিনিস ও সিগারেট নিজেই এসে আমাদের দিয়ে গেলেন। আমরা সেই রাত্রেই ২টার সময়ে ওই গ্রাম হতে চলে গেলাম। বহু দূরে সুলায়মান নামক এক ব্যক্তির একটি বড় বাড়ি ছিল। তার চারপাশে কোথাও মানুষের বসতি নেই। তাই লোকেরা ওই জায়গাটিকে 'জায়ে সুলায়মান' অর্থাৎ সুলায়মানের স্থান বলে। দিনের বেলায় দশটার সময় আমরা তাঁর বাড়িতে পৌছালাম। তাঁর নামে পত্র ছিল। আমরা তাঁর হাতে পত্র দিলাম। ঘরে তখন অন্য লোকেরাও ছিল। পত্র পড়ে সুলায়মান বললেন, "হাঁ, সোগনানে সোনারের ব্যবসায় ভালো চলবে। ওখানকার লোকেরা সোনার চায়ও।" উপস্থিত লোকগুলিকে ধোঁকায় ফেলার জন্যে তিনি এই কথা বললেন। তারা চলে যাওয়ার পরে তিনি বিস্তৃতভাবে আমাদের সঙ্গে সব বিষয়ে আলোচনা করলেন। অনেক উপদেশ তিনি আমাদের দিলেন। বললেন, "পথের ধারে দু হাজার হতে চার হাজার ফুট নীচু খাদ থাকতে পারে। একবার তাতে পড়ে গেলে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। কোনও দিন আর কারুর পাত্তা পাওয়া যাবে না। এমনও হতে পারে খাদের পাশে বরফ জমে আছে এবং সেই বরফ কিঞ্চিৎ বেড়ে গেছে খাদের দিকে। তোমরা পথ চলার সময়ে পায়ের চাপে বরফ ভেঙে গেল, আর তোমরা পড়ে গেলে খাদের ভিতরে। এই রকম পথে যখন চলবে তখন হাতের লাঠি দিয়ে জোরে জোরে ঠুকে দেখবে বরফ ভেঙে যাচ্ছে কিনা।" আরও নানান কথা তিনি আমাদের বললেন। দু দিন আমাদের তাঁর বাড়িতে রাখলেন। এখানে আমাদের আফগান সীমানায় প্রবেশ করতে হবে। পামীর হতে ভারতের (এখন পাকিস্তানের) চিত্রল এলাকায় যেতে হলে কিছুটা আফগান এলাকা পার হতে হয়। ম্যাপে দেখলে মনে হয় ছোট্ট এক ফালি জায়গা মাত্র। কিন্তু এর দুর্গমতার কথা ভাষায় প্রকাশ

করা কঠিন। সীমানা এখানে অদ্ভুত। খরস্রোতা অপ্রশস্ত আমুদরিয়ার এপারে সোবিয়েতের পামীর এলাকা, ওপারে আফগানিস্তান। পিতা হয়তো সোবিয়েৎ এলাকায় থাকে, আর পুত্র থাকে আফগান এলাকায়। তাদের পরস্পর কথাবার্তা চলে, এপার থেকে ওপারে জিনিসপত্র ছুঁড়েও দেওয়া যায়। স্থলায়মান আমাদের টাকা বদল করে ভারতীয় টাকা দিলেন। একজন গাইডও দিলেন সঙ্গে, তার জন্যে গাইডকে অবশ্য আমাদের চার পাউণ্ড দিতে হয়েছিল।

ভারতের পথে

একদিন গভীর রাত্রে উটের পিঠে চড়ে আমরা নদী পার হয়ে আফগান সীমানায় প্রবেশ করলাম। শেষবারের মতো আমুদরিয়া পার হলাম। এবার আমাদের দুঃখের সাধনা শুরু হল। হিন্দুকুশ আমরা অতিক্রম করেছিলাম, অতি উচ্চ পামীরও আমরা অতিক্রম ক'রে এসেছি, কিন্তু এখানকার দুর্গমতার নিকটে সব কিছু ম্লান হয়ে যায়। আমরা গাইডকে অনুসরণ করতাম, কিন্তু সে আমাদের কাছাকাছি না থেকে অনেক দূরে দূরে থাকত। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলার আমাদের কোনও সুযোগ হত না। আফগান সীমানায় প্রবেশ করেই আমাদের খাড়া পাহাড়ে চড়তে হল। তার চূড়া ছিল স্থায়ী বরফ। তাতে না ছিল গাছ, না ছিল ঘাস। চামুস জুতো কি কষ্ট যে দিচ্ছিল তা কেমন করে বোঝাব! নীচের দিকে আফগানদের দুর্গ ছিল। আমরা পাহাড়ে চড়ার সময়ে কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল। দুর্গের সৈন্যরা ভাবল নিশ্চয় কিছু লোক যাচ্ছে। তারা দুর্গ হ'তে আলো হাতে বের হয়ে পড়ল। আমরা একটা বড় পাথরের তলায় একটি গুম্ফামতো পেয়ে গেলাম এবং তার ভিতরে ঢুকে নির্জীবের মতো পড়ে থাকলাম। "ওদের বাপেরা পুড়ে মরুক, কোথায় গেল লোকগুলি" একথা বলতে বলতে সৈন্যরা আমাদের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। "বাপ পুড়ে মরুক" আফগানদের একটা গাল। এইভাবে আমরা পথ চলতে লাগলাম। তুষারপাত শুরু হয়েছিল। তুষারের হাত হতে বাঁচার জন্যে পরের রাত্রিও আর এক গুম্ফায় আমরা কাটালাম। অবিশ্রাম তুষারপাতের জন্যে যখন আর চলতে পারছিলাম না তখন কম্বলের চার কোণে লাঠি বেঁধে সেই কম্বলের তলায়

বসে থেকেছি। কম্বল খুব ভারী হয়ে উঠলে তুষার ঝেড়ে ফেলেছি। এমনও ঘটেছে যে খাড়া পাহাড় হতে নামার কোনও পথ না পেয়ে জিনিস-পত্রগুলি মাথায় বেঁধে পাহাড়ের গায়ে পিঠ লাগিয়ে নিজেদের নীচের দিকে ছেড়ে দিয়েছি। প্রথম গুম্ফায় রাত কাটানোর পরে হবীব আহ্‌মদ বলে বসল, "আমি আর কিছুতেই চলতে পারব না। আমায় এখানে ফেলেই তোমরা এগিয়ে যাও। আমার যা হবার তা হোক।" মজীদ আর আমি তার বোঝা নিয়ে নিলাম। বললাম, "তোমায় চলতেই হবে।" আরও কিছু পথ চলার পরে মনসুরও জওয়াব দিয়ে বসল যে সে আর এগুতে পারবে না। তখন তার বোঝাও আমরা দুজনে (মজীদ ও আমি) ভাগাভাগি করে নিলাম। এক জায়গায় এক খাদের পাশ দিয়ে ওপরে চড়ার সময়ে হবীব আর মনসুরের কোমরে দড়ি বেঁধে আমরা দুজন তাদের দুজনকে টেনে রাখলাম পাছে না ভারসাম্য হারিয়ে তারা খাদের ভিতরে পড়ে যায়। বাস্তবিক মনসুর আর হবীবের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। বরফের ওপর দিয়ে পথ চলার ফলে তাদের পা ফুলেছিল, পায়ের নখগুলি খসে পড়ে গিয়েছিল এবং রক্ত পড়ছিল তাদের পা থেকে। সত্যিই তাদের পক্ষে পথ চলা অসহ্য বেদনাদায়ক হয়ে উঠেছিল।

আফগান সীমানায় তিন দিন পথ চলার পরে এক সন্ধ্যায় আমরা চিত্রল রাজ্যের সীমানায় প্রবেশ করলাম। এই সীমানার নিকটে কোথাও মানুষের বসতি ছিল না। আমাদের রসদও ফুরিয়ে গিয়েছিল। না খেয়েই আমরা একটি গুম্ফার ভিতরে রাত কাটালাম। স্থলায়মানের দেওয়া গাইডের দূর থেকে নজর তো আমাদের ওপর ছিলই। সকাল বেলা সে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করল। তার নিকটে কিছু রসদ ছিল। আমরা একটি ছোট্ট নদী পার হলাম। হবীব আহ্‌মদ ও ফিরোজুদ্দীনকে কাঁধে বসিয়ে পার করতে হয়েছিল। নদী পার হয়ে আমরা কিছু খড়কুটো ও লকড়ির টুকরো কুড়ালাম। একখানা পাথরের তলায় এই সব দিয়ে আগুন জ্বালানো হল। গাইড তার আটা ভিজিয়ে মেখে নিল। তার পরে রুটি তৈয়ার করে গরম পাথরের ওপরে সেঁকা হল। আমরা পাঁচ জনে একত্রে বসে পরম তৃপ্তির সহিত এই রুটি খেলাম। তার পরে গাইড আমাদের নিকট হতে বিদায় নিল। যাওয়ার সময়ে সে এমন ভাব দেখিয়ে চলে গেল

যেন আমরা কোনো দিনই তাকে চিনতাম না। আমরা গাইডের নাম জিজ্ঞাসা করি নি, সেও আমাদের নাম জানতে চায় নি। আমাদের যে ব্যাপার ছিল সে ব্যাপারে এই রকম শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়।

চিত্রল ভারতবর্ষের ভিতরে একটি দেশীয় রাজ্য ছিল। রাজ্যের নাম চিত্রল, আবার তার রাজধানীর নামও চিত্রল। এই রাজ্যের শাসককে বলা হতো মেহ্‌তর। পাকিস্তান হওয়ার পরেও বোধ হয় এই একই অবস্থা সেখানে আছে। গাইড চলে যাওয়ার পরে আমরা পদযাত্রা শুরু করলাম। সন্ধ্যার সময়ে একটি গ্রাম পেলাম। পয়সা দিয়ে কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা ও রাত্রে থাকার ব্যবস্থা করা হল। কম পক্ষে মনসুর ও হবীবের জন্যে ঘোড়া বা খচ্চর ভাড়া করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পাওয়া গেল না। সকাল বেলা আবার আমরা চার জন হেঁটেই রওয়ানা হলাম। বেলা হতে একটি গ্রামে পয়সা দিয়ে খেতে চাইলাম। যে লোকটিকে খাওয়ার কথা বললাম সে জানতে চাইল আমরা 'আশ' খাব কিনা। আমরা খুশী হয়ে রাজী হলাম। বুখারায় দেখেছি এক রকম পলাওকে 'আশ' বলে। কিন্তু খাওয়ার সময় দেখলাম আটা জলে সিদ্ধ করে তাতে নুন মিশিয়ে আমাদের খেতে দিয়েছে। কি আর করা যায়। সন্ধ্যার সময় যে-জায়গায় আমরা পৌছুলাম সেটা ছিল আগা খানের শিষ্যদের একটি আস্তানা। আগা খানের এক খলিফা (প্রতিনিধি) ওখানে থাকেন। একটি ফ্রি লঙ্গরখানাও ওখানে চালু আছে। যে-ই আসুক তাকে দুখানা চাপাতি ও কিছু মাসকলাইয়ের দাল খেতে দেওয়া হয়। তাই খেয়ে ওখানকার অতিথিশালায় আমরা দুদিন থাকলাম। ফিরোজুদ্দীন মনসুর আর হবীব আহ্‌মদকে নিয়ে আর চলতে পারা যাচ্ছিল না। তাদের পা থেকে রক্ত পড়ছিল। এখানে দুদিন থাকার পরে আবার আমরা রওয়ানা হলাম। এবার ওদের দুজনার জন্যে ঘোড়া ভাড়ায় পাওয়া গেল। চিত্রল শহরে যখন পৌছালাম তখন সন্ধ্যা হতে চলেছে। লোকেরা মনে করল আমরা ফকীর। কেউ কেউ ডেকে ভিক্ষাও দিলেন। মজীদ আর আমি দোকান থেকে জুতো কিনে পরলাম। মনসুর আর হবীবের জুতো পরার উপায় ছিল না। তার পরে দোকান থেকে কাপড় কিনে আমরা এক দরজীকে আমাদের জন্যে সাধারণ পাঞ্জাবী পোশাক তৈয়ার করতে দিলাম। কথা হলো ভোর হওয়ার আগেই তারা পোশাক তৈয়ার করে আমাদের

দেবে। এই পোশাক পরে আমরা দশ জনের সঙ্গে মিশে যাব এবং যে-কোন দিকে চ'লে যাব, এই ছিল আমাদের মনের ইচ্ছা। রাত্রে হোটেলে কবাব-রুটি খেলাম, আর থাকলাম এক সরাইখানায়।

একটি কথা বলা হয় নি। চিত্রল রাজ্যে প্রবেশ করার পরে যখন আমরা চিত্রল শহরের দিকে এগুচ্ছিলাম তখন পথে এক দল যাত্রীর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন জানতে চাইলে বললেন, তাঁরা হজ করতে যাচ্ছেন। যখন জিজ্ঞাসা করা হল এদিকে কোথায় তাঁরা হজ করবেন জওয়াব পাওয়া গেলো, "মজার-ই-শরীফে"। (আমরা মজার-ই-শরীফ হয়েই তিরমিজে গিয়েছিলাম। জায়গাটা তীর্থস্থান বটে।) বুঝে নিলাম ওখান থেকে মজার-ই-শরীফ যাওয়ার পথ আছে এবং দরকার পড়লে আমরাও এই কথা বলতে পারব।

আমরা যা ভেবেছিলাম তা কাজে পরিণত হল না। কি করে জানি না, শহরের কোতোয়াল আমাদের আসার খবর পেয়ে গেল। মনে হয় আমাদের ব্যস্ততা দেখে পাঞ্জাবী দর্জিটা খবর দিয়ে থাকবে। তা না হলে ফকীরের পোশাক পরা লোকেদের খবরের জন্যে কোতোয়াল ব্যস্ত হয় না। অতি ভোরে কোতোয়াল এসে জানিয়ে গেল যে আমরা যেন সরাইখানা ছেড়ে কোথাও না যাই। কিছু বেলা হতে আমাদের মেহতরের প্রাইভেট সেক্রেটারির নিকটে হাজির করা হলো। আমরা মজার-ই-শরীফ হতে তীর্থ দর্শন করে আসার কথা বললাম। এই কথাই প্রাইভেট সেক্রেটারি মেহ্‌তরের নিকটে রিপোর্ট করলেন। মেহ্‌তর হুকুম দিলেন, প্রত্যেককে একটি করে খেলাত (জোব্বা) ও রাহা খরচের জন্যে ৫০ টাকা দেওয়া হোক। এ পর্যন্ত সব কিছু আমাদের অনুকূলে ঘটছিল। প্রাইভেট সেক্রেটারির টেবিলে ইংরাজি খবরের কাগজ ছিল। সংযম হারিয়ে হবীব আহ্‌মদ তাতে চোখ বুলিয়ে নিল। তাতেই প্রাইভেট সেক্রেটারির মনে সন্দেহের উদ্রেক হল। তিনি ব্রিটিশের পলিটিকাল এজেন্টের নামে একখানা চিঠি লিখে একজন সিপাহীর হাতে দিলেন, আমাদের বললেন, "এর সঙ্গে গিয়ে একবার পলিটিকাল এজেন্টের সঙ্গে দেখা করুন।" বুঝলাম আমাদের যা হবার তা হয়ে গেল। আমরা পোশাক বদলে দর্জির তৈয়ার করা পোশাক পরে নিলাম। তারপরে পলিটিক্যাল এজেন্টের সঙ্গে দেখা

করতে গেলাম। একজন মুস্‌লিম ভদ্রলোক পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন। তিনি বাহ্যত ভালো কথাই বললেন। আমাদের বললেন, "এখন শহরে গিয়ে থাকুন। তার পরে যে দিকে খুশী চলে যাবেন। কিন্তু সিপাহী একজন সঙ্গে সঙ্গে চলল। আমরা যে গিরেফ্‌তার হয়ে গেছি তা বুঝতে আর বাকী থাকল না।

পেশোয়ার কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা : ১৯২২-১৯২৩

চিত্রলে যাঁর দোকান থেকে আমরা পোশাকের কাপড় কিনেছিলাম তাঁরও নাম ছিল আকবর খান, পেশোয়ারের লোক। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে জেনেছিলাম যে তিনি আমাদের মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহের আত্মীয়। তিনি আমাদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। পলিটিক্যাল এজেন্টের ওখান থেকে ফিরে এসে আমরা তাঁর বাড়িতেই খেলাম এবং রাত্রেও সেখানেই থাকলাম। সরাইতে আর ফিরে গেলাম না। পরের দিন তাঁর বাড়ি হতেই আমরা পেশোয়ারের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। সকলের জন্মেই গাধা ভাড়া করা হল। একজন সিপাহীও সঙ্গে সঙ্গে চলল। পথে প্রত্যেক চৌকিতে সিপাহীর বদল হচ্ছিল। এইভাবে চতুর্থ দিনে আমরা দরগাহী পেঁছলাম। এখান হতে যাত্রা শুরু হবে ট্রেনে। সিপাহী আমাদের থানায় পৌছিয়ে দিয়ে চলে গেল। থানাদার বললেন পেশোয়ার হতে আমাদের নেওয়ার জন্মে গার্ড আসবে। ততক্ষণ আমাদের ওই থানাতেই থাকতে হবে। আমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার তিনি কিছু করলেন না। এদিক-ওদিক বেড়াতে দিলেন, রাত্রে হাজত-ঘরে বন্ধ পর্যন্ত করলেন না। তার পরে পেশোয়ার হতে অনেক সিপাহী আসায় আমরা যাত্রা করলাম। এবারে আমাদের হাতকড়ি পরানো হল। অবশ্য ট্রেন চলার পরে হাতকড়ি খুলে দেওয়া হয়েছিল। সকাল বেলা আমরা রওয়ানা হয়েছিলাম, আর রাত্রি ৮।৯ টার সময়ে আমরা পেশোয়ার পৌছালাম। পুলিসের লোকেরা প্রথমেই আমাদের একটি হোটেলে খাওয়াতে নিয়ে গেল। এই হোটেলকে হাজীর হোটেল বলা হত। কাবুলে যাওয়ার সময়ে আমি এই হোটেলে খেয়েছিলাম। হোটেলের মালিক আমায় চিনতে পারলেন। খুব যত্নের সহিত তিনি আমাদের খাওয়ালেন। পুলিসের চোখ ও কান এড়িয়ে তিনি

আমাদের প্রত্যেকের বাড়ির ঠিকানাও নিলেন। পরে জেনেছিলাম যে প্রত্যেকের বাড়িতে তিনি আমাদের আসার ও গিরেফ্‌তার হওয়ার খবর লিখে দিয়েছিলেন।

রাত্রে আমাদের থানার হাজতে বন্ধ ক'রে রাখা হল। পরের দিন সি. আই. ডি'র সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আবদুল আজীজের নিকটে আমাদের প্রত্যেককে পৃথকভাবে হাজির করা হল। প্রত্যেকের তলাশী নেওয়া হল। অবশ্য কারুর নিকটে কিছুই পাওয়া যায় নি। ছোট ছোট কাগজের টুকরায় আমরা ঠিকানা ইত্যাদি যা কিছু আনতে পেরেছিলাম তার সব কিছুই ট্রেনের পায়খানায় গিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। আমাদের একত্রে না রেখে আবদুল আজীজ চার বিভিন্ন থানায় পাঠিয়ে দিলেন। পরের দিন সকালে আবদুল আজীজের বাড়িতে আমাদের আলাদা আলাদা নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের বিবৃতি নেওয়া হয়। সেদিনই এক জন ইংরেজ পুলিস অফিসারের নিকট আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি পুলিসের ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেল কিংবা ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর জেনেরেল ছিলেন। একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সামনেও আমরা সেদিন পেশ হলাম। তিনি আমাদের থানার হাজতে পৃথক পৃথক আবদ্ধ থাকার হুকুম দিলেন। কয়েকদিন আমাদের এভাবেই কাটল, কারুর খবর কেউ জানতাম না। তার পরে এক দিন আমাদের জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। এখানেও আমরা দূরে দূরে কুঠরিতে বন্ধ থাকলাম। রাত দিন কুঠরিতেই বন্ধ থাকতাম। যে দিন আমি প্রথম জেলে গেলাম তার পরের দিন ভোরে একজন ওয়ার্ডার এসে আমার কুঠরির দুয়ার খুলল। তার সঙ্গে দেখলাম কয়েদীর পেশাকে ডাণ্ডা বেড়ি পরিহিত মুহম্মদ আকবর খান রয়েছেন। তাঁকে ওই অবস্থায় ওখানে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। তিনি একটি পুটুলির ভিতরে কিছু তামাক, কাগজ ও চকমকি আমাকে দিয়ে ব'লে গেলেন—"আমি এই জেলেই আছি, ঘাবড়িও না।" কে জানত আমাদের কাফেলার নেতা মুহম্মদ আকবর খানকে জেলেও আমাদের সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখতে হবে। কি ভাবে তাঁকে জেলে আসতে হয়েছিল সে কথা পরে বলব। যতদিন আমি কুঠরিতে আবদ্ধ থেকেছি ততদিন কেউ না কেউ পেছনের ভেণ্টিলেটরের ভিতর দিয়ে আমায় তামাক ছুঁড়ে মেরেছে। অন্য বন্ধুদের বেলায়ও তাই

ঘটেছে। মুহম্মদ আকবর খানের ব্যবস্থা! দুমাস আমরা আঁধার কুঠরিতে কাটালাম। ইতোমধ্যে পেছনের লোকেরা পৌঁছে গিয়েছিল। আমাদের গিরেফ্‌তারের পরে তাদের গিরেফ্‌তার করা সহজ ছিল। ফৌজদারি দণ্ডবিধি আইনের (ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের) ১২১-এ ধারা অনুসারে আমাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হতে যাচ্ছিল। রাজ-সম্রাটকে (King-Emperor) ভারতের আধিপত্য (Sovereignty) হতে বঞ্চিত করার জন্যে ষড়যন্ত্র করা ছিল আইনের এই ধারার অপরাধ। এই ধারায় ও আরও কয়েকটি ধারায় কারুর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাতে হলে প্রাদেশিক কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে আগে মঞ্জুরী নিতে হত। মোকদ্দমা বিচার দায়রা আদালতে হতেই হবে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ অনুসন্ধান করা। আমাদের মোকদ্দমায় পেছনের লোকদের এসে পৌঁছানোর যেমন দরকার ছিল তেমনই দরকার ছিল মোকদ্দমা রুজু করার জন্যে সরকারের মঞ্জুরী গ্রহণ করা। এই দুটি কাজ সম্পন্ন হওয়ার পরে যেদিন আমাদের ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করানো হল সে দিন আমরা ম্যাজিস্ট্রেটকে অনুরোধ করলাম যে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুবিধার জন্যে জেলে আমাদের এক সঙ্গে রাখা হোক। ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের অনুরোধ মেনে নিয়ে হুকুম পাস করলেন। সেদিন থেকে জেলে আমাদের একত্রে রাখার ব্যবস্থা করা হল। এর তারিখটা আমার ঠিক মনে নেই। তবে যতটা মনে পড়ে তা ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শুরু ছিল।

যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হল :

১। মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ্‌
(নৌশহ্‌রা, পেশোয়ারের অধিবাসী)

২। গওহর রহমান খান
(হাজারা জিলার হরিপুরের সংলগ্ন দরবেশ গ্রামের অধিবাসী)

৩। মীর আবদুল মজীদ
(লাহোর শহরের বাশিন্দা)

৪। ফিরোজুদ্দীন মন্‌সুর
(শেখুপুরা শহরের বাশিন্দা)

৫। হবীব আহ্‌মদ নসীম
(যুক্ত প্রদেশের শাহ্‌জাহানপুরের বাশিন্দা)

৬। রফীক আহ্‌মদ
(ভোপাল রাজ্যের ভোপাল শহরের বাশিন্দা)

৭। সুলতান মাহ্‌মুদ
(হরিপুর, হাজারা)

৮। আবদুল কাদির সেহ্‌রাই
(পেশোয়ার)

৯। ফিদা আলী জাহিদ
(পেশোয়ার)

১০। গোলাম মুহম্মদ
(হাজারা জিলা)

প্রথম হতে নবম নম্বরের অভিযুক্তরা ভারতের প্রবাসী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিল। দশম নম্বরের অভিযুক্ত গোলাম মুহম্মদ বহু পূর্বে তাসকন্দ হতে দেশে ফিরে এসেছিল। সে কখনও কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়নি। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মোকদ্দমা আরম্ভ হওয়ার ক'দিন পরে তার নাম আসামীর তালিকায় যোগ করা হয়। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল তাকে রাজসাক্ষী করা। কমিউনিস্টদের ভিতর হতে ফিদা আলী জাহিদ রাজসাক্ষী হয়েছিল।

মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ্‌ ও গওহর রহমন খান ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরে স্বাধীন উপজাতিদের এলাকায় চলে গিয়েছিল। ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যখানে স্বাধীন উপজাতিদের বসতি ছিল। তারা না ছিল আফগানিস্তানের প্রজা, না ছিল ভারতের। আমরা গিরেফ্‌তার হওয়ার পরে গওহর রওমান ও আকবর শাহ্‌ দেশে ফিরে এসে গিরেফ্‌তার হয়।

হাঁ, সেই যে হোটেলের মালিক আমাদের বাড়ির ঠিকানা নিয়েছিলেন সেই অনুসারে সব জায়গায় তিনি পত্রও লিখেছিলেন। বেশীর ভাগ লোকের বাড়ি হতে আত্মীয়রা এসেও গিয়েছিলেন। পেশোয়ার আর হাজারার অভিযুক্তদের আত্মীয়রা তো অমনিতেই খবর পেয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করি নি। ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা সরকার পক্ষ কায়দা-কানুনের খেলাফ কিছু করেছেন কিনা তার ওপরে নজর রাখার জন্যে একজন উকীল মাত্র নিযুক্ত করা হয়েছিল।

গোলাম মুহম্মদকে আসলে রাজসাক্ষী করার জন্যে মোকদ্দমায় শামিল করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকার সুবিধার জন্যে সম্ভবত সে নীচের আদালতে আমাদের পক্ষেই সাক্ষ্য দিল। সাক্ষ্য পক্ষেই দিক, আর বিপক্ষেই দিক, একজন আসামী যখন সাক্ষ্য দিচ্ছিল তখন তাকে সঙ্গে রাখা আমাদের উচিত হয় নি। সেশন আদালতে মোকদ্দমা যখন শুরু হল তখন তাকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। সেশন কোর্টে সে চুটিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল। ফিদা আলী জাহিদ গোড়া থেকেই আলাদা ছিল। নীচের আদালতে সাক্ষ্য সে আমাদের বিরুদ্ধে দিয়েছিল। কিন্তু দায়রার আদালতে গিয়ে সে তার নীচের আদালতের সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান

করে। সরকার পক্ষের কি চাল এটা ছিল তা জানি না, তবে এরা দুজনে রাজসাক্ষী হিসাবে ক্ষমা ও ছাড়া পেয়েছিল।

সেশন কোর্টে মোকদ্দমার তদবীর ভালোই হয়েছিল। আমাদে কোনো কোনো বন্ধুর বাড়ির লোকেরা টাকা খরচ করেছিলেন। বিখ্যা উর্দূ সাহিত্যিক ও আইনজীবী (পরে লাহোর হাইকোর্টের জজ) স্যা আবহুল কাদির আমাদের পক্ষে এসেছিলেন। শুনেছিলাম তিনি ফিস ক নিয়েছিলেন। আমার মনে হয় তাঁর মতো আইনজীবী আমাদের পক্ষে থাকার জন্যে আমাদের সাজা কম হয়েছিল। সেশন কোর্টে দুজন এসেস ছিলেন। তাঁরা আমাদের নিরপরাধ বলেছিলেন। তবে, এসেসরদের কথা জজ মানতে বাধ্য নন।

১৯২৩ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে (দুর্ভাগ্য যে তারিখ মনে নেই) জজ মোকদ্দমার রায় শোনালেন। রাজসাক্ষী দুজন তো ছাড়া পেল আর ছাড়া পেল পরবর্তী কালে কমিউনিস্টদের ঘোর শত্রু আবহুল কাদি সেহ্রাই।

যারা দণ্ডিত হয়েছিল :

১। মিঞা মুহম্মদ আকবর শাহ্ ও

২। গওহর রহমান খান, প্রত্যেকের দুবছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

৩। মীর আবহুল মজীদ, ৪। ফিরোজুদ্দীন মনস্থর, ৫। রফী আহ্মদ, ৬। হবীব আহ্মদ নসীম ও ৭। স্থলতান মাহ্মুদ, এই পাঁ জনের প্রত্যেকের এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

এইভাবে ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার পরিসমাপ্তি ঘটে। আমরা আমাদের সাজার বিরুদ্ধে আপীল করি নি। [১৯২৩ সালের মে মা দ্বিতীয় সপ্তাহে কানপুরে শওকৎ উস্মানী, কলকাতায় মুজফ্ফর আহ্মদ ও লাহোরে গো হোসায়ন গিরেফ্তার হন। ভারত গবর্নমেণ্ট তাঁদেরও পেশোয়ারের মোকদ্দমায় শামিল ক চেয়েছিল। শওকৎ উস্মানী আর গোলাম হোসায়নকে তো পেশোয়ার জেলে নিয়েও যাওয়া ছিল। কিন্তু পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা তখন শেষ হয় হয়। বোধ হয় সেই জন্যেই এই তিন জ ওই মোকদ্দমায় আসামী না করে ১৮১৮ সালের ৩ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে বন্দী করা হয়। পরের বছরের মার্চ মাসে তিন জনকেই কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমায় অভিযু হয়েছিল। ক্ষমা চেয়ে গোলাম হোসায়ন ছাড়া পেয়ে যায়। কানপুর মোকদ্দমায় শ্রীপা ডাঙ্গে আর নলিনী গুপ্তেরও বিচার হয়েছিল।]

এখন আমাদের ওপরে ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু বলি। ম্যাজিস্টেটের কোর্টে মোকদ্দমার অনুসন্ধান আরম্ভ হওয়ার আগে আমাদের বেড়ি পরানো হয় নি। যেদিন এই কোর্টে অনুসন্ধান শুরু হল সেদিনই আমাদের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হল। সেশন কোর্টে রায় শোনানোর দিন পর্যন্ত এই বেড়ি আর খোলা হয় নি। সাজা হওয়ার দিন আমাদের বেড়ি খুলে দেওয়া হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যাদের তিন বছরের সাজা হত তাদের বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হত। তার কম সাজা হলে বেড়ি পরানো হত না। কয়েদী হিসাবে আমরা কোনও বিশেষ ব্যবহার পাই নি। সাধারণ মামুলি কয়েদীর ব্যবহার আমরা পেয়েছি। আমাদের সাজার দিনগুলি পেশোয়ার সেণ্ট্রাল জেলে কেটেছে। একটি কথা বলা দরকার। ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে চলেছিল। এই প্রদেশটি ব্রিটিশ আমলে একটি নিষিদ্ধ স্থান ছাড়া আর কিছু ছিল না। এই জন্যে আমাদের মোকদ্দমার খবর বিশ্বময় তো দূরের কথা, ভারতময়ও প্রচারিত হয় নি।

মুহম্মদ আকবর খান

মুহম্মদ আকবর খানের কথা আমি বারে বারে বলেছি। তাসকন্দ পর্যন্ত আমরা একত্রে গিয়েছি। সেখানে তিনি বেশী দিন থাকেন নি, যদিও তিনি আমাদের সঙ্গে মিলিটারি স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টিতেও তিনি যোগ দেন নি। ইংরেজের কবল হতে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন। ধর্মোন্মাদনার বশে কিংবা আনাতোলিয়া গিয়ে তুর্কির হয়ে লড়াই করার জন্যে তিনি ভারত ছাড়েন নি। পার্টির নির্দেশে তিনি গোপনে দেশে ফিরেছিলেন। স্বাধীন উপজাতির এলাকায় একটি প্রেস বসিয়ে তা থেকে ইশ্তেহার ছাপানো ও বিতরণের ব্যবস্থা করা ছিল তাঁর কাজ। প্রেস কিনে তিনি স্বাধীন এলাকায় পাঠাতেও পেরেছিলেন। প্রেসের কিছু জিনিস পাঠাতে বাকী ছিল। এই বাকী জিনিসগুলি পাঠানোর আগে তিনি খবর পান যে তাঁর দেশে ফেরার খবর পুলিশ পেয়ে গেছে। বন্ধুরা উপদেশ দিলেন, আপাতত তাঁর স্বাধীন উপজাতীয় এলাকায় গিয়ে কিছুদিন থাকা উচিত। তাই তিনি ডাক্তারের বেশে উপজাতির এলাকায় যাচ্ছিলেন, সীমানায় ধরা

পড়ে যান। তাঁর নামেও ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা চলে। সেশন আদালত তাঁকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জেল হতে গোপন পথে তিনি তাঁর একজন সহকর্মীকে একখানা পত্র লিখেছিলেন। সহকর্মীটি নিরাপদে এই পত্র পেয়েও গিয়েছিলেন। পত্রে উপদেশ ছিল যে প্রেসের বাকী জিনিসগুলি যেন স্বাধীন উপজাতীয় এলাকায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় উপদেশ ছিল তিনি যে ধরা পড়েছেন সে-খবর যেন সোনালী দাঁত ওয়ালাকে পাঠানো হয়। মুহম্মদ আকবর খানের সহকর্মী প্রেসের বাকী জিনিস নিয়ে যখন সীমানা পার হতে যাচ্ছিলেন তখন ধরা পড়েন। তার পরে তাঁর বাড়ি তলাশী হয়। সেখানে মুহম্মদ আকবর খানের গোপন পথে পাঠানো পত্রখানা পুলিস পেয়ে যায়। এই বোকা সহকর্মীটি সযত্নে আকবর খানের পত্র বাড়িতে রেখে দিয়েছিলেন। এই পত্র পাওয়ার পরে মুহম্মদ আকবর খানের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে দ্বিতীয় ষড়যন্ত্রের মোকদ্দমা চলে। তাঁর সহকর্মীটিও তাতে অভিযুক্ত হন। পুলিসের মতে সোনালী দাঁতওয়ালা মুহম্মদ আলী ছাড়া আর কেউ নন। মুহম্মদ আলীর কথা আমি আগে বলেছি। দ্বিতীয় মোকদ্দমায় মুহম্মদ আকবর খানের ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়, আর তাঁর সহকর্মীর হয়েছিল ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। মুহম্মদ আকবর খানের দুটি সাজা পরে পরে চলেছে। জেল হতে গোপন পথে পাঠানো একখানা পত্রের জন্যে যে কারুর বিরুদ্ধে পেনাল কোডের ১২১-এ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা চলতে পারে এটা কেউ কোনো দিন কল্পনাও করতে পারে নি। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সত্যই তা ঘটেছিল।

যাঁরা আনাতোলিয়ায় গেলেন

আনাতোলিয়ায় যাঁরা গিয়েছিলেন শুনেছি তাঁদের যুদ্ধ করতে হয় নি। তাঁদের ভাগ্যে জুটেছিল কারাগার। অন্তত বেশ কিছু দিন তাঁরা কারাবন্দী ছিলেন। তাঁদের আনাতোলিয়া যাওয়ার আগে মুস্তফা নামে একজন ভারতীয় গুপ্তচর ওই দেশে ধরা পড়ে। এই লোকটি মুস্তফা সগীর নামে কুখ্যাত হয়েছিল। 'সগীর' মানে ছোট। অর্থাৎ, মুস্তাফা কামাল ছিলেন বড় মুস্তফা

শুনেছি কিছু কাল পরে এই ভারতীয়দের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা দেশে ফিরে আসতেও পেরেছিল। আশা করি শেষ পর্যন্ত তাদের জ্ঞানোদয় হয়েছিল। এই লোকগুলির মধ্য হতেই কেউ কেউ তুর্কমেনদের হাতে মার খেয়েও তুর্কমেন মৌলবীদের হাতে তাদের টাকা তুলে দিয়েছিল। আবার তুর্কমেনদের নিকট হতে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা পেয়ে বেঁচে যাওয়ার পরেও এরাই কিকিতে তুর্কমেনরা মুস্‌লিম ছিল বলে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল না। এসব বুঝেও লালফৌজরা তাদের কত আদর যত্ন ও সাহায্য করেছিলেন !



সাহিত্যমেলা ; পুনশ্চ

অন্নদাশঙ্কর রায়

সাত বছর আগে যখন শান্তিনিকেতনে আমরা কয়েকজন আশ্রমিক ও ছাত্র মিলে সাহিত্যমেলা ডাকি তখন আমাদের উদ্দেশ্য ছিল বিভাগোত্তর বাংলা সাহিত্যের উভয় ধারার পাঁচ বছরের হিসাবনিকাশ। পশ্চিমবঙ্গের ধারাটির সঙ্গে এপারের সকলেই পরিচিত। পূর্ববঙ্গের ধারাটির সঙ্গে অপরিচিত। তাই পূর্ববঙ্গ থেকে আমরা জনা পাঁচেক বাছা বাছা সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ করি ও তাঁদের পাথেয় বহন করি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁদের নিমন্ত্রণ করি তাঁরা শান্তিনিকেতন আসছেন বলে নিজের পাথেয় নিজে বহন করেন। বলাবাহুল্য একবার এখানে পৌছনোর পর প্রত্যেকেই হন আমাদের অতিথি। সে ক'টা দিন খুব আনন্দে কাটে। পূর্ব-পশ্চিমের মিলনের জন্যে শান্তিনিকেতন বিখ্যাত। সেবার যা হল তা পূর্বপশ্চিম বঙ্গের মিলন। সেই প্রথম। সেই শেষ।

তার পরে আমার কাছে প্রস্তাব আসে প্রতিবেশী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। যাঁর মারফত আসে তিনি ভারত সরকারের অন্যতম উপমন্ত্রী। আর একটি সাহিত্যমেলার পক্ষে এঁদের বিশ্বাস শান্তিনিকেতনই উপযুক্ত ক্ষেত্র। এ মেলা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যিকদের। তা বলে সারা ভারতের নয়। নিকটতম প্রতিবেশী রাজ্যের। পশ্চিমবঙ্গের, উৎকলের, আসামের। আমি তার সঙ্গে মনে মনে যোগ করি আরো কয়েকটি ভাষা। নেপালী, মৈথিলী, মণিপুরী। হিন্দীকে ইচ্ছা করেই বাদ দিই। কারণ হিন্দী এ পরিবারের অন্যতম ভাষা নয়। ভোজপুরী এ পরিবারের। কিন্তু ভোজপুরীকে ডাকলে হিন্দী ভাববে আমরা তার ঘর ভেঙে দেবার তালে আছি।

আমার আশঙ্কা ছিল যে হিন্দীর দিক থেকে আমাদের ভুল বোঝা হতে

কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। দ্বিতীয়বার সাহিত্যমেলা না ডাকার আরো অনেক কারণ ছিল। এখানকার একদল লোকের বিশ্বাস যে শান্তিনিকেতনে মেলা ডাকতে হলে ডাকবে বিশ্বভারতী। আমাদের মতো বাইরের লোক নয়। আমাদের পিছনে সনদ নেই। আমরা যা করেছি অনধিকারচর্চা। এখন বিশ্বভারতী হল কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কেন্দ্রের সঙ্গে হিন্দীর সম্পর্ক যেন কর্তার সঙ্গে গৃহিণীর। পর্দানশীন হলেও গৃহিণী তো বটে। বিশ্বভারতী কেমন করে হিন্দীকে বাদ দিয়ে সাহিত্যমেলা ডাকে? আর হিন্দীকে সুদ্ধ ডাকলে মেলার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হল। সেটা ছিল বাঙালী, ওড়িয়া, অসমীয়াকে মেলানো। এই তিনটি ভাষা স্বতন্ত্র হলেও এদের মধ্যে পারিবারিক সাদৃশ্য আছে। এরা তিন বোন। একসঙ্গে উঠলে বসলে এই তিন রাজ্যের সাহিত্যিকদের মধ্যে সম্প্রীতির বিকাশ হবে।

দ্বিতীয় সাহিত্যমেলার প্রস্তাবটা এমনি করে মাঠে মারা যায়। আমিও আর অনধিকার চর্চা করিনে। বিশ্বভারতীও ততদিনে পুরোদস্তুর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত। বিশ্বের সঙ্গে ভারতকে, ভারতের এক প্রান্তের সঙ্গে অপরাপর প্রান্তকে মেলানো হয়তো একসময় তার প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের সংকল্প ছিল। সে সংকল্প থেকে ততদিনে সে অনেক ক্রোশ সরে এসেছে। আমার সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। তার সাধ্য থাকলেও সাধ ছিল না। সুতরাং সাহিত্যমেলার জন্যে পরে আমাকে বহুলোক সাধুবাদ দিলেও, নানা দিক থেকে তার জন্যে দাবি উঠলেও, আমি সম্পূর্ণ উদাসীন ও নিষ্ক্রিয়। অর্থাভাবে নয়। মেলায় আমাদের খুব বেশি খরচ হয় নি। যেটুকু দরকার সেটুকু তুলতে প্রথমটা কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু পরে দেখা গেল টাকা আপনি আসছে। লোকে বাড়ি বয়ে চাঁদা দিয়ে যাচ্ছে।

এখন এসব কাহিনী গাইতে বসেছি কেন? কারণ এখন মনে হচ্ছে সকলের সব কটুকথা হজম করে বাঙালীকে অসমীয়ার সঙ্গে একঘাটে জল খাওয়ানো আমার পবিত্র কর্তব্য ছিল। "ঘাট" মানে পবিত্র তীর্থ। শান্তিনিকেতন সেইরকম একটি ঘাট। এখানে অসমীয়াদেরও সমান অধিকার। বহু অসমীয়া ছাত্রছাত্রী এখানে অধ্যয়ন করেছেন ও করছেন। কেউ এঁদের পর মনে করেন না। কিন্তু সম্প্রতি যেসব কাণ্ড ঘটে গেল তার

ফলে এঁরাও এখন কম্পমান। বাঙালী ও অসমীয়ার মধ্যে যে ভেদবুদ্ধি ইংরেজও জাগাতে পারেনি সে ভেদবুদ্ধি আপনা থেকে জেগেছে। এর রাজনৈতিক প্রতিকার যাঁরা জানেন তাঁরা করবেন। তাঁদের কাজ আমরা করতে পারব না। কিন্তু এর প্রতিকার তো কেবল রাজনৈতিক না। সাহিত্যিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিকারও আছে। না, অর্থনৈতিক প্রতিকারও আমাদের দ্বারা হবে না। হলে হবে সাহিত্যিক ও সামাজিক প্রতিকার। সাহিত্যমেলা সেই অভিমুখে একটি ক্ষুদ্র পদক্ষেপ। এখন এর দায়িত্ব নিচ্ছে কে? আমি এবার অক্ষম। আমার সেসব সহকর্মীরাও আর নেই। থাকলেও তাঁদের হয়তো অন্য মত।

অথচ শান্তিনিকেতন ভিন্ন এমন একটি ঘাটের নাম আমার জানা নেই যে ঘাটে বাঙালীতে অসমীয়াতে এক ঘাটে জল খাবে। স্থানমাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে। এই সেই স্থান। "এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরেই" ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা মিলিত হয়ে বিরোধ ভুলতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে মহানদীকেও ডাকতে হবে। আর তিস্তাকেও। ওড়িয়া এবং নেপালী সঙ্গে সম্প্রীতি দুর্ঘটনার অপেক্ষা রাখে না। এবার হিন্দীতেও আমার আপত্তি নেই। শুধু আসতে হবে সমান হয়ে।

ঋত

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অথর্বন্‌দের সঙ্গে যে-অঙ্গিরস্‌দের নাম থেকে অথর্ববেদের আদি-নামকরণ, ঋগ্বেদের প্রাচীন অংশের কবিরাও তাঁদের সুদূর অতীতের অসীম শক্তিশালী জাদুকর বলে স্মরণ করেছেন এবং সেই সঙ্গেই স্মরণ করেছেন যে তাঁরা ছিলেন ঋতবান্ বা ঋত-যুক্ত। ঋত মানে কী?

কোনো এক আদিম ধ্যানধারণার পরিচায়ক বলেই আধুনিক প্রতিশব্দের সাহায্যে ঋত-র সম্যক্ পরিচয় সম্ভব নয়। তবুও বৈদিক চিন্তা-চেতনার ইতিহাসে এই ধারণাটির গুরুত্ব প্রায় অপরিসীম। কেননা দেখেছি, প্রাচীন বৈদিক কবিরা মূলতই পার্থিব সম্পদের কামনায় বিভোর; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি তাঁরা কোনো অমূর্ত চেতনায় একান্তই উপনীত হতে পেরে থাকেন, যদি তাঁরা বিশ্বের সামগ্রিক রহস্য উপলব্ধির একান্তই কোনো পরিচয় দিয়ে থাকেন, যদি তাঁদের রচনায় বিশ্বসংসারের সঙ্গে মানবসত্তার সম্পর্কমূলক কোনো বোধ একান্তই প্রতিফলিত হয়ে থাকে—সংক্ষেপে, ঋগ্বেদের প্রাচীন পর্যায়ে প্রকৃত দার্শনিক চেতনার কোনো আভাস যদি সত্যিই স্বীকৃত হয়—তাহলে তার মূলসূত্র এই ঋতর মধ্যেই সন্ধান করতে হবে।

প্রথমে দেখা যাক, আধুনিক বিদ্বানেরা কীভাবে শব্দটির ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। ভিন্‌টারনিথ্‌স্‌-এর মতে, ঋত মানে *order of the universe*—বিশ্বের নিয়মানুবর্তিতা। ম্যাক্‌ডোনেলের মতে, ঋত মানে শুধু জড়জগতের নিয়মানুবর্তিতাই নয়, নৈতিক নিয়মানুবর্তিতাও—*physical and moral order*। শব্দটির বিবিধ তাৎপর্যের ব্যাখ্যায় তিনি মন্তব্য করছেন:

The notion of this general law, recognised under the name *rita* (properly the "course" of things), we find in the

Rigveda extended first to the fixed rules of the sacrifice (=rite), and then to those of mortality (right).

কীথ্-এর মতে, ঋত মানে বিশ্বের নিয়মানুবর্তিতা এবং নৈতিক নিয়মানুবর্তিতা, উভয়ই : The term for cosmic order, *rita*, and *its* opposite *anrita*, express also moral order.

অতএব ঋত-র মূলে কোনো এক অমোঘ নিয়মের চেতনাই অনুমিত হয় এবং সে-নিয়ম সর্বব্যাপী : প্রাকৃতিক নিয়ম, যজ্ঞের নিয়ম, মানবীয় সম্পর্কের —তথা নৈতিক জীবনের-নিয়ম। এই বিশ্বব্যাপী অমোঘ নিয়মানুবর্তিতার বোধ বৈদিক কবিদের চেতনাকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল তারই কিছু নমুনা দেখা যাক : "ঋত-র প্রভাবেই প্রভাতে উষার উদয় ; ঋত অনুসারেই পিতৃগণ আকাশে সূর্যকে স্থাপন করেছিলেন। সূর্যের জ্যোতি ঋতরই মূর্ত আর গ্রহণের অন্ধকার ব্রত বা নিয়মের বিপরীত। সংবৎসর ঋতরই দ্বাদশ অলযুক্ত রথচক্র। শ্বেত অপাক গাভীর গাঢ় রক্তিমাভ দুধের মূলেও ঋত পরিচালিত গাভীর ঋত। অরণি ঘর্ষণের ফলে জল ও ওষধির অন্তর্গত গুপ্ত যে আগুন মানুষের জন্য উন্মথিত হয় তাও ঋতরই শিখা। নদীর স্রোত ঋতরই নিয়মানুসারে প্রবাহিত।" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কোনো এক আদিম পর্যায়ের চিন্তাধারা, সন্দেহ নেই। তাই তার সঙ্গে নানা রকম পৌরাণিক কল্পনারও সংমিশ্রণ। কিন্তু এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে ঋত প্রসঙ্গে বৈদিক কবিদের এ-জাতীয় উচ্ছ্বাসের মূলে প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতার পর্যবেক্ষণ এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতার বোধ-জনিত এক আদিম বিস্ময়। এবং সেই সঙ্গেই মনে রাখা প্রয়োজন বৈদিক কবিদের কাছে ঋতর পরিকল্পনা কোনো নির্লিপ্ত জ্ঞান-আহরণের পরিচায়ক নয়। প্রাচীন পৌরাণিক কল্পনার সঙ্গে অনিবার্যভাবেই জড়িত হলেও আসলে তা জীবন-সংগ্রামের মূল সমস্যা ও তৎসংশ্লিষ্ট নানাবিধ পার্থিব কামনার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক :

অগ্নি ঋতর ধেনুগুলি আমাদের জন্য সমানভাবে আনয়ন করেছিলেন— "ঋতস্য ধেনাঃ অনয়ন্ত সস্রুতঃ"। অভীষ্টবর্ষী মিত্রাবরুণ যজমানগণের জন্য ঋত আনয়ন করেন এবং যজ্ঞকে প্রভূত করেন। হে ইন্দ্র, তুমি পুরাকালের ন্যায় অন্নের সংরক্ষক হও এবং ঋত-র আবাসস্থান ও ; তুমি আমাদের গো-

অন্বেষণে সহায়ক ও বন্ধু হও। হে মিত্রাবরুণ, হে অসুরদ্বয়, তোমরা ঋতযুক্ত, তোমরা উচ্চৈস্বরে ঋত ঘোষণা কর এবং এবং আমাদের গো ও জলযুক্ত কর। (হে মিত্রাবরুণ) তোমরা দুজনে ঋতযুক্ত, এবং তোমরা যজ্ঞকে গো-সমৃদ্ধ করায় অগ্রণী। যিনি ঋত-র উজ্জ্বল অনুগামীদের প্রতি দাতা এবং আদিত্যগণ যাঁকে বর্ধন করেন তিনি ধনযুক্ত হইয়া রথে আরোহণ পূর্বক বিদথে ধন-বিভাগ করতে যান। বহু অন্নবান জল অগ্নিকে বর্ধন করে এবং ঋত-র জন্মস্থানে তিনি স্রোতস্বিনীগণের সখা হন। ঋত-র পালক এবং ঋতযুক্ত অগ্নি ভগর ন্যায় মনুষ্যগণের নেতা। দ্যাবাপৃথিবীর ন্যায় উষা ঋতবতী ও ধনবতী। হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমাদের ঋত যথার্থ হউক যেন আমরা অন্নযুক্ত ধন লাভ করিতে পারি। আমাদের শ্রেষ্ঠ, পুরাতন পিতৃগণ (অঙ্গিরসগণ) যেমন ঋতকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন সেইরূপ তাঁহারা অরুণবর্ণ গো-সমূহকে অপাবৃত করিয়াছিলেন। পুরাকাল হইতে ঋত-র অনেক জল আছে, ঋত-র ধী-সমূহ বর্জনীয় পাপগুলিকে বিনাশ করে ; ঋত-র শ্লোকসমূহ বধিরদের কর্ণ-উন্মোচন করিয়াছিল। ঋত-র ধারণগুলি দৃঢ়, ঋত-র রূপগুলি মনোহর ; স্তোতাগণ ঋত-র নিকট প্রভূত অন্ন কামনা করে এবং ঋত-র দরুন গাভীগুলি সংগৃহীত হয় এবং গাভীগুলি ঋততে প্রবেশ করে। ঋত-কে তুষ্ট করিয়া স্তোতাগণ বল ও জল লাভ করে, ঋত-র দরুনই পৃথিবী শ্রেষ্ঠ গাভীগুলি দান করে এবং ঋত-র দরুনই পৃথিবী দুরবগাহা। পুরাকালে উষাগণ ঋতজাত সত্য ছিলেন, যাঁদের নিকট গমনমাত্রই ধনদান করিতেন এবং উক্থ্য দ্বারা স্তুতি করিলে তাঁহাদের নিকট হইতে অচিরে ধনলাভ ঘটিত। অশ্বিদ্বয়ের বন্ধু উষা গাভীগণের মাতা ও ঋত-র পালক। দেবী উষা ঋত-র আবাস জানিতেন এবং তিনি গাভীগুলি সৃষ্টি করেন। হে মিত্রাবরুণ, ঋত-র ইচ্ছা করিয়া কে তোমাদের প্রাপ্ত হইতে পারে? ঋত-র আবাসস্থলে আমাদিগকে রক্ষা কর, যজ্ঞাভিলাষীদিগকে পশু ও অন্ন দাও। তোমরা (বরুণ প্রভৃতিরা) ঋত-র সংরক্ষক, ঋত হইতে তোমাদের জন্ম এবং তোমরা ঋত-র বর্ধক, অনৃতের প্রবল শত্রু ; আমরা এবং অন্যান্য বীরেরা যেন তোমাদের আবাসস্থানে অন্নযুক্ত হইয়া সুখে থাকিতে পারি। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এগুলিকে অবশ্যই দার্শনিক চিন্তার নমুনা বলা যাবে না। পক্ষান্তরে

এগুলি সুস্পষ্টভাবেই ঋত-র গরিমা সংক্রান্ত প্রাচীন কবিদের উচ্ছ্বাসম... এবং এই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আদিম জীবন-সংগ্রামের সম্পর্ক সুস্পষ্ট। প্রাচীন কবিরা মনে করেছিলেন, বিশ্বব্যাপী ওই অমোঘ নিয়মানুবর্তিতার প্রভাবে তাঁদের পক্ষে জল, অন্ন, পশু প্রভৃতি জীবনধারণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি লাভ করা সম্ভব। অতএব এই ঋত-র পরিকল্পনার মধ্যে কোনো অধ্যাত্মবাদী বা ভাববাদী চিন্তার বীজ আবিষ্কার করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ভাববাদী ব্যাখ্যাকারেরা ঋগ্বেদেও ভাববাদের নজির আবিষ্কার করার উৎসাহে সে-চেষ্টা করে থাকেন। একটি দৃষ্টান্ত বিচা... করা যাক।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ মন্তব্য করেছেন, **Everything that is order... in the universe has *rita* for its principles. It correspond... to the universals of Plato. The world of experience is... shadow or reflection of the *rita*, the permanent reality which remains unchanged in all the welter of mutatio...** অর্থাৎ, ঋত-র সঙ্গে প্লেটো *Universal* বা ভাবসত্তা (*idea*) তুলনী... প্লেটো এই ভাবসত্তাগুলিকেই চরম সত্য বলে বিবেচনা করেছিলেন, পরিদৃশ্যমান মূর্ত জগৎটি এক অতীন্দ্রিয় ভাবসত্তাময় জগতের মিথ্যা ছায়ামা...

কিন্তু এ-তুলনা স্পষ্টতঃই অত্যদ্ভুত উদ্ভাবন-মাত্র। কেননা, সমগ্র ঋ... জুড়েই প্রমাণ রয়েছে, এই মূর্ত জগৎটিকে কেন্দ্র করেই বৈদিক কবিদের স... কল্পনা ও কামনা : জগৎকে কোনো এক অতীন্দ্রিয় ভাবসত্তার ছায়ামাত্র ক... করবার ক্ষীণতম আভাসও তাঁদের রচনায় খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। অব... সমস্ত জাগতিক ঘটনার মূলে তাঁরা কোনো-এক অমোঘ নিয়মানুবর্তিতা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু নিয়মানুবর্তিতার ধারণায় উপনীত হওয়া মানে জগৎকে তার ছায়া বিবেচনা করা নয়, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীকে ক্ষণি... মরীচিকা জ্ঞান করা নয়।

অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণ ঋতকে প্লেটোর ভাবসত্তার সঙ্গে তুলনা করেই ক্ষা... নন। তিনি আরো মন্তব্য করছেন, প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতার এই ধা... অচিরেই সর্বেশ্বরের স্থির ইচ্ছারূপে পরিগণিত হয় : **Soon this co... order becomes the settled will of a Supreme God**। ...

ঋগ্বেদের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করতে সম্মত না হলে এ-জাতীয় মন্তব্যের উপর আস্থা স্থাপন করা সুকঠিন। কেননা ঋগ্বেদের অর্বাচীনতম অংশবিশেষে যদিই বা কোনো এক সর্বেশ্বরের ধারণা আবিষ্কার করা সম্ভব হয় তাহলেও মনে রাখা প্রয়োজন ঋত-র ধারণা প্রকৃতপক্ষে ঋগ্বেদের প্রাচীনতর পর্যায়েরই পরিচায়ক এবং কালক্রমে—ঋগ্বেদের রচনাকালেই—বৈদিক কবিদের চেতনা থেকে তা বিলুপ্ত হয়। এ-বিলোপের তাৎপর্য অবশ্যই চিত্তাকর্ষক; কিন্তু আমরা পরে তার আলোচনায় প্রত্যাবর্তন করব। আপাতত দেখা যাক, বৈদিক দেবতাদের সঙ্গে ঋত-র সম্পর্ক কীভাবে পরিকল্পিত হয়েছে।

বৈদিক কবিরা অবশ্যই তাঁদের দেবতাদের গরিমা-বর্ণনায় বহু উচ্ছ্বাস ও অতিশয়োক্তি করেছেন এবং এগুলি থেকে আপাত-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, তাদের ধারণায় প্রাকৃতিক ঘটনাবলী বুঝি এই দেবতাদেরই ইচ্ছাধীন। কিন্তু যে-দেবতা প্রসঙ্গে এ-জাতীয় অতিশয়োক্তি সর্বাধিক—তাঁর দৃষ্টান্তই গ্রহণ করা যাক। তাঁর নাম বরুণ। বরুণের শক্তি এমনই অপরিসীম যে উড্ডীয়মান পক্ষিগণ তাঁর বল, তাঁর পরাক্রম, তাঁর ক্রোধ স্পর্শ করতে পারে না; জল ও বায়ুর গতি তাঁর বেগ অতিক্রম করতে পারে না। বরুণ বলবান, নেতা ও বহু লোককে পরিদর্শন করেন। তিনি অন্তরিক্ষগামী পক্ষীদিগের পথ জানেন, তিনি সমুদ্রে নৌকাসমূহের পথ জানেন; তিনি বিস্তীর্ণ, কমনীয় ও মহৎ বায়ুর পথ জানেন ; জ্ঞানবান লোক তাঁহার প্রসাদে সকল অদ্ভুত ঘটনা, যাহা সম্পাদিত হইয়াছে বা হইবে, সমস্তই দেখিতে পান। হে জগতের নায়ক বরুণ! তুমি অনেক বীরবিশিষ্ট, বহু লোকে তোমার স্তুতি করে, আমরা যেন তোমার গৃহে বাস করিতে পারি। জগতের ধারক অদিতির পুত্র (বরুণ) প্রকৃষ্টরূপে জল সৃষ্টি করিয়াছেন; বরুণের মহিমায় নদীসকল প্রবাহিত হয়, উহারা বিশ্রাম করে না, নিবৃত্ত হয় না; ইহারা পক্ষীদিগের ন্যায় বেগে ভূমিতে গমন করে। এমনকি সকলের চোখের প্রতিটি পলকই বরুণের নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সে নিয়ম দেবতাগণও অতিক্রম করিতে পারেন না। স্বভাবতই বরুণকে বারবার রাজা ও সম্রাট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত ঋগ্বেদে ইন্দ্রাদি দেবতাদের গৌরব-প্রসঙ্গে বহু পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া গেলেও বরুণের দৃষ্টান্তে তা পাওয়া যায় না—

তাঁর গৌরব বর্ণনায় বৈদিক কবিরা প্রধানতই জাগতিক ও নৈতিক নিয়মের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন : In marked contrast with Varuna has no myths related of him, while much is said about him (and Mitra) as upholder of physical and moral India, order. Varuna is a great lord of thc laws of nature.

এ-জাতীয় দৃষ্টান্ত থেকে আপাত-দৃষ্টিতে অবশ্যই মনে হতে পারে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ওই অসীম শক্তিশালী দেবতাটিরই আজ্ঞাধীন বা ইচ্ছাধীন বলে পরিকল্পিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বরুণের সঙ্গে ঋত-র সম্পর্ক বিচার করলে এ-কথা বোঝা যাবে।

মনে রাখা দরকার, সমগ্র বৈদিক দেবলোকে ঋত-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক বলতে বরুণেরইক (যদিও অবশ্যই বরুণের সঙ্গে প্রায়ই মিত্রও উল্লিখিত) এবং ঋত মানে বিশ্বব্যাপী এক অমোঘ নিয়মানুবর্তিতা। কিন্তু এই ঋত কি বরুণের ইচ্ছাধীন বা আজ্ঞাধীন? তা নয়। বস্তুত, সম্রাট বরুণ যে অমন অসীম শক্তিশালী তার কারণ তিনি ঋত-র পালক, ঋত-র ধারক, ঋত-র অনুগামী। "তোমরা রাজা, ঋত-র পালক (ঋতস্য গোপাঃ), সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয় (বলবান) ; তোমরা আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে ক্ষিপ্রদানশীল মিত্র ও বরুণ! অন্তরিক্ষ হইতে আমাদের অন্ন ও বৃষ্টি প্রেরণ কর।" (মিত্র ও) বরুণ ঋত-র প্রকাশক, ঋত-র বর্ধক ; কিন্তু ঋত-র সাহায্যেই তাঁদের পক্ষে উক্ত কার্যাবলী সম্ভব ; "ঋতেন যৌ ঋতবৃধৌ ঋতস্য জ্যোতিষঃ পতী ইতি তা মিত্রাবরুণা হবে॥" হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা উভয়ে ঋত-কে স্পর্শ কর, ঋত-র সাহায্যে ঋত-কে বর্ধন কর এবং যজ্ঞকে বর্ধন করার উদ্দেশ্যে নিজেদের বিস্তারিত কর। ঋত-র আবাস-স্থলে ঋত-আবৃত ভাবে মিত্রাবরুণ পরিদৃষ্ট হন। ঋতাবন্ বা ঋত-যুক্ত বিশেষণটি অতি-প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হলেও মিত্র ও বরুণ প্রসঙ্গেও দুর্লভ নয়।

এবং শুধু বরুণই নন। অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গেও ঋত-র যে সম্পর্ক পরিকল্পিত হয়েছে তা থেকেও স্পষ্টই বোঝা যায় যে ঋত তাঁদের আজ্ঞাধীন বা আয়ত্তাধীন নয়, বরং তাঁরাই ঋত-র উপর নানাভাবে নির্ভরশীল। রাজা সোম-এর জন্ম ঋত থেকে এবং তিনি ঋত-র সাহায্যেই ঋতকে অত্যন্ত বর্ধন করেছিলেন : "ঋতেন যঃ ঋতজাতঃ বিবৃধে রাজা দেবঃ ঋতং বৃহৎ"।

এমনকি সোম-কে এই ঋত-র সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়েছে : "পবমানঃ ঋতঃ কবিঃ সোমঃ"। অগ্নিও ঋতজাতঃ—ঋত থেকেই তাঁর জন্ম। অশ্বিদ্বয়েরও জন্ম ঋত থেকেই। এবং ঋতজাত বলেই মরুৎগণ নিষ্কলুষ। ঋত-র দ্বারা স্রোতমান সোম ঋত উচ্চারণ করতে করতে ইন্দ্রের উদ্দেশে ক্ষরিত হন। বিশ্বদেবগণও ঋত-র ধারক। এবং এই ঋত-র সাহায্যেই অগ্নি অমরত্ব লাভ করেন : "ঋতম্ সপন্তঃ অমৃতম্ এবৈঃ"। ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ-জাতীয় আরো অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায় ; কিন্তু প্রয়োজন নেই। কেননা, এগুলি থেকেই স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে ঋত—বা বিশ্বব্যাপী ওই অমোঘ নিয়মানুবর্তিতা—দেবতাদের আজ্ঞাধীন বা আয়ত্তাধীন নয়, বরং দেবতারাই ঋত-র উপর নির্ভরশীল এবং ঋত-র অনুগামী। কীথ্-কেও অন্তত আংশিকভাবে এ-কথা স্বীকার করতে হয়েছে :

they (the gods) are reduced to a lesser grade in that they appear also as the charioteers of the *rita*, the furtherers of the *rita*, the guardians of the *rita*, something which therefore exists apart from them.

এইবারে আমরা একটি মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করতে পারি : ঋত-র পরিকল্পনার উৎস কী? আমরা আগেই দেখেছি, এমনকি ভাববাদী ব্যাখ্যাকারদের পক্ষেও এ-কথা অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি যে প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতার পর্যবেক্ষণ থেকে বৈদিক কবিরা ঋত-র পরিকল্পনায় উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু শুধু এটুকু বললেই সমস্যাটির সমাধান হয় না। কেননা আমরা আগেই দেখেছি, ঋত-র অর্থ শুধু প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতাই নয় ; কোনো এক অমোঘ নৈতিক নিয়মানুবর্তিতাও। এই নৈতিক নিয়মানুবর্তিতার বোধকে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

ঋত-র এই নৈতিক তাৎপর্য সংক্রান্ত বহু নজিরের প্রয়োজন নেই। আধুনিক বিদ্বানেরা প্রায় সকলেই তার ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু সাধারণত তাঁদের সিদ্ধান্ত এই যে ঋত-র পরিকল্পনায় ওই প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতা-মূলক উপাদানটিই আদিম ; তার থেকেই কবিরা ক্রমশ নৈতিক নিয়মানুবর্তিতার চেতনাতেও উপনীত হয়েছিলেন। কীথ্ বলছেন ঋত-র অর্থ

first cosmic then moral order ; কিংবা, from the physical it is an easy step to the conception of the *rita* not merely in the moral but also in the sphere of the sacrifice, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণণও এ-জাতীয় মন্তব্যই করেছেন। বস্তুত জাগতিক নিয়মের চেতনাই যে কালক্রমে নৈতিক নিয়মের চেতনাতেও বিকশিত হয়েছিল— এ-কথা আধুনিক বিদ্বানদের রচনায় প্রায় একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মতোই স্বীকৃত হতে দেখা যায়।

অবশ্যই এ-জাতীয় সিদ্ধান্তের পক্ষে বৈদিক সাহিত্যের কোনো আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা কারুর পক্ষেই সম্ভব হয় নি। হয়তো বৈদিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যই এমন যে এ-জাতীয় কোনো সুস্পষ্ট সাক্ষ্য সংগ্রহের সুযোগ নেই। অতএব অনুমান হয়, আধুনিক বিদ্বানেরা একটি সাধারণ প্রকল্পের উপর নির্ভর করেই এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেয়েছেন : বিচার-বিশ্লেষণের দিক থেকে নৈতিক নিয়মের চেতনা জাগতিক নিয়মের চেতনার পরবর্তী হতে বাধ্য ; অতএব ঋত-র পরিকল্পনাতেও উভয় উপাদানের মধ্যে দ্বিতীয়টি পরবর্তী।

এতএব এই সিদ্ধান্তের বিচারে আমরাও কয়েকটি সাধারণ-মূল-সূত্র থেকে শুরু করতে পারি এবং তারপর ভেবে দেখা যেতে পারে বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে এই মূলসূত্রগুলির পক্ষে অন্তত কোনো পরোক্ষ সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় কিনা।

অধ্যাপক টম্‌সন্ মন্তব্য করছেন :

Man's consciousness of the external world was determined from the outset, not by the relations between the individual and his natural environment, but by the relations which he had established with his fellows in the development of production...... Only in this way is it possible to explain why the external world should appear so differently to peoples standing at different levels of culture...... Such developments only become intelligible when we understand that man's consciousness of the world around him is a

social image, a product of society. অর্থাৎ শুরু থেকেই বহির্জগৎ সংক্রান্ত মানুষের চেতনা ব্যক্তির সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের সম্পর্কের বদলে উৎপাদন-উন্নতির মাধ্যমে মানুষ তার সহচরদের সঙ্গে যে-সম্পর্কে উপনীত হয়েছে তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। একমাত্র এই দিক থেকেই বুঝতে পারা যায়, সংস্কৃতির বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন মানব-দলের কাছে বহির্জগৎ কেন এত বিভিন্নভাবে প্রতিভাত হয়। বহির্জগৎ সম্বন্ধে মানুষের চেতনা যে একটি সামাজিক প্রতিরূপ—সমাজেরই ফল—এই কথাটি হৃদয়ঙ্গম করলেই উক্ত উক্তিগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

অতএব, এই মূলসূত্রের উপর নির্ভর করে আমাদের পদ্ধতি অনুসারে প্রশ্ন তুলতে পারি, আদিম বা প্রাক্-বিভক্ত সমাজে আজও যে-সব মানব-দল টিকে আছে তাদের নৈতিক চেতনা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে জানতে-পারা তথ্য বলতে কী? এঙ্গেল্‌স্ বলছেন, The grandeur and at the same time the limitation of the gentile order was that it found no place for rulers and ruled. In the realm of the internal, there was as yet no distinction between rights and duties; the question of whether a participation in public affairs, blood revenge or atonement for injuries was a right or a duty never confronted the (Iroquois) Indian ; it would have appeared as absurd to him as the question of whether eating, sleeping or hunting was a right or a duty.

এবং The Tribe the gens and their institutions were sacred and inviolable, a superior power, instituted by nature to which the individual remained absolutely subject in feeling, thought and deed.

অর্থাৎ ট্রাইব্যাল ব্যবস্থার মহিমা এবং সংকীর্ণতা উভয়েরই আসল কারণ, সেখানে শাসক ও শাসিতের স্থান নেই। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তখনো অধিকার এবং দায়িত্বের মধ্যে কোনো প্রভেদ ফুটে ওঠে নি। জনসাধারণের কাজে অংশ-গ্রহণ, রক্তের-বদলে-রক্তমূলক প্রতিশোধ প্রভৃতি কাজ অধিকার না দায়িত্ব—এ প্রশ্ন ইরোকোয়াদের মধ্যে কখনো জাগে নি ; প্রশ্নটি তাদের

কাছে 'আহার, নিদ্রা, শিকার প্রভৃতি, দায়িত্ব না অধিকার?'—এই প্রশ্ন মতোই আজগুবি মনে হবে। ট্রাইব, ক্লান এবং তার সংগঠনাবলী পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয়—কোনো এক উচ্চতর প্রাকৃতিক শক্তির মতোই, যে শক্তির কাছে ভাবাবেগ, চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে ব্যক্তিমানব সম্পূর্ণভাবে অবনত। অতএব, এঙ্গেল্‌স্ এদিক থেকে প্রাচীন জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের সরল নৈতিক গরিমার (*simple moral grandeur of the ancient gentile society*) উল্লেখ করছেন, যে গরিমা সভ্য শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের লোভ, স্বার্থপরতা, লুণ্ঠন প্রভৃতির সামনে অবদলিত হয়েছে।

আমাদের যুক্তি হল, ঋগ্বেদে আদিম যৌথজীবনের নানা স্মারক থেকে যেহেতু অনুমান হয় বৈদিক মানুষেরাও প্রাচীন পর্যায়ে এই যৌথ-জীবন যাপন করতেন সেইহেতু তাঁদের চেতনাতেও ওই আদিম যৌথ-জীবনের এ আদিম অলঙ্ঘনীয় স্বতঃস্ফূর্ত ও অমোঘ নৈতিক বোধ—"প্রাচীন জ্ঞাতিভিত্তিক সমাজের সরল নৈতিক গরিমা"—অনুমিত হতে পারে। এবং সেই স্বরে বৈদিক মানুষদের বহির্জগৎ সংক্রান্ত চেতনাও যেহেতু এই সামাজিক সত্তার প্রতিরূপ সেইহেতু তাঁদের পক্ষে এক বিশ্বব্যাপী অমোঘ নিয়মানুবর্তিতার পরিকল্পনায় উপনীত হওয়াই সম্ভব। এবং এই দিক থেকেই তাঁদের রচনা ঋত-র পরিকল্পনাটির ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

এ-যুক্তিকে অবশ্যই সংস্কারগত বলে সমালোচনা করা হবে—কয়েকটি পূর্বস্বীকৃত মূলসূত্রের সঙ্গে যেন কোনোমতে বৈদিক নজিরগুলিকে খাইয়ে নেবার প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু এই যুক্তির পক্ষে বৈদিক সাহিত্যের চিত্তাকর্ষক—যদিচ পরোক্ষ—সাক্ষ্য সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। ঋত-র যদি আদিম যৌথজীবনের সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত নীতিবোধই অনুমিত হয় সেই যৌথ-জীবন ধূলিসাৎ হবার ফলে বৈদিক কবিদের চেতনা থেকেও কথা ক্রমশই বিলীন হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা দেখেছি, আদিম সমাজ থেকে সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আবির্ভাবের পটভূমিতে সুবিশাল বৈদিক সাহিত্য বিচার্য। অতএব সেই পটভূমিতেই বৈদিক সাহিত্যে সংরক্ষিত ঋত-র ইতিহাসটি বোঝবার প্রচেষ্টা বাঞ্ছনীয় হবে।

এবং বৈদিক সাহিত্যের আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য হল, বৈদিক কবিদের চেতনা থেকে ঋত-র পরিকল্পনা ক্রমশই মুছে যায়। ঋত-র সঙ্গে দেবতা

সুপ্রাচীন গৌরবও। কেননা, আগেই দেখেছি, বৈদিক দেবতাদের মধ্যে বরুণের সঙ্গেই ঋত-র সম্পর্ক মুখ্য বা প্রধান। ঋত-র এই ক্রম-বিলুপ্তি এবং তারই সঙ্গে বরুণের মহিমা হ্রাস অবশ্যই আকস্মিক বা অকারণ ঘটনা হতে পারে না। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে অনেকেই বৈদিক চিন্তা-চেতনার এই উল্লেখযোগ্য বিবর্তনটিকে প্রায় উপেক্ষাই করেছেন। কীথ-ই বোধহয় একমাত্র লেখক যিনি এই ঘটনার একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবার প্রয়াস করেছেন।

ঋত-র ধারণা যে বাস্তবিকই কত প্রাচীন তা দেখাবার জন্য কীথ ঋগ্বেদের সঙ্গে প্রাচীন ইরানীয় সাহিত্য আবেস্তার তুলনা করেছেন; আবেস্তা-তেও বিশ্বব্যাপী অমোঘ নিয়মানুবর্তিতার পরিকল্পনা পাওয়া যায় এবং সেই পরিকল্পনা-বাচক শব্দটির সঙ্গে বৈদিক শব্দ-ব্যবহারের নিকট-সাদৃশ্য থেকে অবশ্যই অনুমান হয় সুদূর ইন্দোইরানীয় যুগেই পরিকল্পনাটির সূত্রপাত :

In the physical world there rules a regular order, *rita*, which is observed repeatedly, and which is clearly an inheritance from the Indo-Iranian period, since the term asa (*arta*) is found in the *Avesta*, and has there the same triple sense as in Vedic India, the physical order of the universe, the due order of the sacrifice, and the moral law in the world...the identity of the Vedic and Avestan expressions is proved beyond possibility of doubt by the expression 'spring of *rita*', which is verbally indentical in the *Avesta* and the *Rigveda*.

শুধু ঋত-র পরিকল্পনাই নয়। কীথ্ আরও বলছেন, "বৈদিক বরুণ এবং আবেস্তার অহুর মাস্‌দা—এই দুটি দেব পরিকল্পনার মধ্যেও পার্থক্য করা যায় না; ঋগ্বেদের বরুণকে অসুর বলা হয়েছে, যদিও পরবর্তী সংহিতার অসুর শব্দটি দেবতাদের শত্রুবাচক এবং নিন্দাসূচক; অহুরের মতোই বরুণও ঋত-র পালক এবং অহুরের সঙ্গে মিথ্‌রর যেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বরুণের সঙ্গেও সেই রকম মিত্রর সম্পর্ক। কিন্তু এ-জাতীয় সাদৃশ্যের কথা ছাড়াও উভয় দেবতারই অমন নৈতিক গরিমার একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে উভয়েই এক

আদি পরিকল্পনার পরিণাম। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে বরুণের ইতিহাস বলতে এই নৈতিক গরিমার ক্রম-বিলোপ। এ-ঘটনার একমাত্র ব্যাখ্যা এই যে দেবতা হিসেবে তাঁর পরিকল্পনা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল এবং এখানের প্রতিকূল পরিবেশে তাঁর নৈতিক বৈশিষ্ট্য ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জরথুস্ট্রীয় বিশ্বাসে অহুরই ক্রমশ মহান এবং অদ্বিতীয় দেবতারূপে পরিণত হন; এ থেকেই বোঝা যায় ইরানী জনসাধারণের মধ্যে পরিকল্পনাটি আগে থেকেই প্রচলিত ছিল এবং তাই সংস্কৃত রূপ লাভ করে।"

অতএব কীথ্ সংক্ষেপে মন্তব্য করছেন, **the idea of *rita* is one which, like the moral elevation of Varuna, has no future history in India, pointing irresistibly to the view that it was not an Indian creation, but an inheritance which did not long survive its new milieu.**

অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে বরুণের নৈতিক গরিমার মতোই ঋত-র ধারণারও কোনো ভবিষ্যৎ নেই, এ থেকে অনিবার্যভাবেই বোঝা যায় ধারণাটি ভারতবর্ষীয় সৃষ্টি নয়, তার বদলে এটি একটি উত্তরাধিকার মাত্র এবং নতুন পরিস্থিতিতে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এই ধারণাটি টিকে থাকতে পারে নি।

কিন্তু ঋত এবং বরুণের এই ইন্দো-ইরানীয় উৎস স্বীকার করলেও প্রশ্ন থাকে, ভারতবর্ষে—অর্থাৎ ওই তথাকথিত নতুন পরিস্থিতিতে—দেবতাটির নৈতিক গরিমা এবং ঋত-র ধারণা টিকতে পারল না কেন? ভারতবর্ষীয় পরিবেশে এমন কী বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে যা অনিবার্যভাবেই নৈতিক মূল্যবোধের পরিপন্থী? বৈদিক মানুষদের চিন্তা-চেতনার এমন প্রকার পরিবর্তনকে দেশের জল-হাওয়া বা অন্যান্য ভৌগোলিক লক্ষণের দিক থেকে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই নেহাত স্থূল বস্তুবাদের পরিচায়ক হবে। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, সাধারণভাবে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার প্রতি তীব্র বিমুখতা সত্ত্বেও কীথ্ এ-জাতীয় একটি ব্যাখ্যাই উদ্ভাবন করেছেন। সংক্ষেপে তাঁর মত: ইরানের জীবন-সংগ্রাম সমস্যা সুকঠিন; কৃষিকাজ অবিরাম শ্রমের উপর নির্ভরশীল; তাছাড়া সর্বদাই ভ্রাম্যমান মানব-দলের আক্রমণ-সম্ভাবনা

কিন্তু ভারতবর্ষের "জল-হাওয়া, জীবনধারণ এবং জাতি-সংমিশ্রণমূলক" ভিন্ন পরিস্থিতিতে জীবনকে ভাল-মন্দের সংগ্রাম হিসেবে না দেখে চিন্তাধারা কর্ম-বিমুখ ও বিশুদ্ধ জ্ঞানাভিলাষী হয়েছে এবং অগ্রসর হয়েছে অদ্বৈত উপলব্ধির দিকে। এই পার্থক্যের ফলে জরথুস্ট্রের পক্ষে জগৎকে সামগ্রিকভাবে একই আত্মার দ্বারা প্রাণবন্ত মনে করা সম্ভব হয় নি; কিন্তু ভারতবর্ষে তা সম্ভব হয়েছে, সম্ভব হয়েছে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের পরিকল্পনায় উপনীত হওয়া—ভাল-মন্দ, চেতন-অচেতন সবই তার অন্তর্ভুক্ত। এই বিকাশেরই সমান্তরালভাবে ম্লান হয়েছে বরুণের শক্তি; যোদ্ধা ও জনসাধারণের দেবতা ইন্দ্রই শক্তিশালী ও জনপ্রিয় দেবতা হয়ে থেকেছেন। এবং একইভাবে ব্রহ্মণ পরিকল্পনার সামনে মুছে গিয়েছে ঋত-র চেতনা।

এ-বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ নেই যে বৈদিক চিন্তাবিবর্তনের পরিণাম হিসেবে দেখা যায় নীতি ও ন্যায়ের প্রতীক প্রাচীন দেবতা বরুণের পরিবর্তে যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের দেবতা ইন্দ্রের গরিমা প্রবল হয়ে উঠেছে, ক্রমশই লুপ্ত হয়েছে ঋত-র চেতনা, ক্রমশই নিন্দিত হয়েছে কর্ম এবং প্রশংসিত হয়েছে জ্ঞান এবং এ-সমস্তরই চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে শেষ পর্যন্ত বৈদিক চিন্তাশীলেরা এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের পরিকল্পনায় উপনীত হয়েছেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় পরিবেশের "জলবায়ু, জীবনধারণ এবং জাতি-সংমিশ্রণ-মূলক" বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করলেই বৈদিক চিন্তাবিবর্তনের এই সুদূর-প্রসারী পরিণামগুলির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে আমরা এখানে অপর একটি প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারি: বৈদিক সমাজের ক্রমবিকাশের মধ্যে কি আমরা এমন কোনো নতুন পরিস্থিতির পরিচয় পাই যা আলোচ্য সমস্যার উপর আলোকপাত করতে পারে? আমরা জানি, পশুপালন-মূলক অর্থনীতির ক্রম-বিকাশের ফলে কীভাবে বৈদিক মানুষদের মধ্যে যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের তাগিদ ক্রমশই বেড়ে যায় এবং তারই চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে অবসান ঘটে আদিম যৌথ-জীবনের। এবং আমাদের যুক্তি হল, এই নতুন পরিস্থিতির মধ্যেই ঋত-র বিলোপ সংক্রান্ত সমস্যার মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। বস্তুত সমাজ-জীবনে বিদথের বিলোপ এবং চিন্তাক্ষেত্রে ঋত-র বিলোপ পরস্পর-নিরপেক্ষ ঘটনা নয়।

পশুপালন-মূলক অর্থনীতির ক্রমবিকাশের পরিণামে যুদ্ধ-বৃত্তির বিকাশের নতুন পরিস্থিতিতে কোনো এক যুদ্ধ-নায়কের গরিমা প্রবল হয়ে ওঠাই

স্বাভাবিক। এবং এইদিক থেকেই রট্ ও হুইট্‌নির সিদ্ধান্তটির ব্যাখ্যা পাওয়া যায় যে ঋগ্বেদের রচনাকালেই ন্যায় ও নীতির প্রাচীন নায়ক বরুণকে অব-দলিত করে যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের নায়ক ইন্দ্রই প্রধানতম দেবতা হয়ে ওঠেন। তারই সমান্তরাল ঘটনা হিসেবে ঋত-র বিলোপ বুঝতে পারা সম্ভব। এ-বিষয়ে ঋগ্বেদের একটি আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য উদ্ধৃত করা যাক :

> হে ইন্দ্র, দুষ্ট মিত্ররূপী বাধাদানকারী মানব-দল আসিতেছে; তাহাদের নিকট হইতে ধন কাড়িয়া লইয়া এই পুণ্যদিনে আমাদিগকে দান কর। মায়াবী বরুণ আমাদিগের মধ্যে যে অনৃত (ঋত-বিপরীত) দেখেন তাহা দ্বিধাবিভক্ত করিয়া অপনোদন কর।

ঋক্‌টি ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশেরই অন্তর্ভুক্ত। স্বভাবতই অনুমান হয়, বৈদিক কবিরা তখনও ভুলতে পারেন নি যে ন্যায় ও নীতির প্রতীক বরুণের বিচারে লুণ্ঠন-মূলক কীর্তি ঋত-র বিপরীত বা অনৃত; ইন্দ্রের কাছে তাই বরুণের ওই বিচারকে অপনোদন করবার কামনা জানানো হয়েছে। কিন্তু দ্রষ্টব্য বিষয় হল, বৈদিক কবিদের মন থেকে ক্রমশই এ-জাতীয় সংকোচের স্মৃতিটুকুও মুছে যায় এবং তারই পরিবর্তে দেখা দেয় ইন্দ্রের যুদ্ধ ও লুণ্ঠনমূলক কীর্তির দ্বিধাহীন অসীম গরিমা। বলাই বাহুল্য, ইন্দ্রের এ-জাতীয় কীর্তির সঙ্গে প্রাচীনকালের ন্যায় ও নীতিবোধের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। মাত্র কয়েকটি নমুনা দেখা যেতে পারে :

"হে ইন্দ্র! (তুমি ভিন্ন) কে আপন মাতাকে বিধবা করিয়াছে? তুমি যখন শয়ান থাক অথবা সঞ্চরণ করিতে থাক, তখন কে তোমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে? কোন্ দেবতা সুখদান বিষয়ে তোমা অপেক্ষা বড়? কোন্ তুমি তোমার পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া পিতাকে বধ করিয়াছ" আর একটি ঋক্ থেকে অনুমান হয়, ইন্দ্র যে স্বীয় পিতাকে এইভাবে আছাড় মেরে হত্যা করেন তার কারণ সোমরস লাভের আকাঙ্ক্ষাই। মরুৎগণ যুদ্ধে একান্ত অনুগতের মতো তাঁর সহায়তা করেছেন—এমনকি অন্যান্য দেবতারা ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করলেও যে-মরুৎগণ ইন্দ্রের পক্ষ পরিত্যাগ করেন নি—সেই মরুৎগণকেও নির্মমভাবে লুণ্ঠন করায় ইন্দ্রের দ্বিধা নেই; Even his own subjects, the Maruts, he plundered justifying the royal habit of accepting loot plundered from the husband men: অহল্যাকে প্রতারণা করে ব্যাভিচারে লিপ্ত হতেও এই দেবতাটির কোনো দ্বিধা নেই। যতি বা যোগীদের হায়নার মুখে অর্পণ করা নিয়ে ইন্দ্র আস্ফালন করেছেন। নতুন ঋত-হীন পরিস্থিতির শ্রেষ্ঠ দেবতাটির এ-জাতীয় আরও অনেক কীর্তি উল্লেখ করা যায়।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল, বৈদিক যুগেই কোনো কোনো কবি নতুন ঋতহীন পরিস্থিতিকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাঁরা ঋতর নবজন্মের জন্য আকুতি প্রকাশ করেছেন। এ-জাতীয় জনৈক কবির নাম কুৎস। বৈদিক সাহিত্যে তাঁর সম্বন্ধে নানা রকম পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া যায় এবং ঋগ্বেদের একটি ঋক্ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি ইন্দ্রকে বেঁধে রেখেছিলেন। এই ঘটনাটি থেকেই অনুমান হয়, নতুন পরিস্থিতির ওই শ্রেষ্ঠ দেবতাটির বিরুদ্ধে—অতএব নতুন পরিস্থিতির বিরুদ্ধেও—তাঁর বিক্ষোভ ছিল। সে-বিক্ষোভেরই সুস্পষ্ট পরিচয় প্রথম মণ্ডলে সংকলিত তাঁরই রচনায় :

> সর্বদেবে আদিভূত সেই যজ্ঞকে আমি প্রশ্ন করছি।—তার দূতেরা সঠিকভাবে কথা বলুক। অতীতের সেই ঋত কোথায় গমন করছে ("ক্ব ঋতং পূর্বং গতম্")? কে সেই "নূতন" যিনি তাকে ধারণ করেন? আমার এই (উক্তি) জেনে রাখ, হে দ্যাবাপৃথিবী॥

ভাষ্যে "নূতন" শব্দটির ব্যাখ্যায় সায়ণ বলছেন, যদি সে-রকম কেউ থাকতেন তাহলে আমার এই বর্তমান অবস্থা হত না; অতএব সে-রকম কেউ নেই। এবং এই ব্যাখার সঙ্গে আলোচ্য সূক্তের অন্যান্য ঋক্-এর সঙ্গতি সুস্পষ্ট :

> ত্রিলোকে অবস্থানকারী দেবগণ, তোমাদের ঋত কোথায় অবস্থান করে? অনৃতই বা কেন (কোথায়)? অতীতের মতো তোমাদের আহুতিই বা কোথায়? আমার এ (উক্তি) জেনে রাখ, হে দ্যাবা-পৃথিবী॥ ৫॥
>
> দেবগণ, কোথায় গেল ঋত-র সেই ধারণ? কোথায় গেল বরুণের রাগ? কোথায় গেল অর্যমার ইচ্ছাপূরক কর্মের পথ? অতএব আমরা দুঃখে পতিত হয়েছি। আমার এই (উক্তি) জেনে রাখ, হে দ্যাবাপৃথিবী॥ ৬॥
>
> দুঃখ-নিবারক অন্ন-কারী বরুণকে আমি বলছি—আমি (এ-কথা) দৃঢ় হৃদয়ে বলছি—নূতন করে ঋত-র জন্ম হোক ("ব্রূর্ণোতি বৃহদা

মতিম্ নব্যো জায়তাম্ ঋতম্”)। আমার এই (উক্তি)

হে দ্যাবাপৃথিবী ॥ ১৭॥

“ক্ব ঋতং পূর্বং গতম্ ?”—অতীতের সেই ঋত কোথায় গেল ? “
হৃদা মতিং নব্যো জায়তাম্ ঋতম্”—দৃঢ়চিত্তে আমি ঘোষণা করছি, নতুন
ঋত-র জন্ম হোক। নতুন ঋতহীন পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদটুই
সমান সুস্পষ্ট অতীতের সেই অমোঘ নৈতিক নিয়মানুবর্তিতা এবং
পালক বরুণকে ফিরে পাবার আকুতি। প্রসঙ্গত, এই নতুন পরিস্থিতি
খুনের ভয়ে ভীত আর একটি বৈদিক কবি অতীতের যৌথ-জীবনকে
পাবার আকুতি প্রকাশ করেছেন :

আমাদের পিতৃগণের সংঘ পুনরায় আমাদের চিত্ত, প্রাণ এবং
প্রদান করুক ॥

“ব্রাত” মানে যে প্রাচীন যৌথ-সংগঠন এ-বিষয়ে গ্রন্থান্তরে দীর্ঘ আলো
করেছি। বর্তমানে মন্তব্য এই যে ওই ঋত-কে ফিরে পাবার আকুতি
“ব্রাত”-কে ফিরে পাবার আকুতি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, কেননা যৌথ-জীবন
স্বতঃস্ফূর্ত নিয়মানুবর্তিতার চেতনাতেই বৈদিক ঋত-র উৎস।

এই প্রবন্ধটি লিখতে নিম্নলিখিত বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

1. History of Indian Literature.
2. History of Sanskrit Literature.
3. Religion and Philosophy of the Vedas.
4. Vedic Mythology.
5. Indian Philosophy.
6. Cambridge History of India.
7. Studies in Ancient Greek Society.
8. Origin of the Family.
9. Journal of the American Oriental Society.
10. Vedic Index.
11. Lokayata.

শতাব্দীর বিচার

অশোক রুদ্র

‘আমরা সবাই খুনী’—জাঁ পল্ সার্ত্র্

অধ্যাপক ফাদার ফাঁলোর লেখায় একাধিক জায়গায় একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি যা আমার মনে বেশ খানিকটা চিন্তার উদ্রেক করেছে। তা হল এই। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বলে এসেছেন, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা বৈষয়িক, প্রাচ্য এবং বিশেষ করে ভারতীয় সভ্যতা আধ্যাত্মিক ; পাশ্চাত্ত্য সমাজের ভিত্তিতে বিরোধ, প্রাচ্য সমাজের ভিত্তিতে সমন্বয় ; পাশ্চাত্ত্য মানসের মূলগুণ রজঃ, প্রাচ্য মানসের মূল গুণ সত্ত্ব ; এবং এই সব কারণে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বিজ্ঞতর প্রাচ্য সভ্যতার কাছ থেকে উচ্চতর জীবনের মন্ত্র শিখতে হবে। ভোগপরায়ণ এবং ইন্দ্রিয়সর্বস্ব ইউরোপীয়রা শান্তির সন্ধানে একদিন এসে জড়ো হবে জীবনের গভীরতর সত্যের সন্ধানী প্রাচ্য পণ্ডিতদের পদতলে, ইত্যাদি। ফাদার ফাঁলো সবিনয়ে প্রশ্ন করেন, এসবই না হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু প্রাচ্যের সর্বাগ্রগণ্য যে বাংলা সাহিত্য তার মধ্যে কোথাও কোনো জটিল জীবনপ্রশ্নের আলোচনা পাওয়া যায় না কেন ? কটি বাংলা বই বছরে প্রকাশিত হচ্ছে যা পড়ে কোনো ইউরোপীয় কেন, কোনো বাঙালী পাঠকেরই খানিকটা নৈতিক উন্নতি হতে পারে ?

ফাদার ফাঁলো কথাগুলো ঠিক এভাবে অবশ্য বলেন নি। তিনি এমনভাবে বলেছেন যে তিনি অবাঙালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রশ্নে চিন্তাশীল বাঙালী পাঠকের জাত্যাভিমানে আঘাত লাগে না, তাকে চিন্তার খোরাক যোগায় মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে নীতিবাদ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত বললেই চলে। নৈতিক প্রশ্নের চুলচেরা বিচার যা ফাদার ফাঁলোর মাতৃভাষার অর্থাৎ ফরাসী ভাষার সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ইংরেজী, জর্মন, রুশ প্রভৃতি সাহিত্যেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে—কোথায় তার

চিহ্ন আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ? সমাজনীতিগত কিছু কিছু প্রশ্ন হয়তো কোনো কোনো লেখায় পাওয়া যায়। কিন্তু একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে তার মধ্যেও আনকোরা নূতন প্রশ্ন কিছুই নেই। সম্প্রতিকালে 'বহুরূপী' নাট্য সম্প্রদায় যে ইব্‌সেনের 'পুতুল খেলা' নাটকটিকে মঞ্চস্থ করে কলকাতার দর্শক সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করছেন তাতে শুধু বাংলা নাট্যসাহিত্যের দারিদ্র্যের ইঙ্গিতই পাওয়া যায় না, আমাদের আরও একটি নগ্নতা তাতে প্রকাশ পায়। সত্তর-আশি বছর আগে যা ছিল ইউরোপের মনোজগতে আন্দোলনকারী সমস্যা, আজ এতদিনে তা আমাদের কাছে একটা সমস্যা হিসেবে উঠল। শুধু তাই না। শুধু যে সমস্যাগুলির ধারণা আমরা ইউরোপের চিন্তাশীল লেখকদের কাছ থেকে পেয়েছি তা নয়, সমস্যা সমাধানগুলিতেও আমরা তাঁদেরই অনুকরণ করে থাকি। সমস্যা এবং সমাধান উভয়ই যেহেতু ধার করা, সেইহেতু একথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে বাংলা সাহিত্যে নীতিসম্পর্কে মৌলিক কোনো চিন্তাই নেই।

কিন্তু সামাজিক নীতিবাদই তো সব নয়। সামাজিক সম্পর্ককে উপেক্ষা করে স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো নীতিবাদ অবশ্য থাকতে পারে না, কিন্তু সামাজিক নীতিবাদের সীমানার ভিতরে পড়ে না এমন অঞ্চলও তো আছে ব্যক্তির ব্যবহারিক ও মানসিক জগতে। সেখানেও কি একরকম ছেড়ে অন্য রকম ব্যবহারের প্রশ্ন উঠতে পারে না? অর্থাৎ কোনো একটা বিষয়ে এমন তো একাধিক ব্যক্তিগত আচরণের পথ খোলা থাকতে পারে যাদের মধ্যে সামাজিক নীতির দিক দিয়ে বাছার কিছু নেই? সেখানে শ্রেয় কি প্রেয় কি এ প্রশ্নও তো ব্যক্তির মনে ওঠে। সেখানেও তো অনুসন্ধানের স্থান আছে। কিন্তু কোথায় সেই অনুসন্ধান-স্পৃহা বাংলা সাহিত্যে? বুর্জোয়া উদারনীতিবাদ এবং মার্কসবাদের ঢেউ লেগে বাংলা সাহিত্যে সামাজিক নীতিবাদের কিছু ঢেউ উঠেছিল, যদিও রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পর তা অনেক পরিমাণে স্তিমিত হয়ে পড়েছে, কিন্তু অন্য যে ধরনের অনু-সন্ধানের কথা তুললাম তার অনুপস্থিতি বাংলা সাহিত্যে আরও বেশি সম্পূর্ণ।

ফাদার ফাঁলো যেহেতু ক্যাথলিক সেইহেতু তিনি হয়তো বলবেন যে কারণ নীতিবাদ জিনিসটাই ভারতীয় ঐতিহ্যে অনুপস্থিত, তা সামাজিক হোক আর ব্যক্তিগতই হোক। ভারতীয় ঐতিহ্যে আছে ধর্ম, আচার

সংস্কার। বিবেক জিনিসটাই আমদানী করা জিনিস আমাদের আধুনিক সংস্কৃতিতে। এ ধরনের কথা আমরা শুনেছি, ফাদার ফাঁলোর না হোক অন্য ইউরোপীয় সমালোচকের মুখে। আমরা ফাদার ফাঁলোর চিন্তামার্গের পথিক নই, অতএব এ ধরনের ব্যাখ্যা আমাদের সন্তোষ দেয় না। কিন্তু আমাদের সাহিত্য ও আমাদের সংস্কৃতিতে নীতিগত ব্যাপারকে যে ঘোলাটে ও অপরিষ্কার করে রাখা হয় তা অস্বীকার করি কি করে?

প্রশ্নটা মনে নূতন করে উঠল সার্ত্রের সর্বশেষ নাট্য-অবদান Les Sequestres d'Altona (বা "আলটোনার অজ্ঞাতবাসী") পড়তে পড়তে। নৈতিক প্রশ্নের উত্থাপন ছাড়া সার্ত্র্ কলম ধরতেই জানেন না। শুধু তাই না, নৈতিক প্রশ্নের উত্থাপন ছাড়া কলম ধরা গেলেও সাহিত্যসৃষ্টি মোটে হতে পারে না, এ-ধরনের একটা জোরালো মতও তিনি পোষণ করেন এবং প্রচার করেন। সাহিত্যে প্রগতি সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার থেকে সার্ত্রের মতের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে এবং তা বেশ মৌলিক রকমের। গদ্য সাহিত্য—তা প্রবন্ধ বা উপন্যাস বা নাটক যে আকারই ধারণ করুক—এবং অন্যান্য সব শিল্পমাধ্যম—অর্থাৎ কাব্যসাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতির মধ্যে তিনি একটা ভেদ টানেন। ভেদের ভিত্তি এই যে তাঁর মতে একমাত্র গদ্য সাহিত্যই অর্থবাহক, অন্যান্য শিল্পমাধ্যমগুলি কোনো অর্থ বহন করে না, ইঙ্গিত ও প্রতীকের মারফত তারা শিল্পীর মানসিক অভিজ্ঞতাকে দর্শক এবং শ্রোতার মনোগোচর করে মাত্র। গদ্যসাহিত্যের মাধ্যম হচ্ছে চিহ্ন—যে চিহ্ন বুদ্ধিগ্রাহ্য বাণীর বাহক। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সঙ্গীত ইত্যাদি মানুষের মনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে বস্তু মাত্র। বস্তু অর্থনিরপেক্ষ, তার সংঘাতে মনে নানা প্রকার ভাবোদয় হতে পারে কিন্তু কোনো অর্থ তারা বহন করে না। আকাশের রঙে যেমন কোনো অর্থ নেই, ছবির রঙও তেমনি নিরর্থক। কোনো সাধারণ জীবিত স্ত্রীলোকের চেহারা মনে যে-ভাবই জাগাক তার মধ্যে অর্থ যেমন কিছুই নেই, ভিনাস দ্য মিলোর প্রতিকৃতিও ঠিক সেই রকমই অর্থহীন। কবিতাও তাই। কবিতাও অবশ্য শব্দনির্ভর এবং শব্দ অবশ্যই অর্থবাহক, অন্তত সাধারণভাবে। কিন্তু সার্ত্রের মতে কবিতায় শব্দের ব্যবহার অর্থবাহক চিহ্ন হিসেবে নয়, বস্তু হিসেবে, যে বস্তুর ধ্বন্যাত্মক ও চিত্রধর্মী গুণাবলীর সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্ট ধারণাপুঞ্জকে মিলিয়ে সব জড়িয়ে অন্য একটি

বস্তুতে পরিণত করা হয়, যার নাম কবিতা। গদ্য হল সম্পূর্ণই ব্যবহারিক। মানুষের নিত্যব্যবহার্য অন্যান্য হাতিয়ারের সঙ্গে তুলনীয় এও একটা হাতিয়ার বা যন্ত্র—মানুষের মনে অর্থবাহক বাণীর যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ট। কাব্য বা স্থাপত্য বা ভাস্কর্য বা সঙ্গীত—এদের কারও প্রসঙ্গেই একথা প্রযোজ্য নয়।

অর্থবহন না করে এক পংক্তি গদ্যও যখন লেখা যায় না তখন একমাত্র গদ্যভঙ্গিতে লিখিত সাহিত্যসৃষ্টিই লেখকের জীবন সম্বন্ধে, সমাজ সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে। সে দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো সামাজিক নৈতিক প্রশ্ন ও সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞান বা নিরপেক্ষ, আর নয়তো লেখকের জীবনদর্শন অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন বিশেষ বিশেষ ভাবে তাঁর সৃষ্ট গদ্যসাহিত্যে উঠতে বাধ্য। এখন বিরোধ, সংঘাত এবং সমস্যা যখন মানুষের সামাজিক জীবনের অন্তর্স্থিত এবং তার থেকে অবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত জীবনেও মানুষকে যখন পদে পদেই এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যার উত্তর সব দেওয়া হয়ে যায় নি তখন গদ্যসাহিত্যে যদি এদের সজ্ঞানে প্রতিফলিত করা না হয় তাহলে লেখক তাঁর গদ্য-মাধ্যমের সুষ্ঠু ব্যবহার করছেন না বলতে হবে। অর্থাৎ গদ্য যেহেতু অর্থবাহক সেহেতু **lucidity**ই গদ্যসাহিত্যের চরম উৎকর্ষ একথা মেনে নিতে হয়। আর বাস্তব যখন প্রশ্ন ও সমস্যা-সংকুল তখন বাস্তবের কোনো একাংশেরই **lucid** বর্ণনা সমস্যা ও প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারে না। এর থেকেই এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় যে উৎকৃষ্ট গদ্য-সাহিত্যকে সমস্যামূলক ও নৈতিক হতে হবেই। সার্ত্র্ এখানেই থামেন না। তিনি আরও এগিয়ে যান। তিনি বলেন **word is action**। action মাত্রেরই ফল বাস্তবে কিছু না কিছু কোনো না কোনো পরিবর্তন আনা। অতএব **word**-এরও তাই। কিন্তু পরিবর্তন তো কখনও নিরপেক্ষ হতে পারে না। বাস্তবকে কোন্ দিকে পরিবর্তন করা হবে তা নির্ভর করছে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির উপর। অতএব নিরপেক্ষ গদ্যসাহিত্য সম্ভবই নয়, গদ্যসাহিত্য মাত্রকেই engagé হতে হবে।

সার্ত্রের এই যুক্তির সবটুকু আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। একটু যেন জবরদস্তির ভাব আছে মনে হয়। সাহিত্যিক মাত্রকেই engagé হতে হবে একথা মানি, কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টি মাত্রকেই সমস্যামূলক হতে হবে না

engagé হতে হবে তা আমার কাছে একটু আশ্চর্য ঠেকে। (হয়তো আমি সার্ত্রের বক্তব্যকে ভুল বুঝেছি; তাহলে তাঁর কাছে মাপ চেয়ে রাখছি।) 'গোরা' উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলে কি 'কাবুলিওয়ালা' নয়? জোলার Germinal উচ্চস্তরের গদ্যসাহিত্য কিন্তু মোপাসঁর The Necklace কি নয়?

সে যাই হোক, দর্শনের প্রাক্তন অধ্যাপক জ্যাঁ পল্ সার্ত্র্ এমন এক পাতাও সারাজীবনে লেখেন নি যার মধ্যে কোনো জীবনপ্রশ্নের আলোচনা নেই। সার্ত্র্ অনেকদিন নীরবে ছিলেন। পঞ্চদশদশকের প্রথমার্ধে তিনি ফরাসী কমিউনিস্ট সাহিত্যিক-গোষ্ঠীর এবং বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সঙ্গে অনেকখানি সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। হাঙ্গেরীর শোচনীয় ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়ায় তিনি নিজেকে আবার খানিকটা দূরে সরিয়ে নেন, যদিও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির মূলগত কোনো পরিবর্তন হয়নি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় হাঙ্গেরীর ঘটনাবলী সম্পর্কে লিখিত এক সুদীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধের শেষাংশে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে অন্য যে-কোনো দেশের চেয়ে বেশি আশা করেন বলেই যে তিনি তার সমালোচনায় রত হয়েছেন, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির তুলনায় সোভিয়েতের পররাষ্ট্রনীতি যে খারাপ নয় এধরনের যুক্তি যে একবারেই অচল একথা বলে তিনি লেখেন, "যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন ধন-তান্ত্রিক ইংল্যাণ্ডের চেয়ে ভালও না হয়, খারাপও না হয় তাহলে বস্তুতই আমাদের তো বাড়িতে বাগানের কাজে রত হওয়া ছাড়া অন্য কিছুই বাকি থাকে না"।

কিন্তু ছাপ্পান্ন সনের পর থেকে যে সমস্যা সার্ত্রের মনে উত্তরোত্তর বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে তার উৎস ফ্রান্সের আভ্যন্তরিক রাজনীতিতে, এই কালে ফ্রান্সে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে ফাসীবাদ। আলজিরিয়ার রক্তক্ষয়ী সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রাম একটা দুরারোগ্য রোগের মতো ফ্রান্সের ক্ষয়ের কারণ হয়ে ওঠে। এই বিশেষ ঔপনিবেশিক সংগ্রামটি ফ্রান্সকে শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকে নয়, নৈতিক দিক থেকেও যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে আর কোনো ঔপনিবেশিক সংগ্রাম বোধহয় অন্য কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশে তা ঘটায় নি। তার কারণ আলজিরিয়ার ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় জনতার সঙ্গে ফ্রান্সের জনতার নানান প্রকার ঘনিষ্ঠ পারিবারিক তথা অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে, যার ফলে আলজিরিয়ার সংগ্রামে ফ্রান্সের জনতার, এমনকি মেহনতী

জনতারও একটা বড় অংশই, স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের সমর্থন জানাতে অসমর্থ হয়েছে। প্রতিক্রিয়ার এই বিষাক্ত ও ব্যাপক প্রভাব ফরাসী সমাজ-মানসকে একেবারে দূষিত করে দিয়েছে। আজকের দুনিয়ায় nationalism-এর চেয়ে বড় শত্রু সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবের খুব বেশি নেই। এই nationalism-এর সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল রূপকে জাগিয়ে তুলে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা ফ্রান্সে ফাসীবাদী শক্তির ডাকিনী-যোগিনীদের আহ্বান করে এনেছে। উদার-নৈতিকতার এই পরাজয়, শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলনের এই আপেক্ষিক পঙ্গুতা ফ্রান্সের প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের নিরতিশয় শোক ও হতাশার কারণ হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে আরও একটি ব্যাপার বিশেষভাবে ফরাসী বুদ্ধিজীবী (ও অন্যান্য প্রগতিকামী)-দের কাছে গভীর লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় হয়েছে, তা হল আলজিরীয় (তথা আলজিরীয়দের সাহায্য-প্রদানকারী ফরাসী) বন্দীদের উপর ফরাসী পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ঘাতকদের শারীরিক পীড়ন বা **torture**-এর প্রয়োগ।

গত মহাযুদ্ধে হিটলারীয় আর্যবীরেরা সমস্ত ইউরোপময় বর্বরতার যে চূড়ান্ত পরিচয় দিয়ে যায় তার লজ্জার ভারে জর্মনি এখনও ধূলিতে মিশে রয়েছে। কনসেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পগুলিতে য়িহুদি ও অন্যান্য বন্দীদের লাখে লাখে যেভাবে বীভৎসরকমে উৎপীড়িত করা হয় এবং পরে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় তার স্মৃতি গোটা ইউরোপের মনে একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মত এখনও চেপে বসে আছে। এ-ধরনের জিনিস যে একটা হতে পারল তার কারণ গোটা ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যেই নিহিত আছে একথা মেনে নিয়েও জর্মনির বাইরে অন্যান্য দেশের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে জর্মন সংস্কৃতির উপর দোষ চাপানোর একটি ক্ষমনীয় মনোভাব দেখা দেয়। ভাবটা ছিল এই, "ফ্রান্সে এরকম কাণ্ড কখনও হতে পারত না", "ইংল্যাণ্ডে এরকমটি কখনও হতে পারত না।" কিন্তু আলজিরিয়ার বন্দীদের উপর শারীরিক উৎপীড়ন ব্যবহার করা হচ্ছে এ খবর যখন ফ্রান্সের প্রগতিবাদী জনসাধারণ ও বুদ্ধিজীবীদের কানে এসে পৌছল তখন আত্মপ্রতারণার এক বিশাল ইমারত তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। অবশ্য এটা ঠিক নাৎসী কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্পের সঙ্গে তুলনীয় কিছু এখনও ফ্রান্সে হয় নি, হবার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু সার্ত্রের মতো নীতিবিচারীদের কাছে একজনের এবং

একলক্ষজনের উপর শারীরিক উৎপীড়নের মধ্যে মূলগত কোনো প্রভেদ আছে বলে চোখে পড়ল না। আরও বেশি যা হতাশার কারণ হল তা এই যে এই খবরের প্রকাশ সমাজের ক্ষুদ্র একটি অংশের মধ্যেই লজ্জা, ভয় ও গভীর উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করল, কিন্তু সাধারণ জনসাধারণেব ক্রোধ যে উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে ফেটে পড়বে এমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। মুষ্টিমেয় কিছু অক্লান্ত যোদ্ধা নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন এই বর্বরতার প্রতিবিধানের জন্য এবং ফরাসী জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে এর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবার জন্য। ফরাসী সরকার ও ফরাসী ফাসিস্ত এ দুপক্ষের থেকেই যে তাদের প্রতিকূলতা শাস্তি ও ভীতিপ্রদর্শন পেতে হয় তা তো বলাই বাহুল্য। এই যোদ্ধাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন সার্ত্র্, যিনি নিজের লেখনীর মারফত যতটা সম্ভব এই আন্দোলনকে সাহায্য করছেন।

সার্ত্রের লেখার সঙ্গে যাঁরাই পরিচিত আছেন তাঁরাই জানেন সামাজিক নীতির ব্যাপারে সার্ত্রের একটা ব্যক্তিগত অপরাধীমন্য ভাব আছে। সামাজিক অন্যায় থেকে যে কেউই কোথাও কষ্ট পাচ্ছে সমাজের অন্তর্গত একজন হিসেবে তিনিও এবং আর সকলেই সেই অন্যায়ের দায়িত্বের ভাগী—এরকম একটা ভাব তার মনে অত্যন্ত শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। মনে পড়ে আলজিরীয় কমিউনিস্ট পার্টির এক নেতা অঁরি আলেগ (Henri Alleg) বন্দী অবস্থায় অকথ্য শারীরিক পীড়ন সহ্য করেও মুখ ফুটে একটা কথাও পেট থেকে বার করেন নি। তাঁর অভিজ্ঞতা একটি ছোট পুস্তিকাকারে লিপিবদ্ধ করে তা কোনোমতে তাঁর বন্দীশালা থেকে বার করে ছাপানোর বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হন। সেই বইটি পড়ে সার্ত্রের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল একটি প্রবন্ধ লেখা যার শিরোনামা ছিল, "NOUS SOMMES TOUS DES ASSASSINS" অর্থাৎ "আমরা সবাই খুনী"। ক্যাথলিক লেখকদের লেখায় পাপবোধ যেরকম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে, এই অপরাধবোধও সার্ত্রের সামাজিক নীতিবোধের কেন্দ্রস্থানীয়।

এই খুনের অপরাধের ভাগী হওয়ার বোধকে কিভাবে আর্টের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন এই হয়ে এসেছে সার্ত্রের সাহিত্যচিন্তার উপলক্ষ গত কয়েক বৎসর যাবৎ। কিভাবে সমস্যাটাকে উত্থাপিত করবেন, কিভাবে সেটাকে একটা নাটকের বিষয়বস্তু করবেন তা ভেবে স্থির করতে পারেন নি বলেবছর

কয় তিনি কিছু লেখেন নি, যদিও ফ্রান্সের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট এবং তজ্জনিত সমগ্র ফরাসী জাতির খুনের অপরাধে অপরাধী হওয়া সম্পর্কে যে তিনি লিখতে ইচ্ছুক তা অনেক সময়েই প্রকাশ করেছেন। একটা শিল্পগত সমস্যা যা তাঁকে চিন্তিত করেছিল তা এই যে খুব তাজা, খুব গরম, দর্শকের আঁতের খুব কাছের কোনো সমস্যাকে নাটকের বিষয়বস্তু করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। এই সমস্যাটিকে যে তিনি সমস্যা হিসেবে দেখছেন তাতেই প্রকাশ পায় যে নাট্যাদর্শের দিক দিয়ে তিনি বেরটোল্ট ব্রেখ্‌টের (Bertolt Brecht) কাছে ঘেঁষিয়ে এসেছেন। ব্রেখ্‌টের নাট্যাদর্শের অন্যতম মূল সূত্রই এই যে দর্শককে নিরাসক্ত থাকতে দিতে হবে, যাতে করে বুদ্ধিদ্বারা সম্যকভাবে সে নাটকের যে সমস্যা তার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারে। ব্রেখটের নাট্যরচনা ও মঞ্চপরিচালনার অন্যতম প্রধান মূলনীতিই হল দর্শককে মোহিত না করে, তাকে আত্মবিস্মৃত হতে না দিয়ে তাকে নাটকের কাহিনী যে নিছক কাহিনী সে সম্বন্ধে সজাগ রেখে, তাকে আবেগের আন্দোলনে না ডুবিয়ে তার বুদ্ধি ও বিচারকে স্থির ও অবিচলিত রাখা। এই নীতিটার নামকরণ হয়েছে **Distanciation**—অর্থাৎ মঞ্চের জগৎ এবং দর্শকের মধ্যে যথাযথ একটা **distance** বজায় রাখা। সার্ত্র্‌ শেষ পর্যন্ত তাঁর **distanciation**-এর উপায় হিসেবে তাঁর নাটকের বিষয়বস্তুকে চালান করে দিলেন ফ্রান্স থেকে জর্মানিতে, আর আলজেরিয়ার যুদ্ধ সংক্রান্ত অপরাধের ছদ্মবেশ পরিয়ে দিলেন জর্মানদের যুদ্ধকালীন অপরাধে। ফরাসী দর্শক মঞ্চে নাটকটা দেখার সময়ে খুব বেশি আলোড়ন অনুভব করবে না নিজের মধ্যে, তার কারণ ঘটনাটা ঘটছে জর্মনিতে, অপরাধগুলো যুদ্ধকালীন জর্মনদের অপরাধ যাদের কিনা সবাই নিন্দা করেছে এবং এখনও করছে। কিন্তু একটা অস্বস্তির ভাব থেকে যাবে। বাড়ি ফিরে গিয়ে হঠাৎ মনে হবে "কিন্তু এ জর্মনদের এবং আমাদের মধ্যে তফাত কই? -তাহলে আমরাও তো সকলেই খুনী!"

নাটক দেখবার জিনিস, পড়বার নয়, অন্তত মূলত নয়। ব্রেখ্‌ট্-এর নীতি অনুযায়ী রচিত নাটক বিশেষ করে এমনই জিনিস যে তার অভিনয় না দেখলে তার রসই ভালো করে গ্রহণ করা যায় না। সার্ত্রের নাটকটি এক বছর যাবৎ পারীর মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে, দর্শক আকর্ষণের দিক থেকে সাফল্যের

কোনো অভাব নেই, ফ্রান্সের বাইরে জর্মনিতেও অভিনীত হয়েছে। আমার অবশ্য দেখার সুযোগ হওয়ার কোনো কথাই নেই, বইটি পড়েছি মাত্র। একবার পড়ে অন্তত আমি নাটকটির নাটক হিসেবে উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দেহাতীত হই নি। যদিও বিজ্ঞাপনে বলা হচ্ছে এটিই নাকি সার্ত্রের সাহিত্যকীর্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অভিনয় না দেখে কিছুই বলতে পারছি না জোর করে।

নাটকের মূল আখ্যানভাগ হচ্ছে এক জর্মন যুবকের নিজ অপরাধবোধের থেকে পালিয়ে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রচেষ্টা এবং তার ব্যর্থতা। ফ্রান্টসের বাবা জর্মনির বৃহত্তম ধনিকগোষ্ঠীর একজন। জাহাজ তৈরির কারবার তাঁর। ফ্রান্টস্ আদর্শবাদী তরুণ, তার কোমল মন রূঢ় আঘাত পায় যখন সে জানতে পারে তার বাবা নাৎসী সরকারকে একটা প্রান্তর বেচেছে একটা কনসেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প বসানোর জন্য। বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ফ্রান্টস্ এক পোলিশ য়িহুদিকে ক্যাম্প থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। S.S.-এর দ্বারা ফ্রান্ট্‌স্ বিপদগ্রস্ত হয়, ফান্ট্‌সের বাবা খোদ গোয়েবেলস্‌কে টেলিফোনে যোগাযোগ করে ছেলেকে বাঁচাতে সমর্থ হন। S.S. রক্ষী ফ্রান্টস্‌কে ছেড়ে দেয়, কিন্তু তার চোখের সম্মুখে পোলিশ পলাতকটিকে হত্যা করে। এই হত্যার দৃশ্য ফ্রান্টসের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং তার মধ্যে sadistic লিপ্সার জন্ম দান করে। কিন্তু তা তখনও প্রকাশ পায় না। ফ্রান্ট্‌স্ বোঝে, তার পক্ষে আত্মবলি সম্ভবই না, আত্মবলির চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ধনীর দুলালের খেয়াল খেলায় পরিণত হয়। নিজেকে বলি দেওয়ার তাগিদে যুদ্ধে যোগ দিয়ে সে একটার পর একটা বীরত্ব দেখিয়ে যায়, এক ডজন পদক সে অর্জন করে। কিন্তু নিজের হাত থেকে পালাতে পারে না। শেষ পর্যন্ত লেফটেনেন্ট হিসেবে যুদ্ধে রত থাকাকালে সে তার sadistic লিপ্সার কাছে আত্মসমর্পণ করল। রুশ বন্দীদের উপর শারীরিক পীড়ন প্রয়োগ করে সে তার ঘৃণ্য লিপ্সা চরিতার্থ করতে শুরু করল। এই থেকে জাগে তার দ্বিতীয় অপরাধবোধ এবং এই অপরাধবোধ মিশে যায় নাৎসী নেতাদের কৃত অপরাধের ভাগী হিসেবে অপরাধবোধের সঙ্গে। তারই সঙ্গে দেখা দেয় আরেক দ্বন্দ্ব—জর্মনি কি সত্যিই অপরাধী? "সবাই নিরপরাধ না সবাই অপরাধী?" যুদ্ধের পর দেশে ফিরে এসে এক ঝঞ্ঝাটে জড়িয়ে পড়ে; কোনো এক আমেরিকান অফিসারকে মারার অভিযোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে

তাকে আর্জেন্টিনা পালিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হয়। কিন্তু তাকে আর্জেন্টিনায় না পাঠিয়ে তার বাবা তাঁর বাড়িরই একটা কামরায় তাকে লুকিয়ে রাখেন। কিছুদিন পর, যখন ফ্রান্টস্ কৃত যুদ্ধকালীন অপরাধের খবর এসে পৌছয় তখন ফ্রান্টসের বাবা রটিয়ে দেন যে ফ্রান্টস্ আর্জেন্টিনায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। কিন্তু বদ্ধঘরে থাকতে থাকতে ফ্রান্টস্ উত্তরোত্তর বিকৃতমস্তিষ্ক হয়ে ওঠে। মানুষজনের সঙ্গে দেখা করা সে একেবারেই বন্ধ করে দেয়। একমাত্র তার বোন তার ঘরে ঢুকতে পায় তার সেবাযত্ন করার জন্য। পুঞ্জীভূত অপরাধবোধের তাড়নার হাত থেকে বাঁচবার জন্য ফ্রান্টস বিকৃতমস্তিষ্ক কল্পনা করে, পরাভূত জর্মনি বিজয়ীদের পদতলে নিষ্পেষিত হচ্ছে, বিজেতারা জর্মনদের উপর ঠিক সেই ধরনের নৃশংসতা প্রয়োগ করছে যেমন করেছিল জর্মনরা তাদের বন্দীদের উপর। জর্মনি শ্মশানের অবস্থা পাচ্ছে উত্তরোত্তর, জর্মন জাতির অস্তিত্বই লোপ পেয়ে যাবে দুনিয়া থেকে। এই কথা ভেবে ফ্রান্টসের পীড়িত বিবেক খানিকটা শান্তি পায়। জর্মনরাই একমাত্র অপরাধী নয়, সেই একমাত্র অপরাধী নয়। উন্মাদ অবস্থায় সে তখন জর্মন অ-জর্মন সব মিলিয়ে যে বিংশশতাব্দীর বিভীষিকা ইতিহাস তার জন্য উৎকণ্ঠা বোধ করতে শুরু করে। ভবিষ্যতের লোকেরা কি মনে করবে আমাদের এই শতাব্দী সম্পর্কে? মানুষই বোধ হয় থাকবে না তখন, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অন্য কোনো প্রাণী হয়তো তখন দুনিয়ায় মানুষের স্থান অধিকার করবে। জরতপ্ত কল্পনায় ফ্রান্টস্ দেখে ভবিষ্যৎ শতাব্দীতে কাঁকড়ারাই হয়ে উঠেছে পৃথিবীর মালিক, তারা একটা বিচার সভা বসিয়েছে বিংশ শতাব্দীর অপরাধাবলী বিচারের জন্য। ফ্রান্টস্ সেখানে বিংশ শতাব্দীর একমাত্র সপক্ষ সাক্ষী, মানবতার একমাত্র উকিল—আপ্রাণ চেষ্টা সে করছে সেই tribunal-এর চোখে বিংশ শতাব্দীর অপরাধের ভার লাঘব করতে। হ্যাঁ, বিংশ শতাব্দী অপরাধের ভারে, হত্যা মারামারি নিপীড়নের ভারে ভারাক্রান্ত। তবু, হে দূর শতাব্দীর অধিবাসীগণ, আমরা কি অবস্থায় ছিলাম তা একটু সহানুভূতি নিয়ে বুঝবার চেষ্টা করো। যেন কাঁকড়া জনতাকে উদ্দেশ করে কথা বলছে এমনভাবে সে একা তার বদ্ধ ঘরে বক্তৃতা দিয়ে যায়। "হে প্রিয় শ্রোতৃগণ, আমার শতাব্দী ফেলাদামে বেচে দেওয়া হয়েছিল। মনুষ্যজাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দে

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল উঁচু মহলে।…মানবজাতির মৃত্যু হয়েছে। আমি তার রয়েছি সাক্ষী।…মানুষ জাতির আর্জি শোন, 'আমাদের নিজেদের কাজ, আমাদের কথা, আমাদের কুকুরের জীবন আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।…আমাদের শতাব্দীকে জঞ্জালের ঢিবিতে ফেলে দিয়ো না। আমার কথা শোনার আগে নয়। হে মাননীয় বিচারক মহাশয়গণ, একমাত্র কাঁচামালই ছিল কু। আমাদের সংশোধনাগারে তার শোধন হত। তৈরী মালটা ছিল সু। ফল—সু সুপরিণত হল কু-এ!'…" যতদিন পর্যন্ত ফ্রান্টস্ বিশ্বাস রাখতে পেরেছিল যে জর্মনি সত্যিই বিজেতাদের শোষণ ও অত্যাচারে মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে ততদিন সে এ-ধরনের প্রলাপ বকে বকে বেঁচে থাকতে পেরেছিল। কিন্তু কাহিনীর ঘটনা-পরম্পরা তার এই মিথ্যার পাঁচিলকে টিকতে দিল না। একদিন সে জানতে পারল জর্মনিকে ঋণ শোধ করতে হচ্ছে না। সে ভাবে, জর্মনি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ফেটে পড়ছে, তার বাবার কারবার আবার ফেঁপে ফুলে উঠেছে। এর পর আর সে বাঁচতে পারল না। আত্মহত্যা করে সে তার পনেরো বছরের অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে দিল।

প্রলাপ অবশ্য শুধুই প্রলাপ নয়। পাগলের প্রলাপের মধ্যে দিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত দার্শনিক যে নিজেই তাঁর শতাব্দীর হয়ে ওকালতি করছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই শতাব্দীর আর কিছু না থাক অন্তত লজ্জা বোধ করার ক্ষমতা ছিল, এর আগের কোনো শতাব্দীর তা ছিল না। "আমার শতাব্দীই প্রথম লজ্জার পরিচয় পেল।…সে জানে যে সে নগ্ন। সুন্দর শিশুগণ, তোমরা তো আমাদেরই থেকে জাত। আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে তোমাদের সৃষ্টি। এই শতাব্দী একটি রমণীবিশেষ, সে প্রসব করে, তোমাদের জননীকে অপরাধী সাব্যস্ত করবে কি?"

সার্ত্র্ জানেন যে শতব্দীর জন্য দায়িত্ব বোধ করা তাঁর পক্ষে হাস্যকর। ফ্রান্টসের বিষয়ী পিতার মুখ দিয়ে তিনি বলেন, "কিছু করার নেই যার সে মনে করে সব কিছুর জন্য তার দায়িত্ব আছে।" নাটকটির শেষ হয় টেপ রেকর্ডে গৃহীত উন্মাদ ফ্রান্টসের উদ্‌ভ্রান্ত চিৎকারে—"আমি, ফ্রান্টস্ ফন্ গেরলাখ, এইখানে, এই ঘরটিতে, আমার শতাব্দীকে কাঁধে তুলে নিয়েছি, বলেছি, এর হয়ে আমি উত্তর দেব—আজ এবং চিরকাল।"

শতাব্দীর সব দায়িত্বকে কাঁধে তুলে নেওয়ার মনোভাবে আত্মবিশ্বাস আবিষ্কার করা যেতে পারে হয়তো, কিন্তু শতাব্দীর সমস্যাসমূহকে ভুলে যাওয়া কি সাহিত্যিকের পক্ষে খুব গৌরবের কথা? আমাদের ভারতবর্ষেও তো মানবতার সংকট বড়ো কম দেখি নি। কি না দেখছি আমরা? কনসেনট্রেশন ক্যাম্প না দেখে থাকি, পথের ধারে খেতে না পেয়ে লাখ লাখ লোককে মরতে কি দেখি নি? হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতি লক্ষ লক্ষ মানুষের বর্বরতা কি দেখি নি? মানুষের প্রতি মানুষের হিংস্র জানোয়ারের মতো ব্যবহার কি দেখি নি? বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে কি বিংশ শতাব্দীর ইউরোপের চেয়ে অপরাধের ভার কম? কিন্তু কোথায় সেই অপরাধবোধ আমাদের সাহিত্যে? আমাদের কোনো সাহিত্যিকই যে নিজেকে অপরাধী জ্ঞান করেন না তা কি আমাদের সংস্কৃতির সুস্থতাই সূচনা করে? কাম্য ফাঁলোঁ যে প্রশ্ন তুলেছেন, কি তার উত্তর?

হ্যারি পলিট

জে. বি. এস. হলডেন

হ্যারি পলিটের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত।

যে ঘটনার সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তা হচ্ছে স্পেনের গৃহযুদ্ধ ও ফাশিষ্ট হস্তক্ষেপ। হ্যারি পলিট সে সময়ে স্পেনের জন্যে সাহায্য তুলছিলেন এবং স্পেনে পাঠাবার জন্যে ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসৈন্যদের একটি ব্যাটালিয়ন গড়ে তুলতে চেষ্টা করছিলেন। অনেকে আমাকে বলেছিল যে স্পেনের ব্যাপার নিয়ে কমিউনিস্টদের এই মাতামাতিটা একটা ওপর-চালাকি মাত্র। আমার নিজের তা মনে হয়নি। হ্যারি পলিটের সংস্পর্শে যারা এসেছিল তারা কেউ-ই তা মনে করে নি। ফাশিস্ট-বিরোধীদের সম্পর্কে হ্যারি পলিট ছিলেন আশ্চর্য রকমের সংস্কারমুক্ত। অর্থনৈতিক মতামত যাই হোক না কেন, সকলকেই তিনি সমান মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাছাড়া স্পেনের ব্যাপারে কমিউনিস্টরা যতোখানি দায়িত্ব ও ঝুঁকি নিয়েছিল তা মাত্রাতিরিক্ত। হ্যারি পলিট মনে করতেন যে কমিউনিস্টরা যদি চোখে-পড়ার মতো কর্মদক্ষতা দেখাতে পারে তবে তাই হবে কমিউনিজম-এর পক্ষে শ্রেষ্ঠ প্রচার।

নিজের কাজ সম্পর্কে এতবেশি মর্যাদাবোধ পেশাদার বিজ্ঞানী-মহলের বাইরে আমি আর কারও মধ্যে দেখি নি। মনে পড়ে একবার তিনি আমাকে ১৯১৭ সালের একটি ঘটনা বলেছিলেন। তখন তিনি বয়লার-মার্কারের কাজ করতেন (যেখানে কাজ করতেন সেখানে সাবমেরিন তৈরি হত) আর লিপ্ত ছিলেন নাশকতামূলক কাজে। সে-সময়ে পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে তিনি হয়তো ইচ্ছে করেই কাজে গাফিলতি করছেন। পুলিশের এই উক্তি তাঁর কাছে অস্বস্তিকর মনে হয়েছিল। হ্যারি পলিট যে কমিউনিস্ট হয়েছিলেন তার একটি কারণ এই যে তিনি বিশ্বাস করতেন পুঁজিতন্ত্রের পক্ষে কর্ম-

দক্ষতার পরিচয় দেওয়া বা ন্যায়ের পথে চলা সম্ভব নয়; আরো ভালো যন্ত্রপাতি আরো ভালো ফসল ও অন্যান্য উপকরণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই সম্ভব—পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নয়। তাঁর এই বিশ্বাস যে অভ্রান্ত ছিল তার প্রমাণ সোভিয়েত যন্ত্রবিদ্যার সাফল্য, সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের আকাশ-অভি ইত্যাদি ব্যাপার।

বলা বাহুল্য, এই মনোভাবটি খাঁটি মজুরের মনোভাব, বুর্জোয়া মনোভাব নয়। তাঁর মনের গড়নটাই এমন ছিল যে সৎ মজুরের মনোভাব ও চিন্তাধারাকে তিনি নিজের অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারতেন। আর তাঁর এই উপলব্ধির অংশভাগী হতেন পার্টির জনকয়েক নেতৃস্থানীয় পুরনো সভ্য, যেমন উইলিয়াম গ্যালাচার। দুঃখের বিষয়, নেতৃস্থানীয় পুরনো সভ্যরা সকলেই তাঁর উপলব্ধির অংশভাগী ছিলেন না।

একদিক থেকে বলতে গেলে তাঁর জীবন সার্থক হতে পারেনি। অবশ্য তিনি নিজের সম্পর্কে এ-ধরনের কথা কোনো সময়েই ভাবতেন না, কারণ তাঁর মার্কসবাদের মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিল না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমি মোটামুটি নিঃসন্দেহ যে যদি গ্রেটব্রিটেনে তাঁর নীতি অনুসৃত হত তাহলে গ্রেটব্রিটেনের পার্টি এতদিনে অন্তত ফ্রান্সের পার্টির মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পারত। তিনি ছিলেন অনুগত পার্টি-সভ্য, যে-সব সিদ্ধান্তে তাঁর সমর্থন ছিল না সেগুলিও তিনি পুরোপুরি মেনে চলতেন এবং সেগুলিকে বাস্তব করে তোলার জন্যে অবিচলিত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতেন। পার্টির যে-সমস্ত থিয়োরেটিসিয়ান বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হেডকোয়ার্টারে থাকেন এবং জনগণের সঙ্গে যাদের কোনো সংস্পর্শ থাকে না—তাঁরা বুঝতে পারেন না যে জনগণের মনোভাব এমন একটা ব্যাপার যাকে মর্যাদা দিয়ে চলতে হয়। জনগণের মনোভাবেও পরিবর্তন আনা যেতে পারে কিন্তু পার্টির যদি গণভিত্তি না থাকে তাহলে এই পরিবর্তনের ব্যাপারটাও খুব আস্তে আস্তে ঘটে। হ্যারি পলিটের এই ক্ষমতা ছিল যে তিনি পার্টির প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্যের প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে পারতেন। আর এ-ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ নেতা আর কেউ ছিলেন না। পার্টি-মহলের বাইরে যাঁদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল ছিল না তাঁরাও নেতা হিসেবে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন।

এদিক থেকে বিচার করলে তাঁর জীবন ব্যর্থ হয়েছে এমন কথা কিছুতেই বলা চলে না। কমিউনিস্টরা সংখ্যায় যতো অল্পই হোক তাদের অস্তিত্বটাই বুর্জোয়াদের কাছে ও প্রতিক্রিয়াশীল ট্রেডইউনিয়ন নেতাদের কাছে একটা ভয়ের ব্যাপার হয়ে ওঠে। ফলে মজুরদের কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিতেই হয় যাতে মজুরদের কাছে এ-ব্যাপারটি প্রতীয়মান করা যায় যে পুঁজিপতিরা কত দয়ালু আর দক্ষিণপন্থী ট্রেডইউনিয়ন নেতারা কত কর্মদক্ষ। আজকের ইংলণ্ডের অনেক শিল্পতেই যে উচ্চহারে মজুরী দেওয়া হয় তার মূলে রয়েছে এই প্রক্রিয়াটি।

গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ভারত ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যান্য পদানতদের মুক্তির ব্যাপারে। লেবর পার্টির মধ্যে গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অতি অল্প সংখ্যকই ছিলেন। অধিকাংশই চেয়েছিলেন বাঁচিয়ে চলতে। ল্যাঙ্কাশায়ার (সূতি), ডাণ্ডি (পাট) প্রভৃতির স্বার্থের ব্যাপারটাও তো আছে! একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেই এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দ্বিমত ছিল না। স্বাধীনতার দাবির কাছে নতি-স্বীকার করার পেছনে এই ভয়টাও ছিল যে অন্যথায় কমিউনিস্ট পার্টিই একমাত্র খাঁটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পার্টি হিসেবে পরিগণিত হবে। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে যাতে পুঁজিবাদের পক্ষাবলম্বীদের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। এই কারণেই ভারত ও সিংহলের চেয়ে মালয় ও পাকিস্তানের ওপরেই সাম্রাজ্যবাদীদের নেকনজর বেশি। কমিউনিস্টরা মনে করে, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী বিপ্লব একটি ধাপ মাত্র—অবশ্য অপরিহার্য ধাপ নাও হতে পারে।

হ্যারি পলিটের নিশ্চয়ই এই উপলব্ধি ছিল যে অপ্রত্যক্ষ ভাবে হলেও এ-ব্যাপারে তাঁর অবদান যৎসামান্য নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা এবং আনন্দের কথা এই যে তিনি সোভিয়েত যন্ত্রবিদ্যার সাফল্য নিজের চোখে দেখে গিয়েছেন। স্পুৎনিক-লুনিকের সাফল্যের তাৎপর্য ধাতু-কারখানার একজন শ্রমিকের কাছে যতোখানি, গ্রামাঞ্চলের বা সূতি কারখানার শ্রমিকের কাছে ততোখানি নয়। তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে কল্পনা করে-ছিলেন যে তিনি যেখানে কাজ করছেন তা যেন ব্রিটিশ সাবমেরিন তৈরি করার কারখানা নয়, সেখানে তিনি নিজের হাতে স্পুৎনিক তৈরি করছেন।

সোভিয়েত যন্ত্রবিদ্যার এই সাফল্যে তাঁর মনে আরো দুটি অনুভূতি নিশ্চয়ই জেগেছিল। প্রথমত, সমাজতন্ত্রী সমাজের কর্মদক্ষতা যে অপেক্ষাকৃত বেশি তা এই সাফল্যের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, এই সাফল্যে তাঁর নিজেরও অবদান আছে।

হ্যারি পলিটের আদর্শ স্ত্রী ছিলেন শ্রীমতী পলিট। চিন্তার দিক থেকে তিনি বস্তুবাদী। তিনি মনে করেন যে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনও শেষ হয়। তবুও, তিনি সুখীবোধ যদি নাও করেন তো গর্ববোধ করার কারণ তাঁর আছে। তিনি নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন যে তাঁর স্বামী কৃতকার্য। এই কৃতকার্যতার মান সম্পর্কে হয়তো প্রশ্ন তোলা যেতে পারে কিন্তু একথা কিছুতেই বলা চলবে না যে একাগ্র নিষ্ঠা ও তন্ময়তার দিক থেকে তাঁর স্বামীর বিন্দুমাত্র হানি ঘটেছিল।

প্রগতি-লেখক আন্দোলনের পৃষ্ঠপট

চিন্মোহন সেহানবীশ

প্রগতি লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠার পর দেখতে দেখতে প্রায় পঁচিশ বছর কেটে গেল। ঐ প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সেদিন যে আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল অনেক দিন পর্যন্ত তার প্রভাব আলোড়িত করে এদেশের লেখক ও বুদ্ধিজীবী মহলকে। বিশেষ করে বাঙলা দেশে বিশিষ্টতম সাহিত্যিকরাও একদা ঘনিষ্ঠ ছিলেন সঙ্ঘের সঙ্গে। পরে সংগঠনটি ক্রমশ নিস্তেজ হতে হতে অবশেষে ১৯৫৩ সন নাগাদ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। উর্দু লেখকরা অবশ্য সম্প্রতি বোম্বাই-এ তাঁদের প্রগতি লেখক সংঘটিকে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁদের এই উদ্যম খুবই অভিনন্দনযোগ্য। তবু মানতেই হবে সারা দেশে ঐ সংঘের অস্তিত্ব আর নেই পনেরো বছর আগেকার মতো। কেন এমনটা ঘটল, কি ছিল আন্দোলনের দুর্বলতা, তার স্থায়ী কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা দেশের সাহিত্যের উপরে—এসব প্রশ্নই খুব প্রাসঙ্গিক ও ও জরুরী। তবু সে-বিচার বা সাধারণভাবে আন্দোলনের সার্থকতা মূল্যায়নের কোনো প্রচেষ্টা এখানে করব না। শুধু প্রগতি লেখক সংঘের সূচনা কোন্ বাস্তবের তাগিদে, তার প্রতিষ্ঠাতারা কোন্ ভাবনার ভাবুক ছিলেন, কোন্ লক্ষ্য নিয়েই বা তাঁরা সেদিন শুরু করেছিলেন তাঁদের দুঃসাহসী যাত্রা—এ সবের কিছুটা পরিচয়-দানই এ-লেখার উদ্দেশ্য। গত দশ বছরে যে তরুণ লেখক বন্ধুরা কলম ধরেছেন তাঁদের কিছুটা আগ্রহ হয়তো থাকতে পারে এ বৃত্তান্ত সম্পর্কে।

সময়টা ত্রিশের কোঠার প্রায় মাঝামঝি। পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কটের কিছুটা বিলম্বিত তাণ্ডবে এ-দেশ তখন বিপর্যস্ত। তারই পটভূমিতে কংগ্রেস পরিচালিত যে বিপুল গণ-আন্দোলনের সূচনা এ-সময়ে তাও আবার

চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত। সেই ব্যর্থতার গ্লানি ও লাঞ্ছনা তরুণদের মধ্যে পুরাতন নেতৃত্বের লক্ষ্য ও পন্থা সম্পর্কে গভীর সংশয়ের উদ্রেক করে। শুরু হয় তাঁদের আত্মজিজ্ঞাসা। এরই সূত্র ধরে তরুণদের একাংশ শ্রমিক ও কৃষক সংগ্রামের শরিক হওয়ার একান্ত গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকেন ক্রমে ক্রমে। নওজোয়ান সভা ও ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার কাজেও তাঁরা অগ্রণী হন। এই সব তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাদী চিন্তাও তাঁদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে অল্পবিস্তর। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের ভিতরের সমাজবাদী শক্তি দানা বাঁধতে বাঁধতে আত্মপ্রকাশ করে একটি সমাজবাদী সংগঠনরূপে। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিবরণ, বিশেষ করে আসামীদের (এঁদের অনেকে প্রায় এক দশক আগে থেকেই শুরু করেছিলেন তাঁদের সাধনা) বিবৃতি সংবাদপত্র মারফত সাধারণ পাঠককেও কিছুটা পরিচিত করে সমাজবাদী ভাবধারা ও সোভিয়েত দেশের বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে। এ ছাড়া sea customs act-এর সতর্ক পাহারা এড়িয়ে মাঝে মাঝে দু-একটি পুস্তক-পুস্তিকা নবযুগের বাণী বহন করে আনত তখনকার দিনের তরুণদের কাছে।

প্রগতি লেখক আন্দোলনের এই পৃষ্ঠপটটি স্পষ্টতই রাজনৈতিক। তারজন্য কোনো সংকোচ বা জবাবদিহির প্রয়োজন দেখি না। প্রচণ্ড আঘাতের পর সম্বিদ লাভ করে সমগ্র জাতির জীবন ও চেতনা যখন ক্রমশ নতুন ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল তখন জাতীয় বিবেকের বাণীমূর্তি লেখকরাও যে সেদিন সেই আলোড়নে মথিত হয়েছিলেন এবং সে চাঞ্চল্য সঞ্চারণের চেষ্টা করেছিলেন জনসাধারণের মধ্যে এ তো তাঁদের পরম গৌরবের কথা। আন্দোলনের ঐ আদিপর্বে সাহিত্যকর্মের জটিলতা সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি চাইতেও তখন স্বাভাবিক ছিল বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এবং সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সাহিত্যিক প্রগতির সাযুজ্যের অসংকোচ স্বীকৃতি। সেই ঘোষণা নিয়ে আবির্ভাব হল—প্রগতি লেখক সংঘের।

একটি কথা বলা প্রয়োজন এ প্রসঙ্গে। এই ব্যাপক পৃষ্ঠপটের অন্য একটি দিক ছিল যার প্রভাব প্রগতি লেখক আন্দোলনের উন্মেষ-মুহূর্তে আরো প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর হয়েছিল। সেটি সাহিত্যিক মহলের চিন্তাধারা সম্পর্কিত। দেশে বিদেশে বাস্তব অবস্থার যে নির্মম রূপ সেদিন প্রকট হয়েছিল তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আর বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব

হচ্ছিল না নিছক স্বপ্নাতুরতায় বিভোর থাকা। আবার বিশের কোঠায় তরুণদের মধ্যে যে রোমান্টিক 'বিদ্রোহ'-প্রবণতা দেখা গিয়েছিল তার দৌড়ও ক্রমস্ফুট হচ্ছিল অনেকের চেতনায়। এক্ষেত্রেও নতুনের ইঙ্গিত সর্বপ্রথম ধরা পড়েছিল রবীন্দ্রমানস মুকুরে। ১৯২৪ সনে 'রক্তকরবী'র প্রকাশ, ১৯২৬ সনে রলাঁর সহায়তায় ফ্যাসিজমের স্বরূপ উপলব্ধি, রলাঁ বারবুস পরিচালিত 'যুদ্ধ ও ফ্যাসিজম বিরোধী আন্দোলনের' সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং ১৯৩০ সনে সোভিয়েত ভ্রমণ ও 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশ সাহিত্যিক সমাজ ও পাঠক মহল উভয়েরই রুচিকে প্রস্তুত করে তুলছিল ধীরে ধীরে। বাঙালী পাঠকের মন যে কোন্ ধরনের সাহিত্যের জন্য তৃষিত হয়ে উঠেছিল তার একটি প্রমাণ গর্কীর 'Mother' উপন্যাসের বাংলা তর্জমার জনপ্রিয়তা। তার দু'টি সংক্ষিপ্ত বাংলা তর্জমা ঐ সময় থেকে প্রকাশিত হতে থাকে সংস্করণের পর সংস্করণ।

অর্থাৎ দেশের বাস্তব পরিস্থিতি সাহিত্যক সমাজের অন্তত একাংশের মনোভাব ও পাঠক সাধারণের চাহিদা—প্রগতি লেখক আন্দোলন-ধারার উৎস সন্ধান করতে হবে এ সবেরই অবস্থান্তরের গভীরে।

নতুন সাহিত্য আন্দোলনের উপযোগী ক্ষেত্র দেশের বুকেই প্রস্তুত হতে থাকলেও সাক্ষাৎ তাগিদ কিন্তু এল বাইরে থেকে। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৫ সনের মধ্যে বিলাতে প্রবাসী কিছু ভারতীয় তরুণ এ দেশের অন্যান্য তরুণদের মতোই গভীর মর্মপীড়া বোধ করছিলেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপর্যয়ে। স্বদেশ থেকে দূরত্বের দরুন এঁদের অন্তর্দাহ হয়তো আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল। সংকটমুক্তির পথের জন্য এঁরা তাই মাঝে মাঝে আলোচনা চালাত নিজেদের মধ্যে। বিলাতে তখন সমাজবাদের প্রভাবে তরুণ বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র মহলে প্রগতিশীল চিন্তা ও সাহিত্যধারা কিছুটা দানা বাঁধছিল যার প্রকাশ পরে দেখা যায় New Writing আন্দোলনের মধ্যে। ভারতীয় তরুণদের মধ্যে ছিলেন মুল্করাজ আনন্দ, সাজ্জাদ জহীর, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ভবানী ভট্টাচার্য, মুহম্মদ আশরফ, ইকবাল সিং, জয়নুল আবেদীন আহ্মদ, মামুদজ্জাফর, রাজারাও, আহমেদ আলি প্রভৃতি সাহিত্য, ইতিহাস ও অর্থনীতির কৃতী ছাত্র। সমাজবাদ ও সমাজবাদ-প্রভাবিত প্রগতিশীল চিন্তা স্বভাবতই এঁদের আকৃষ্ট করল প্রবলভাবে এবং

সাহিত্যের প্রতি নিবিড় অনুরাগের দরুন এঁদের অনেকেই ঝুঁকলেন প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের দিকে।

আর সর্বশেষে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ছিল এই উদাত্ত ঘোষণা :

"আমরা এই সুযোগে আমাদের এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষ হইতে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই; যুদ্ধে আমাদের কোনো স্বার্থ নাই। কোনো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগদানের আমরা ঘোর বিরোধী ...।"

প্রায় পনেরো বছর আগের এই ভারতীয় মনীষীদের বাণী আজকের দিনে বিশেষ করেই স্মরণীয়।

সর্বভারতীয় সংঘ ১৯৩৬ সনের শেষ দিকে 'Towards Progressive Literature' নামে একটি সংকলন প্রকাশ করে। লেখকদের মধ্যে ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সাজ্জাদ জহীর, মামুদজাফর, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ সুধিবৃন্দ। এখানে মূল দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রচলিত সাহিত্যধারা ও পুরাতন আঙ্গিকের সমালোচনা তোলা হয় একাধিক প্রবন্ধে।

বাঙলা দেশে তখন প্রগতি লেখক সংঘের সভাপতি ছিলেন ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, কোষাধ্যক্ষ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ও সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। এ ছাড়া হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন সংঘের কাজকর্মে। এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়, হিরণকুমার সান্যাল, আবু সঈদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রবীণ ও নবীন লেখকেরা। এঁদের অনেকেই ছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আর স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, মন্মথ সান্যাল, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্ত প্রভৃতি সংঘের ঘনিষ্ঠরা অনেকেই ছিলেন আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। বন্দীশালা থেকে মুক্তি পেয়ে গোপাল হালদার মহাশয়ও যোগ দিলেন লেখক সংঘে।

১৯৩৭ সনে বাঙলা দেশের অনেক জেলায় সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। প্রবন্ধ বাদেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গির গল্প বা কবিতা লেখার রেওয়াজ

শুরু হয় এই সময়ে। মনোরঞ্জন হাজরার 'নোঙরহীন নৌকা' ও 'পলিমাটির ফসল' এবং গোপালবাবুর 'একদা' এই দিক দিয়ে অগ্রণী প্রচেষ্টা। 'প্রগতি' নামে একটি সংকলনও প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সনে। উপরে যাঁদের নাম করা হল তাঁরা বাদে এ সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, বিধায়ক ভট্টাচার্য, সজনীকান্ত দাস প্রভৃতির রচনা। এর থেকে তখনকার লেখক সংঘের ব্যাপ্তির কিছুটা পরিচয় মিলবে। আর সংকলনের ভূমিকায় সভাপতি ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের এই কথাক'টি থেকে বোঝা যাবে যে উদ্যোক্তারা উদাসীন ছিলেন না সাহিত্যসৃষ্টি প্রক্রিয়ার জটিলতা সম্পর্কে :

"দল বাঁধিয়া সাহিত্য রচনা হয় না। প্রগতি করিব—এই প্রতিজ্ঞা করিয়াও সব সময়ে সুসাহিত্য রচনা করা চলে না। দল বাঁধিয়া প্রগতি সাহিত্য রচনা করিব এ উদ্দেশ্য এ সংঘের নাই। সংঘের সভ্যগণের উপর প্রগতির দাবী ধরিয়া বাঁধিয়া প্রচার করিতেও সংঘ চাহেন না। কিন্তু যাঁরা প্রগতিকামী সাহিত্যিক তাঁহাদিগকে সমসূত্রে গ্রথিত করিয়া, প্রগতি-সাহিত্যের সম্যক প্রচার আলোচনা ও গবেষণা করিয়া, পরস্পর আনুকূল্যের দ্বারা প্রগতি লেখক-সংঘ সাহিত্যে নিয়ত প্রগতির অনুকূল অবস্থা ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবার ভরসা রাখেন। ইহাই সংঘের লক্ষ্য ও ব্রত।"

এ সব লক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে প্রগতি লেখক আন্দোলন ক্রমশ দানা বাঁধছিল বাঙলা দেশে। তবু অনিবার্য প্রাথমিক স্বতঃস্ফূর্তি কাটিয়ে সত্যকার সংগঠিত আন্দোলন শুরু হয় দ্বিতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলনের পর। এর অধিবেশন হয় কলকাতায় ১৯৩৮ সনের ডিসেম্বর মাসে। সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলী গঠিত হয় মুল্‌করাজ আনন্দ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত সুদর্শন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ এবারেও একটি বাণী পাঠান সম্মেলনে। তাতে এশিয়ার নবজাগরণের কথা তিনি বিশেষভাবেই উল্লেখ করেন। আর সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক, লোক-কাব্য ও শিল্প, সাহিত্যে মতবাদের প্রকাশ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনায় যোগ দেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, ডাঃ আবদুল আলিম, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, কবি নাজাজ, হিরণকুমার সান্যাল, আলি সর্দার জাফরি, বলরাজ সাহনী, আহ্‌মদ আলি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশের খ্যাতনামা লেখকবৃন্দ।

১৯৩৫ সনের যে ইস্তাহারটির কথা আগে উল্লেখ করেছিলাম কিছু রদ-বদলের পর সেটিই গৃহীত হল এ সম্মেলনে। তার কিছু উল্লেখ হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না এইখানে :

"সনাতন সংস্কৃতিতে ভাঙন ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যে আটপৌরে জীবনের বাস্তবতাকে এড়িয়ে যাবার আত্মঘাতী প্রবণতা দেখা দিয়েছে। আমাদের সাহিত্য প্রত্যক্ষ ও প্রাকৃতিককে ছেড়ে অপ্রত্যক্ষ ও আধ্যাত্মিকের দিকে ধাবিত হয়েছে···ফলে তার রচনাভঙ্গী অন্ধ নিয়মানুগত্যের বিষম জালে জড়িয়ে পড়েছে, তার ভাবসম্পদ হয়েছে রিক্ত ও বিকৃত।

"আমাদের সমাজ যে নবরূপ ধারণ করছে তাকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করা এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করে প্রগতিকামী মননধারাকে বেগবান করা—এই আমাদের লেখকদের কর্তব্য।···সাম্প্রদায়িকতা, জাতিবিদ্বেষ, যৌন স্বৈরাচার, সামাজিক অবিচারের যে ছাপ সাহিত্যে পড়েছে তার অপসারণের জন্য তাঁদের সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।

"···আমরা চাই জনজীবনের সঙ্গে সর্ববিধ কলার নিবিড় সংযোগ···

"ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির যাকিছু শ্রেষ্ঠ আমরা তার উত্তরাধিকার দাবী করি। আমাদের দেশে নানারূপে যে প্রগতিদ্রোহ আজ মাথা তুলেছে তাকে আমরা সহ্য করব না।······আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যকে আমাদের বর্তমান জীবনের মূলসমস্যা—ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে, তাকে আমরা প্রগতিবিরোধ বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচারবুদ্ধিকে জাগ্রত করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতি-নীতিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মিষ্ঠ, শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে, তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।"

এই ইস্তাহার গ্রহণ ও উপযুক্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি লেখক আন্দোলনের শৈশবকাল উত্তীর্ণ হয়।

দেশে ফিরে এঁদের কয়েকজন ১৯৩৫ সনে প্রবাসের সেই আলোচনার জের টানলেন 'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠাকল্পে একটি ইস্তাহার প্রচার

করে। এই ইস্তাহারটিই কিছু রদবদলের পর কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সম্মেলনে গৃহীত হয় ১৯৩৮ সনে।

'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগ পর্ব ও তার প্রধান উদ্যোগীদের চেহারা ধরা পড়ে প্রথম সংখ্যা New Indian Literature-এ (সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের এটি ছিল মুখপত্র) প্রকাশিত ডাঃ মুল্‌করাজ আনন্দের এই লেখায় :

It is almost uncanny to look back upon these dark, foggy November days of the year 1935 in London when after the disillusionment and disintegration of years of suffering in India and conscions of the destruction of most of our values through the capitalist crisis of 1931, a few of us emerged from the slough of despond of the cafe's and jarrets of Bloomsbury and formed the nucleus of the Indian Progressive Writers Association.

এঁদেরই কয়েকজনের উদ্যোগে ১৯৩৬ সনে প্রথম সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় লক্ষ্ণৌ শহরে। সম্মেলনে আশীর্বাণী পাঠান রবীন্দ্রনাথ ও সভাপতিত্ব করেন মুন্সি প্রেমচন্দ্। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, বিখ্যাত উর্দু লেখক ও রাজনীতিজ্ঞ মৌলনা হজরৎ মোহানী প্রমুখ সুধীবৃন্দ সাগ্রহে যোগ দেন সম্মেলনে। এই সম্মেলনেই জন্ম হয় প্রগতি লেখক সংঘের।

লক্ষ্য করার ব্যাপার এই সাহিত্য সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয় লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস মণ্ডপে এবং এতে যোগ দেন বেশ কিছু কংগ্রেস প্রতিনিধি অথচ তার জন্য সেদিন কোনো জবাবদিহি দাবি করা হয় নি উদ্যোক্তাদের কাছে। এও লক্ষণীয় যে সর্বভারতীয় কৃষক সভা ও ছাত্র প্রতিষ্ঠানেরও জন্ম ঐ মণ্ডপেই। আসলে বাস্তব পরিস্থিতির যে অবস্থান্তরের তাগিদে ঐ দুটির উদ্ভব, প্রগতি লেখক সংঘের জন্ম সেই মৌল চাহিদা মেটানোর নিমিত্তই—অবশ্য ভিন্নক্ষেত্রে।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রগতি লেখক সংঘ যোগাযোগ করে রলাঁ-বারব্যুস পরিচালিত 'World Congress for the Defence of Peace' নামক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। ঐ বিশ্ব সম্মেলনের প্যারিস, ব্রাসেলস ও

মাদ্রিদ অধিবেশনে ভারতীয় সংঘের পক্ষ থেকে ডাঃ মুল্কর়াজ আনন্দ যোগ দেন প্রতিনিধি হিসেবে। ১৯৩৬ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রাসেলস অধিবেশনে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষীদের একটি বাণী প্রেরিত হয়। প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে (পরে প্যারিসের সংস্কৃতি রক্ষা সম্মেলনেও এটি পাঠানো হয়েছিল)। এর প্রথম স্বাক্ষরকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন শরৎ-চন্দ্র, মুন্সি প্রেমচন্দ্, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রমথ চৌধুরী, নন্দলাল বসু, জওহরলাল নেহরু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এই বাণীতে ছিল:

"......উন্মত্ত প্রতিক্রিয়া এবং জঙ্গীবাদ আজ সভ্যতার ভাগ্য লইয়া খেলা করিতেছে এবং সংস্কৃতিকে ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়াছে। সুতরাং আমরা ইহার বিরুদ্ধে ভারতের লেখক ও শিল্পীগণের এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি যাঁহাদের দরদ আছে তাঁহাদের সকলের প্রতিনিধিরূপে প্রতিবাদ জানানো অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করিতেছি। এ সময়ে আমাদের নীরব থাকা অপরাধ হইবে, সমাজের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য তাহার ঘোর ব্যত্যয় করা হইবে।"

ভারতবর্ষের মানুষকে যেভাবে নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে তা শুধু রাজনীতির দিক দিয়েই ক্ষতিকর নয়, সংস্কৃতি ও জনসাধারণের মধ্যে সংস্কৃতি বিস্তারের চেষ্টাও যে তার ফলে বিপর্যস্ত হচ্ছে—এ বক্তব্যও ঐ বাণীতে ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কুখ্যাত Sea Customs Act অনুযায়ী প্রগতিশীল পুস্তক-পুস্তকাদি আটক, রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠির' ইংরাজী অনুবাদের উপরে নিষেধাজ্ঞা, ওয়েব দম্পতির সুপরিচিত 'Soviet Communism—a New Civilisation' গ্রন্থের আমদানী বন্ধের নির্দেশ, খ্যাতনামা ব্যঙ্গচিত্রকর ডেভিড লো'র 'Russian Sketch Book' বাজেয়াপ্ত করার কাণ্ডজ্ঞানহীন আদেশের উল্লেখ করা হয় এ প্রসঙ্গে।

ভারত ও সংস্কৃত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

আজকের দিনে মানুষের মনে আলাদা ভাবে অথবা মিলিত ভাবে, সচেতন বা অচেতন ভাবে, যেসব বৃহৎ ভাবধারার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া চলেছে, সেগুলির মধ্যে একটি হল ভারতীয়ত্ব বা ভারতীয় মানস—যাকে ইংরেজিতে বলা যেতে পারে 'ইণ্ডিয়ানিজম্'। এই ইংরেজি শব্দটির পরিভাষা হিসাবে "ভারতধর্ম" বা "ভারতযান" শব্দ দুটি ব্যবহার করলে আরও ভালো হয়। জার্মান দার্শনিক শোপেনহাউএর শতাধিক বর্ষ আগে বলেছিলেন যে উপনিষদ তাঁর জীবনের সান্ত্বনা হয়ে আছে এবং মৃত্যুর সান্ত্বনা হয়ে থাকবে। সম্প্রতি হল্যাণ্ডের বারেণ্ড লাভেগেঅন-এর মতো একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলেছেন, আধ্যাত্মিক সম্পদকে তিনি মহামূল্যবান মনে করেন বলেই ভারতের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল। এসব উক্তি ভারতীয় মানসের প্রতি, ভারতধর্ম বা ভারতযানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধারই প্রকাশ—যদিও এই ভারতধর্মের উপাদানগুলি সম্পর্কে, যেসব বৈশিষ্ট্যের অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগে এই ভারতযান গড়ে উঠেছে সেগুলি সম্পর্কে, খুব একটা সুস্পষ্ট চেতনা আমাদের অনেকেরই নেই। এ সম্পর্কে বিভিন্ন ভারতীয় ও ইউরোপীয় মনীষী যেসব অভিমত প্রকাশ করেছেন সেগুলি আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই না। এইসব অভিমতের মধ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধিতা থাকতে পারে। কিন্তু এই ভারতধর্ম বা ভারতযানের যে কতকগুলি মৌল বৈশিষ্ট্য আছে, সেকথা সকলেই স্বীকার করবেন। সাধারণ ভাবে একথা মেনে নেওয়া হয়েছে যে এই ভারতযান বলতে বোঝায় এক অতীন্দ্রিয় তত্ত্ববোধ—যেটা এসেছে অপরোক্ষ অনুভূতিলব্ধ বিশ্বাস থেকে অথবা বুদ্ধিগত যুক্তি প্রয়োগ থেকে—কিংবা বিশ্বাস ও যুক্তি দুয়ের থেকেই। জীবন ও সত্তা যে এক, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে একটি অদ্বয় তত্ত্ব কার্যকরী—এই

বিশ্বাস ভারতযানের একটি খুব বড়ো বৈশিষ্ট্য। এই তত্ত্বটি নিজেকে নানাভাবে প্রকাশ করেছে এবং মানুষের মনে জাগিয়ে তুলেছে নানারকম কাব্যময় ভাবকল্প—অপূর্ব সুন্দর সব অতিকথা, পুরাণকথা, দেবদেবীদের নিয়ে রচিত কাহিনী আর প্রাকৃতিক জগতে এবং মানুষের মানসজগতে এসবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড়ো সার্থকতা হল এই তত্ত্বটিকে উপলব্ধি করা, যে-তত্ত্বটি নিখিল সৃষ্টির সঙ্গে সহজাত ও ওতপ্রোত থেকেও তার সীমার বাইরে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ক্ষুদ্রতম অণু থেকে বিশ্বচরাচরে যা পরিব্যাপ্ত। এই উপলব্ধিকে শুধু মানুষের মানসজগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, কর্মজীবনের ও ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গেও এই উপলব্ধিকে যুক্ত করতে হবে।

সেই সঙ্গে ভারতযান এই কথাটিকেও স্বীকার করেছে যে সংসারে দুঃখ ও যন্ত্রণা আছে। মানুষের কর্তব্য হল জ্ঞানার্জনের আর আত্মানুশীলনের মধ্যে দিয়ে, কিংবা বিশ্বাস ও ভক্তির পথে, অথবা সদাচার ও সৎ কর্মের মধ্যে দিয়ে এই দুঃখ আর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া। সেই সঙ্গে সর্ব জীব সম্বন্ধে একটা পবিত্রতার বোধও এই ভারতযানের অঙ্গীভূত হয়েছে এবং সাধারণ ভাবে জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা চিহ্নিত হয়েছে গভীর একটি করুণা ও সহানুভূতির দ্বারা এবং শুভকর্ম আর সদাচারের দ্বারা। জীবন সম্বন্ধে এই পবিত্রতাবোধের একটি নিষ্ক্রিয় প্রকাশ হল অহিংসা বা কারুর কোনো ক্ষতি না করার নীতি; আর এই বোধ সক্রিয় ভাবে প্রকাশ পায় এই নীতিগুলির মধ্যে দিয়ে: উপেক্ষা—অর্থাৎ অশুভকে গ্রাহ্য না করা; মুদিতা—অর্থাৎ স্বভাব-প্রসন্নতা, সর্বাবস্থায় মনের একটি সহজ আনন্দানুভূতি; করুণা; এবং মৈত্রী—অর্থাৎ সকলের কল্যাণ সাধনের মধ্যে দিয়ে সক্রিয় সহযোগিতা। জীবনের প্রতি যে পবিত্রতাবোধ ভারতধর্মের অঙ্গীভূত, সেটিকে কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় এই নীতি গুলিকে মেনে চলার মধ্যে দিয়ে।

সেই সঙ্গে ঋত ব. শাশ্বত বিধি বা ধর্মের ধারণাটিও রয়েছে। সাধারণত এই 'ধর্ম' কথাটির অর্থ করা হয় 'ন্যায়পরায়ণতা', কিন্তু আসলে এর অর্থ— বিশ্ব-সংসারকে 'ধারণ' করে আছে। এই ঋত বা ধর্ম রয়েছে জীবনের পরি- হিসেবে, সেই সঙ্গে জীবনকে তা সর্বাঙ্গীণ ভাবে আছন্ন করেও রয়েছে। ভারতযান বা 'ইণ্ডিয়ান ওয়ে অফ লাইফ' অনুযায়ী, মানুষের ও সমাজের

কর্তব্য হল জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে এই ঋত বা ধর্মকে সক্রিয় ও ফলপ্রসূ করে তোলা।

ভারতধর্মের আরও দুটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধিবাদ (ইন্টেলেক্চ্যুয়লিজ্‌ম্) ও সহিষ্ণুতা (টলরন্‌স্)। ভারতীয় চিন্তা-পদ্ধতিতে সর্বদাই সবকিছুকে বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করার কথা বলা হয়েছে। সংস্কৃত ভাষায় 'মনু' (মানব, মনুষ্য) আর ইংরেজিতে 'ম্যান'—এই-যে দুটি শব্দ ইন্দো-ইউরোপীয় আর জার্মানিক জগতের এক অভিন্ন ভাষাগত উত্তরাধিকার—এর অর্থ: মননশীল প্রাণী, 'হোমো সেপিয়েন্‌স্'। সংস্কৃত সাহিত্যে সুন্দরতম প্রার্থনাটি হল ঋগ্বেদের গায়ত্রী শ্লোক। বিশ্বস্রষ্টার মহিমা অনুধ্যানে রচিত এই শ্লোকে আমাদের মনকে, চিন্তাকে পরিচালিত করার প্রার্থনা জানানো হয়েছে। এবং ঋগ্বেদে যখন বলা হয়েছে: একম্ সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি—সেই এককেই বহু জনে বহু ভাবে বর্ণনা করেছেন— তখন থেকেই ভারতীয় চিন্তাধারার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পরমত-ও পরধর্ম-সহিষ্ণুতা, ভিন্নতর ধ্যান-ধারণার প্রতি শ্রদ্ধা।

একজন ভারতবাসী সর্বজীবের প্রতি তার ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যে সহৃদয়তা ও শান্ত নম্রতার পরিচয় দিয়ে থাকে, সেটা ভারতীয় জীবনযাত্রার একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁরা যোগ্যতার সঙ্গে অনুশীলন করেছেন এমন অনেক বিদেশীই এই জিনিসটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন (যেমন, এ. এল. ব্যাশ্যাম: 'দি ওয়ণ্ডর দ্যাট ওয়জ্ ইণ্ডিয়া' লণ্ডন, ১৯৫৪, পৃ: ৮-৯)। সংস্কৃত ভাষার মধ্যস্থতায় আমাদের ইন্দো-ইউরোপীয় উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে যে সব সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অভিন্নতা আছে, সেগুলি উপলব্ধি করে এই ইংরেজ লেখক ভারতীয়কে "আমাদের আর্য সহোদর মৃদুস্বভাব হিন্দু— 'Our Aryan brother, the mild Hindu" বলে উল্লেখ করেছেন। ইংরেজের উক্তির মধ্যে ভারতীয়ের প্রতি বেশ একটু পিঠ-চাপড়ানির মনোভাব আছে, সামান্য কিছুটা অবজ্ঞার ভাবও আছে; তবু এর মধ্যে এই স্বীকৃতিটুকু আছে যে হিন্দু অর্থাৎ ভারতীয় তার স্বভাবে ও ব্যবহারে শান্ত ও সহৃদয়। ভারতীয় চরিত্রের এ একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য।

দুই

এরকম একটা কথা মাঝে মাঝে বলা হয়ে থাকে যে ভারতীয় মানসের একটি মৌল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দুঃখবাদ, জীবনকে অস্বীকার করার মনোভাব। এই ধারণাটি একেবারেই ভ্রান্ত। কোনো কোনো ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় দুঃখবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আছে বলেই হয়তো এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকবে। আসলে, ভারতীয় চিন্তাধারায় ও ভারতীয় মানসে এই দুঃখবাদের স্থান নিতান্তই গৌণ। "আধিভৌতিক জগৎকে, শয়তানকে আর দেহের দাবিকে প্রত্যাখ্যান আর পরিত্যাগ করা"র ধারণাটি ("relinquishing the world, the Devil and the Flesh") ভারতীয় মানসের একটি মৌল উপাদান নয়। ভারতে এই দুঃখবাদ যতটা চোখে পড়ে ততটা দুঃখবাদ অন্যসব ধর্মমতের মধ্যেও আছে। সব ধর্মমতের মধ্যেই কোথাও-না-কোথাও বৈষয়িক জগৎকে অস্বীকার করার একটা ধারণা আছেই। কিন্তু সাধারণভাবে ভারতীয় মানসে বা ভারত-ধর্মে জীবনের অস্বীকৃতি বা জীবন সম্পর্কে একটা ধারাবাহিক নিরানন্দবোধ কোথাও নেই। ভারতীয়ের মনে এই বোধটুক সর্বদাই রয়েছে যে জীবনের এক মহান পটভূমি হিসেবে আছে সেই পরম তত্ত্ব, তাই ঈশ্বরের এই জগতে সব কিছুই সুন্দর আর উপভোগ্য। অন্তরে যখন একটি মহৎ আদর্শের আগুন জ্বলছে, জীবনে যখন সেই আদর্শকে চরিতার্থ করে তুলতেই হবে, তখন বৈষয়িক সংসারকে এবং দৈহিক কামনা-বাসনাকে উপেক্ষা ও দমন করাই যে যুক্তিযুক্ত, এ কথা ভারতধর্মে স্বীকৃত। এ ক্ষেত্রে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে—সত্য ও জ্ঞানের সন্ধানে যে অন্য সব কিছু থেকে নিজেকে বিরত রেখে একটি লক্ষ্য সাধনের একাগ্রতায় ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেছে তাকে—যথোপযুক্ত মর্যাদা এই ভারতযানে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় জীবন-যাত্রার মূল সূত্রটি হল চতুরাশ্রম: ব্রহ্মচর্য—শিক্ষার্থীর সুশৃঙ্খল জীবন; গার্হস্থ্য—সদাচার সৎকর্ম ও সৎচিন্তার মধ্যে দিয়ে সানন্দে সংসারধর্ম ও পরিবার প্রতিপালন; বানপ্রস্থ—বৈষয়িক জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে অবসর গ্রহণ; সন্ন্যাস—জীবনের অন্তিম পর্যায়টির জন্যে স্বনির্ভর প্রস্তুতি।

মানবিক ভাবনা-ধারণার মধ্যে দিয়ে দেবত্বের একটি মহত্তম আর গভীরতম ভাবকল্প ভারতধর্মে রূপ পরিগ্রহ করেছে শিব আর উমা এবং বিষ্ণু আর শ্রী-র ধারণা কল্পনার মধ্যে দিয়ে। দেবত্বের এ রকম অপূর্ব সুন্দর আর মহিমময় কল্পনা মানুষ আর কোথাও করেছে বলে জানা নেই। ভারতীয় ধারণা অনুসারে, শিব আর বিষ্ণু সেই পরমাত্মার দুটি মহৎ রূপের দুই প্রতীক: জ্ঞানের দেবতা শিব আর প্রেমের দেবতা বিষ্ণু কেউই সংসারকে, বিবরজগৎকে মানুষের জীবনে পরিত্যাজ্য হিসেবে ত্যাগ করেন নি। শিবের অর্ধাঙ্গিনী উমা শক্তিরূপিনী জগজ্জননী—একাধারে তিনি পরম কল্যাণী স্নেহময়ী ও শান্তিদায়িনী এবং ভয়ঙ্করী ও মৃত্যুদায়িনী। আর বিষ্ণুজায়া শ্রী সম্পদ ও সৌন্দর্যের মাধুর্যময়ী অধিষ্ঠাত্রী। দেবত্ব অর্জনের প্রস্তুতি হিসেবে বৈষয়িক জগৎকে অস্বীকার ও পরিত্যাগ করার অনুকূলেই নাকি ভারতধর্ম সর্বদা রায় দিয়েছে—এই উক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে খণ্ডন করছে হর-পার্বতী আর বিষ্ণু-লক্ষ্মীর এই ভাবকল্পনাটি। পক্ষান্তরে, এক সুবিন্যস্ত আর সুসমন্বিত সমাজে নারী-পুরুষের দৈনন্দিন দাম্পত্য জীবনকে ভারতধর্মে দেখা হয়েছে অধ্যাত্মজগতের পরম উপলব্ধির এক প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে। কোনো কোনো ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় অবশ্য জগৎ-সংসারকে মায়া আর অবিদ্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ভারতধর্মে এইটেই একমাত্র বা প্রধান কথা নয়। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে অন্যান্য যে সব দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় দর্শনে প্রকাশ পেয়েছে, সে সবেরই মূল কথাটি ওই মায়াবাদকে খণ্ডন করছে:

> যদ্ ইদং দৃশ্যতে কিঞ্চিদ্ দৃশ্যজাতম্ পুরোগতম্।
> পরম ব্রহ্মৈব তদ্ বিদ্ধি অজরামরম্ অব্যয়ম্ ॥

—সম্মুখে যা-কিছু দেখতে পাচ্ছ এবং যা-কিছু কিঞ্চিৎ পরিমাণে দেখা যাচ্ছে, সেই সব-কিছুকেই পরম ব্রহ্ম বলে জেনো—যে পরমব্রহ্ম অজর অমর ও অক্ষয়। (যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ)

বাস্তবিক পক্ষে, বৈদিক সাহিত্য থেকে শুরু করে বরাবরই ভারতীয় চিন্তাধারায় জীবনের প্রতি এক সানন্দ ও সুস্থ ভালবাসা আর প্রাণবন্ত আশাবাদ লক্ষ্য করা যায়। বিশেষতঃ ভারতীয় শিল্পে ভাস্কর্যে এই মনোভাবটি খুব স্পষ্টভাবেই পরিস্ফুট। জীবন সম্বন্ধে এই পবিত্র আর প্রতীয়মান আনন্দানুভূতির পেছনে এই মহৎ প্রত্যয়টি আছে যে জীবন এক মধুর আর প্রশান্তিময় সুখোপভোগের জিনিস কারণ জীবন সেই পরম অদৃশ্য সত্তারই

অঙ্গীভূত যে-সত্তা স্বয়ং সর্বসুখময়। আমাদের চারিদিকে জীবনের
সম্বন্ধে ঋগ্বেদে বলা হয়েছে :

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ নঃ সন্তোষধিঃ॥
মধু নক্তম্ উতোষসঃ মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্ নো বনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু নঃ সূর্যঃ।
মাধ্বীর্ গাবো ভবন্তু নঃ॥

এই প্রসঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত এই শ্লোকটিও উদ্ধৃত করতে পারি :

সম্পূর্ণম্ জগদেব নন্দনবনং সর্বেঽপি কল্পদ্রুমাঃ
গাঙ্গং বারি সমগ্র বারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ স্ত্রীয়াঃ।
বাচঃ প্রাকৃত-সংস্কৃতাঃ শ্রুতিশিরো বারাণসী মেদিনী
সর্বৈবস্থিতিরের রম্যবিষয়া দৃষ্টেতু সত্যে পরে॥

—পরম সত্য যখন দৃষ্টিগোচর হয়, তখন সমস্ত জগৎ নন্দনকানন
প্রতিভাত হয়; সমস্ত মানুষকে কল্পতরুর মতো উদারমনা মনে হয়;
জলই গঙ্গাজলের মতো পবিত্র হয়ে ওঠে; প্রত্যেকটি নারী পুণ্যবতী
মাধুর্যময়ী হয়ে দাঁড়ায়; দেবভাষা থেকে জনগণের ভাষা পর্যন্ত সমস্ত ভাষাই
বৈদিক ভাষার মহত্ত্ব অর্জন করে; সমগ্র পৃথিবীর বারাণসীর
তীর্থস্থানে পরিণত হয়; প্রত্যেকটি ক্রিয়াকে রমণীয় বলে বোধ হয়।

তিন

ভারতধর্মের এই আবহমণ্ডলের মধ্যেই আমরা ভারতবাসীরা বাস
শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করি। এবং, আমাদের পক্ষে সংস্কৃত ভাষা অত্যন্ত মূল্যবান
এই জন্যে যে, প্রথমত ও প্রধানত সংস্কৃত ভাষাতেই এই ভারতধর্মের
উপাদান সেইসব মহৎ চিন্তা, ভাবধারা আর আখ্যানগুলি বিধৃত হয়ে
ভারতীয়ের জীবনে তাই ভারতীয়ত্ব আর সংস্কৃত ভাষার মূল্য সমান।
আমাদের আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে, ইংরেজিতে ও অন্যান্য
অনুবাদের মারফতে আমরা ভারতধর্মের মৌল আর অবিচ্ছেদ্য
গুলিকে পেতে পারি—ঠিক যেমন অন্য যে-কোনো দেশের লোকই

নিজেদের ভাষায় অনুবাদের মধ্যে দিয়ে এই ভারতধর্মের বুনিয়াদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। কিন্তু তবু, আমাদের নিজস্ব জাতীয় উত্তরাধিকারের অঙ্গ হিসেবে মূল ভাষা ও মূল রচনাকে আত্মস্থ করার একটা বিশেষ সার্থকতা আছে। এবং এ কথা বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না যে ভারতীয় হিসেবে এর একটা ব্যক্তিগত চরিতার্থতার দিকও আছে।

একাধিক কারণে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের এই জাতীয় উত্তরাধিকারের গুরুত্ব কমানো কোনোমতেই উচিত নয়, ভারতীয় জীবনে সংস্কৃতের স্থান-সংকোচ ঘটালে সেটা হবে আরও অনুচিত। ভারতীয় জীবনে সংস্কৃতের স্থান গুরুত্বপূর্ণ শুধু এই জন্যেই নয় যে অন্তত তিন হাজার বছর ধরে যে-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে সেই সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতিই এই সংস্কৃত ভাষায় বিধৃত হয়ে আছে; সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব এ জন্যেও বটে যে এর ঐতিহ্য এখনও সজীব। বাস্তবিক পক্ষে, চীনা ভাষা ছাড়া, একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই অতীত থেকে বর্তমানে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বয়ে আসা এক জাতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতম ঐতিহ্য।

এই সংস্কৃতই আবার বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে বড়ো সাংস্কৃতিক—এমনকি মানসিক ও আধ্যাত্মিক—যোগসূত্রও বটে। ভারতের জনগণ যে একটা জাতিগত যৌগিকতা (racial composite) অর্জন করেছে, সেটা ক্রমেই স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। ডক্টর এফ. ডব্লু. টমাস বলেছেন, বৈদিক যুগের শেষের দিক থেকেই "ভারতীয় মানুষ"-এর আবির্ভাব ঘটে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের কালানুক্রম সম্পর্কে একটা মোটামুটি—এবং অনেক পণ্ডিতের মতে সঠিক—ধারণা নিয়েই বলা যেতে পারে, খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে বৈদিক যুগের অবসান। মহাভারত-বর্ণিত কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ এরই সমকালীন। এই সময়েই হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সভ্যতার দুই মহাস্রষ্টার আবির্ভাব ঘটে : একজন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস এবং অন্যজন কৃষ্ণ বাসুদেব বর্কেয়। প্রথম জন ভারতীয়দের দিয়েছেন তাদের প্রাচীনতম শাস্ত্রগ্রন্থগুলি—এদিক থেকে তাঁকে একভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাতা বলা যেতে পারে। ব্যাসদেবই চতুর্বেদ সংকলন করেছিলেন বলে মনে করা হয়। তাঁর সময়ে বৈদিক ঋষি আর ঋত্বিকদের মধ্যে যেসব ধর্মীয় ও অন্যান্য স্তোত্র-স্তবগান আর ক্রিয়াচার-সংক্রান্ত সাহিত্য প্রচলিত ছিল, সেগুলিকে

তিনিই সংগ্রহ ও সুবিন্যস্ত করেন। তদানীন্তন উপকথা পুরাণকথা আর ইতিহাসের মধ্যে আর্যভাষী জনসাধারণের যে ঐতিহ্য ছিল, সেগুলিকে সংগ্রহ করার আন্দোলনও ব্যাসদেব শুরু করেন বলে মনে করা হয়। এইভাবে তিনি আমাদের বিপুল পৌরাণিক সাহিত্যের সূত্রপাত করেন। একেবারে একেবারে প্রাথমিক প্রয়াসগুলির পেছনে যে তাঁরই প্রেরণা ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং সেইজন্যেই অষ্টাদশ পুরাণের প্রত্যেকটি তাঁরই রচনা বলে সাধারণত মনে করে আসা হচ্ছে। ভারতের শ্রেষ্ঠ গ্র মহাভারতের রচয়িতাও ব্যাসদেব বলে ধরে নেওয়া হয়। তিনি দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন বলে ধরে নিলে বোধহয় ভুল হবে না—আয়ার্ল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের কেল্‌টিক পুরাণকাহিনীর ওইসিন বা ওসিয়ান-এর মতোই ব্যাসদেব তাঁর অধস্তন তিন পুরুষের চেয়েও বেশি দিন জীবনযাপন করেন এবং সর্বজনমান্য জ্ঞানবৃদ্ধ হিসেবে অধস্তন চার পুরুষের বৃদ্ধি-সমৃদ্ধি নিজে দেখে যান।

তেমনি, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক হলেন কৃষ্ণ-বাসুদেব। তিনি এমন এক উচ্চতর দর্শন ও নীতিশাস্ত্র প্রবর্তন করেন যা বৈদিক ক্রিয়াচারের সীমা ছাড়িয়ে তার চেয়েও বেশি কিছু হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরই উদার দৃষ্টিশক্তি মধ্যে দিয়ে আর্য ও আর্যপূর্ব উপাসনাবিধির—অর্থাৎ হোম আর পূজার— সমন্বয় ঘটে এবং ক্রমবর্ধমান এক মিশ্রজাতির যৌগিক ধর্ম হিসেবে হিন্দুধর্মের বিকাশে এক নতুন দিক্‌পরিবর্তন সূচিত হয়। জাতিগত সংমিশ্রণের কাজ তার আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং ব্যাসদেব আর বাসুদেব দুজনকেই সেই জাতিগত সংমিশ্রণের ফল বলা যেতে পারে। দুজনকেই আর্য ও অনার্য পিতামাতার সংকর-সন্তান হিসেবে মনে করা যেতে পারে!

ডক্টর টমাসের মতে "ভারতীয় মানুষ"-এর আবির্ভাব ঘটে অনুলোম আর প্রতিলোম বিবাহের মধ্যে দিয়ে। এই ভাবেই দ্রাবিড়, অস্ট্রিক আর মোঙ্গোলইডদের মতো আর্যপূর্ব জাতিসমূহের ভাষা ও সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আর্য ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে মিশে গিয়ে গোড়ার দিকের একক ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু ব্যবস্থায় রূপায়িত হয়। সুতরাং একজন ভারতীয়ের ঐতিহাসিক ও জাতিগত পটভূমিতে আছে একদিকে আর্য আর অন্যদিকে চৈনিক তিব্বতীয় (সিনো-টিবেট্যান) ভাষী মোঙ্গোলইড, কোল্‌ ও মোন্‌-খ্মের

অস্ট্রিক এবং তার নিজস্ব বিশেষ ভাষাভাষী দ্রাবিড়। এগুলিই হল ভারতীয় জনসমষ্টির প্রাগৈতিহাসিক বুনিয়াদ এবং এই বুনিয়াদগুলির মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ় হচ্ছে আর্যেরা আর দ্রাবিড়রা যেগুলির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভারতীয় জনসমষ্টির ওই আর্য উপাদানগুলি—পূর্বোক্ত অন্য সব জাতীয় উপাদানগুলির মতোই—এসেছিল ভারতের বাইরে থেকে এবং ওই আর্য উপাদানগুলি সব শেষে এসেছিল বলেই মনে হয়। আধুনিকতম মত অনুযায়ী আদি আর্যজাতি উরাল্‌স্‌ পর্বতমালার দক্ষিণ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ও অনার্দ্র তৃণভূমিখণ্ডে দীর্ঘকাল ধরে তাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে এবং মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে তারা সম্ভবত একক ও অবিভাজ্য জাতিতে পরিণত হয়। এর পরে তারা দলে দলে চলে যেতে থাকে পশ্চিম-ইউরোপে ও পশ্চিম এশিয়ায়। একটি দল ককেশাস পর্বতমালা, উত্তর-মেসোপটেমিয়া ও ইরানের মধ্যে দিয়ে ভারতে আসে। ভারতাগত এই ইন্দো-ইউরোপীয়দের আত্মীয় পরিজনরা ইউরোপে ও পশ্চিম-এশিয়ায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে এবং এদেরই মতো অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিলে মিশে যায়। সংস্কৃত ভাষা হল প্রাচীন ইরানের পুরাতন পারসীক ও আবেস্তান ভাষার সহোদরা এবং গ্রীক লাতিন ও অন্যান্য প্রাচীন ইতালীয় ভাষাসমূহের, গোথিক ও অন্যান্য জার্মানিক ভাষাসমূহের, প্রাচীন আইরিশ ও অন্যান্য কেল্‌টিক ভাষাসমূহের এবং স্লাভ ও বল্‌টিক ভাষাগুলির নিকট-আত্মীয়া। এই ভাষাগত ঐক্যের পিছনে আর্যভাষী ভারতীয়দের সঙ্গে পশ্চিম-এশিয়ার আর্যভাষী জাতিগুলির এবং ইউরোপের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী জাতিগুলির বেশ কিছুটা মানসিক ও আধ্যাত্মিক মিল আছে। শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য যেসব স্থানে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা প্রচলিত সেই সব দেশে ব্যাপক জাতিগত সংমিশ্রণ সত্ত্বেও, একটি মূলগত ইন্দো-ইউরোপীয় মানসের অস্তিত্ব বিশেষ ভাবেই অনুভব করা যায়—যে-মানসটির সাক্ষাৎ আমরা পাই ভারতে ও পাশ্চাত্যের ইন্দো-ইউরোপীয় জগতে। অতএব ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা হিসেবে সংস্কৃত হচ্ছে পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের সবচেয়ে বড়ো সাংস্কৃতিক যোগসূত্র আর এই যোগসূত্রটি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আমাদের উত্তরাধিকার। ভারতীয়দের মধ্যে যে মোঙ্গোলাইড ও অস্ট্রিক উপাদান আছে তা হিসেবের মধ্যে না ধরেও একথা বলা চলে যে, ঐতিহাসিক কালে

ভারতেও যৌগিক সভ্যতার বাহন হিসেবে সংস্কৃত ভাষা ভারতের দেশসীমার বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধ-ধর্মের মাধ্যমে এই ভাষা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মধ্য-এশিয়া ও পূর্ব-এশিয়ার মোঙ্গোলাইড ও অস্ট্রিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্থিতিলাভ করেছিল। এইভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পূর্ব-এশিয়া ও মধ্য-এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সবচেয়ে বড়ো যোগসূত্রটি হয়ে উঠেছিল সংস্কৃত। অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মমত ও দর্শনের বাহন হিসেবে সংস্কৃত ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল চীনে ও চৈনিক পরিমণ্ডলীর দেশগুলিতে এবং একই প্রক্রিয়ায় তিব্বতে ও তিব্বতের মাধ্যমে মোঙ্গোলিয়ায় ও মাঞ্চুরিয়াতে। ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের মোঙ্গোলাইড জনগোষ্ঠীর মধ্যেও প্রথমে সংস্কৃত ও পরে পালি ভাষার প্রচলন ছিল। তারও আগে এই দুটি ভাষার প্রচলন ছিল দূরতর ভারতের বা ব্রহ্মের ও ইন্দোচীনের অস্ট্রিকদের মধ্যে। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা চলে, দক্ষিণ ব্রহ্ম ও দক্ষিণ শ্যামের মোন্ জনগোষ্ঠীর মধ্যে, ব্রহ্মের বা কাম্বোদীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে, এ ছাড়াও ইন্দোচীনের চাম বা চম্পা জনগোষ্ঠীর মধ্যে। ইন্দোনেশিয়ায়—বিশেষ করে যবদ্বীপে ও বলীতে—হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির আবহাওয়ায় সংস্কৃত হয়ে উঠেছে ক্লাসিকাল ভাষার মতো, যেমনটি হয়েছে এই ভারতে। একই ব্যাপার ঘটেছে কাম্বোদিয়ায়, চম্পায় ও মোন্দের দেশে। অর্থাৎ সংস্কৃত হচ্ছে এমন একটি শক্তি যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের আধ্যাত্মিক আত্মীয়তা গড়ে তুলেছে এবং একদিক থেকে বিচার করলে এই শক্তিটি এখনো বর্তমান। অনেকাংশে এই একই উক্তি করা চলে তিব্বত ও মোঙ্গোলিয়া এবং চীনের জনগোষ্ঠী সম্পর্কে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে চীনা সংস্কৃতির বৃত্তস্থিত কোরিয়া, জাপান ও ভিয়েতনাম সম্পর্কেও। অতএব সংস্কৃত ভাষা ভারতের কাছে একটি আন্তর্জাতিক সম্পদ, যার মাধ্যমে প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক কালে ভারতের সঙ্গে ইউরোপ ও এশিয়ার যোগাযোগ ও সম্পর্ক বজায় থেকেছে—যেমন জাতিগত উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে, তেমনি আধ্যাত্মিক সমানুভূতির ক্ষেত্রে।

ভারতের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব তো আছেই, তা ছাড়াও ভারতের জরুরী জাতীয় স্বার্থেই সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন অব্যাহত রাখা উচিত। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের জন্যে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনের মূল্য কতখানি তা আমি উল্লেখ করতে চাই না। সংস্কৃত সাহিত্য ও কৃষ্টি ব্যক্তিবিশেষের চারিত্র ও ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত করে তুলতে কতখানি সহায়ক তাও আমি উল্লেখ করতে চাই না। অবশ্য এর আগে ভারতধর্ম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এই বিষয়টিও কিছুটা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের আরো একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া দরকার। দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের জন্যে সংস্কৃত ভাষার খুবই প্রয়োজন। প্রথমত, আজকের দিনে ভারতে আমরা যতগুলি ভাষায় কথা বলি প্রত্যেকটি ভাষারই ধাত্রী ভাষা হিসেবে সংস্কৃত ভাষার গুরুত্ব এখনো রয়ে গিয়েছে। আর্য বা দ্রাবিড় যে-ভাষাই হোক না কেন, আজকের দিনের অধিকাংশ ভারতীয় ভাষাই হয়ে উঠেছে 'অধমর্ণ ভাষা', তারা এখন আর 'বৃদ্ধিশীল (building) ভাষা' নয়। সংস্কৃত ভাষার অবর্তমানে এই ভাষাগুলি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উচ্চ ধ্যানধারণা প্রকাশের ব্যাপারে একেবারেই অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। বিষয়টি সুপরিজ্ঞাত, অতএব বিশদ আলোচনার প্রয়োজন নেই। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিকে যদি যথোচিত জীবন্ত রাখতে হয় এবং তাদের সাহায্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হয় তাহলে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজন আছে। আর এই হচ্ছে একটি কারণ যে-জন্যে সংস্কৃত ভাষার চর্চা বজায় রাখা উচিত।

দ্বিতীয় ব্যাপারটি সম্পর্কে সাধারণভাবে উপলব্ধির অভাব আছে, কাজেই তা নিয়ে কোনো আলোচনাও হয় না। ব্যাপারটি এই :

আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার জন্যে সংস্কৃত অপরিহার্য। ভারত বহু-ভাষার দেশ। বর্তমানে বারোটি কি তেরোটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষাকে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও, যদি তেমন দাবি ওঠে, তবে আরো কয়েকটি ভাষাকে আমাদের সংবিধানের ৮নং অনুসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যেমন, গোর্খালী, মৈথিলী, রাজস্থানী, এবং সম্ভবত ভোজপুরী ও ছত্তিশগড়ী বা এমনি ধরনের আরো কয়েকটি ভাষা। এই ভাষাগুলিকে দুটি প্রধান গোষ্ঠীতে (groups) বা গোত্রে (families) ভাগ করা চলে। একটি

হচ্ছে আর্য ভাষা বা সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত ভাষা, অপরটি দ্রাবিড় থেকে উদ্ভূত ভাষা। (এই হিসেবের মধ্যে সংখ্যাল্প চৈনিক-তিব্বতীয় ও অস্ট্রো-এশীয় গোষ্ঠীগুলির ভাষাকে ধরা হয় নি।) এই সমস্ত ভাষার মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে রয়েছে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত কৃষ্টি। এই সেতুবন্ধনটি যদি অপসৃত হয় তাহলে দেশের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে এক-জাতির অনুভূতি লুপ্ত হবে। সংস্কৃত কৃষ্টি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষা হচ্ছে এমন একটি বস্তু যা ভাষা, জাতীয়তা ও আঞ্চলিক রীতিনীতির বিভিন্নতার উর্ধে, আর এই কারণেই ভারতীয়রা দেশগত ভাষানুরক্তি ও স্বাজাত্যবোধকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে আঞ্চলিক ভাষার ওপরে এক নতুন ধরনের গুরুত্ব (এবং বলতে বাধ্য হচ্ছি যে অযৌক্তিক গুরুত্ব) আরোপ করা হচ্ছে। আর এই গুরুত্ব-আরোপের ব্যাপারটি শুরু হয়েছে হিন্দী থেকে। এই ঘটনার মধ্যে এই মস্ত বিপদটি রয়েছে যে ভারতে বিভেদপন্থী মনোভাব জাগ্রত হতে পারে। তার ফল হবে এই যে, প্রত্যেক এলাকা মোটামুটি নিজের নিজের ভাষা নিয়েই মত্ত হয়ে উঠবে আর একমাত্র নিজের নিজের ভাষাকেই উন্নত করে তুলতে চেষ্টা করবে। আর এই ব্যাপারটি চলতে চলতে সংস্কৃত সমেত অন্য সমস্ত ভাষা সম্পর্কে তৈরি হবে একটি আত্মম্ভরী অসহিষ্ণুতার মনোভাব আর বলা বাহুল্য ইংরেজি ভাষাই হবে তার প্রথম বলি। এই মনোভাবকে যদি পুরোপুরি বাড়তে দেওয়া হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত ভারত কয়েকটি ভাষা-রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়বে; সে-অবস্থায় এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে সংস্কৃত ভাষাকে আর পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ ভারত হয়ে দাঁড়াবে বিশেষ বিশেষ ভাষা-কেন্দ্রিক (বা -ভিত্তিক) ইউরোপীয় ধরনের জাতীয়তাবাদের লীলাক্ষেত্র টুকরো টুকরো রাষ্ট্র। এক-জাতির দেশ ভারতের পক্ষে এটি খুব উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নয়। এমনকি বর্তমান ভারতেও যে অবস্থাটি রয়েছে সেখানে একপ্রান্তের মানুষের সঙ্গে অন্যপ্রান্তের মানুষের চেহারায়, চালচলনে, সামাজিক আদবকায়দায়, খাদ্যে, পোশাকে, আঞ্চলিক স্থাপত্যে এবং মোটামুটিভাবে জীবনযাত্রাপদ্ধতিতে প্রভেদ খুবই বেশি। যেমন, কাশ্মীরের শ্রীনগরের ভারতীয় বা নেপালের কাঠমুণ্ডুর ভারতীয়ের সঙ্গে উড়িষ্যা বা মহারাষ্ট্র বা কেরলের ভারতীয়ের তুলনা করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এদের

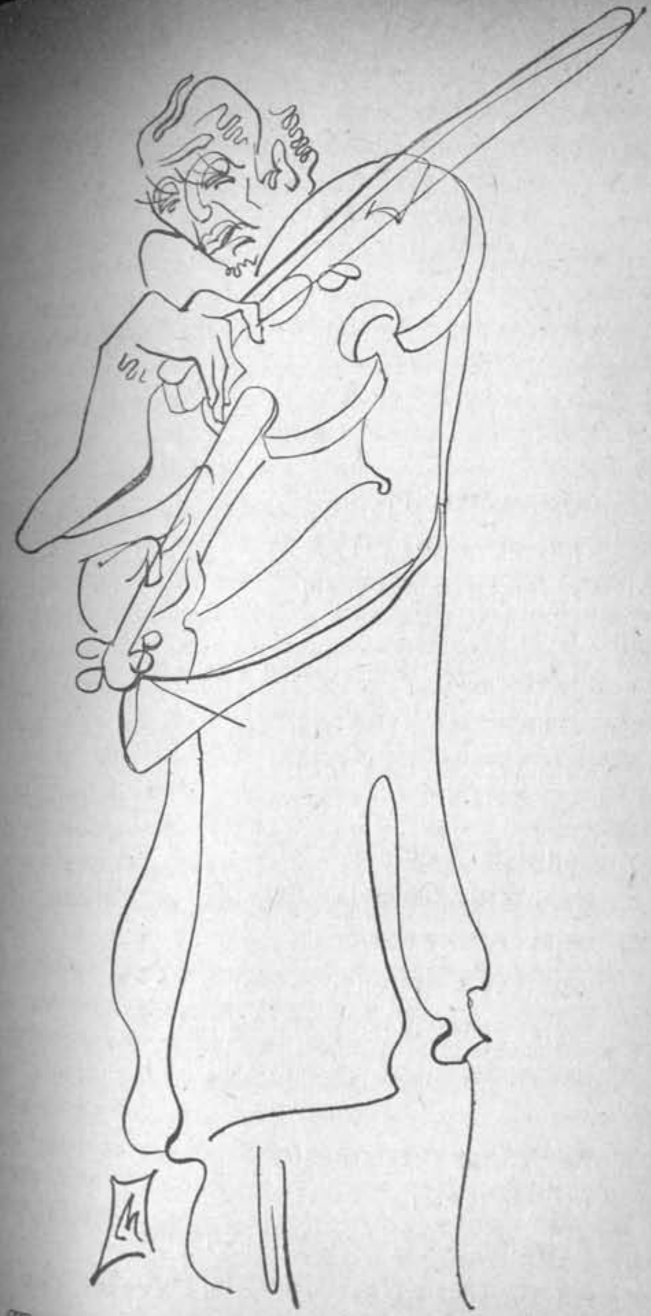
যতই থাকুক, তারা সকলেই মনে করে যে তারা এক-জাতি, কারণ এমন একটা কিছু আছে যা তাদের সবাইকে একসঙ্গে বুকে টেনেছে আর এই জিনিসটি হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত কৃষ্টি। এই ঐক্যসূত্রটি আছে বলেই ভারতের চল্লিশ কোটি মানুষ (যা সারা পৃথিবীর মানুষের এক-ষষ্ঠাংশ) এই বলে গর্ববোধ করে যে তারা একই দেশের মানুষ। এই ঐক্যসূত্রটি আছে বলেই ভারত ডজনখানেক স্বাধীন বা পরস্পর-সম্পর্কশূন্য রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে নি। তের বছর আগে আমাদের চোখের সামনেই ভারতের জীবন্ত দেহের অঙ্গহানি ঘটিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল। এ-ব্যাপারটি যে সম্ভব হয়েছিল তার একমাত্র কারণ এই যে এমন জনকয়েক মুসলমান নেতা ছিলেন যাঁদের মানসিকতায় সংস্কৃত ভাষার কোনো স্থান ছিল না বা যাঁদের ইচ্ছাপূর্বক এমন শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল যাতে সংস্কৃত ভাষাকে তাঁরা তাচ্ছিল্য করতে শেখেন (এজন্যে অংশত দায়ী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিভেদনীতি-প্রসূত কারসাজি ও পিঠ-চাপড়ানি)। এই নেতারা ভারতীয় জনসমষ্টির একটি বিশেষ অংশকে (যারা একমাত্র ইসলাম-ধর্মের প্রতি আনুগত্য ছাড়া অন্য সমস্ত দিক থেকেই ভারতীয়) অন্য অংশের থেকে পৃথক করে ভিন্ন খাতে চালিত করতে পেরেছিলেন। যেহেতু এই ভিন্নপথগামী অংশটিও ভারতীয়, অতএব ফলগত বিচারে সংস্কৃতই ছিল তাদের জাতিগত ও দেশগত উত্তরাধিকার। তাদের বোঝানো হয়েছিল যে আনুষ্ঠানিক ও বাহ্যিক ভাবে হলেও এই উত্তরাধিকারকে ত্যাগ করা ও সংস্কৃত ভাষা ও কৃষ্টির সেতুবন্ধনকে অস্বীকার করাই হবে তাদের পক্ষে শ্রেয়। ভারতীয়দের মতো প্রাচীন একটি জাতি যে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে—এই হৃদয়হীন ও ভয়ংকর ট্র্যাজেডির অন্তর্নিহিত কারণ হচ্ছে এই। আর এই দ্বিধাবিভক্তির ফলে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশা সহ্য করতে হয়েছে।

আমরা অনুভব করছি যে ভারতবর্ষে বিভেদের প্রবণতা বাড়ছে। বিশেষভাবে, দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, এটা ঘটছে স্বাধীনতার পর। আজ ভারতীয় ঐক্যকে শক্তিশালী করবার প্রয়োজন অন্য সময়ের তুলনায় বেশি। সংস্কৃতের এই বিপুল ঐতিহ্য হচ্ছে সেই স্বর্ণসূত্র যা বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে এক অখণ্ড ঐক্যে ধারণ করছে। এবং এই ঐতিহ্যকে অবহেলায় নষ্ট হতে দেওয়া একেবারেই সমীচীন নয়। তাতে আমাদের অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার মহতী বিনষ্টিই হবে। এখানেই ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃতের বিশেষ স্থান রয়েছে। সাধারণ ভারতীয় ছাত্র অথবা ছাত্রীর সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন, শুধু যে তাদের 'আত্মিক স্বাস্থ্যের জন্য' তাই নয়, গোটা দেশের ঐক্যের জন্যেও প্রয়োজন। কেননা সংস্কৃত সেই ঐক্যের অন্যতম শক্তিশালী বুনিয়াদ ও উপাদান।

আমাদের শিক্ষাব্রতীদের একটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁদের রাজনীতিকদের চাপে প্রভাবিত হওয়া উচিত না। আজ দেখা যাচ্ছে যে রাজনৈতিক-মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা ইংরেজি ও সংস্কৃতকে বাদ দিয়ে হিন্দীর দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা দেখাচ্ছেন। কিন্তু আমরা যখন আমাদের শিশুদের শিক্ষা দেব, তখন এমন বিষয়ই শেখাব, যে-বিষয়ের জীবনে কিছুটা প্রকৃত মূল্য আছে। অ-হিন্দী এলাকার অধিকাংশ মানুষই এসব রাজনীতিকদের-অথবা হিন্দী-সমর্থকদের মতামত সমর্থন করেন না। হিন্দী আমাদের অহিন্দীভাষী স্কুলের ছাত্রদের ও সরকারী কর্মচারীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হিন্দী চাপিয়ে দিলে বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। কেননা, অহিন্দীভাষীরা বুঝতে পারছেন যে ভারতীয় ঐক্যের নাম নিয়ে এই হিন্দী চাপানোর ফলে একটি হিন্দীভাষী সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে এবং অহিন্দীভাষীরা চিরদিনের জন্য এমন একটি অবস্থায় পড়ছেন যেখানে তাঁদের কপালে জুটছে শুধুই অসুবিধা ও যোগ্যহীনতার অপবাদ। অন্যদিকে, সংস্কৃত যদি ব্যাপকতরভাবে ব্যবহৃত হয়, এবং ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে, তবে এ ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের বৃহত্তর অংশের সমর্থন পাবে। ইংরেজি, সংস্কৃত এবং হিন্দী—এই তিনটি ভাষারই এখন সর্বভারতীয় রাষ্ট্রীয় ভাষা হওয়া উচিত। এখন যেমন অনেকে শুধু হিন্দীকেই রাষ্ট্রীয় ভাষা করবার দাবি তুলেছেন, সেভাবে শুধুই হিন্দীকে সব স্তরে রাষ্ট্রীয় ভাষা করা উচিত নয়।

ভাষা শিক্ষা দেবার সময় আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এমন ভাষাই আমরা শিক্ষা দেব যাতে শিক্ষার্থীদের মনের প্রবণতাগুলি বিকশিত হতে পারে। এদিক থেকে বিচার করলে, একথা স্বীকার করতে হবে যে সংস্কৃতের কৃষ্টিগত ও চিৎপ্রকর্ষগত মূল্য শাশ্বত এবং এই মূল্যবিচারে হিন্দী বা অন্য কোনও আধুনিক ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতের কাছে ঘেঁষতে পারে না। অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণে, ভারতবর্ষে ইংরেজির অনুশীলনও খুবই জরুরী। মাতৃভাষা, ইংরেজি ও সংস্কৃত (অথবা সমপর্যায়ের অন্য একটি ক্লাসিকাল ভাষা, যেমন প্রাচীন তামিল, প্রাচীন তিব্বতী ভাষা, আবেস্তান ভাষা, পহ্লবী পারসীক, প্রাচীন আর্মেনীয়, গ্রীক, লাটিন, আরবীয়, হিব্রু, সীরীয়, অথবা আধুনিককালের কোনো উন্নত ভাষা যথা ফরাসী, জার্মান, রুশ, চৈনিক, জাপানী প্রভৃতি।)—এই তিনটি ভাষা স্কুলের পর্যায়ে যথেষ্ট। যদি হিন্দীর প্রয়োজন থাকে, তবে এ ভাষার অনুশীলনের কাজ কলেজী স্তরে ঐচ্ছিকভাবে নেওয়া যেতে পারে। এবং শুধু এইভাবেই বৃত্তির উৎকর্ষ ও ভারতীয় ঐক্য দুই-ই অক্ষুণ্ণ রাখা যেতে পারে।

আমাদের বৈষয়িক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিভিন্ন দিকে সংস্কৃতের বিশেষ উপযোগিতার কথা আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি। সংস্কৃত ভারতের মহৎ জাতীয় ঐতিহ্য, যে ঐতিহ্য ভারতাত্মার ধারক।



স্কেচ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

কবিতাগুচ্ছ

অরুণ মিত্র

জনমদুখিনীর ঘর

দুব্বার কয়েকটা ছোপ
ধানের গুচ্ছের একটু ছটা
কয়েকটা দোয়েল ফিঙে টুনটুনি
নরম হাসির আভা
দু-একজনের ঠোঁট আদরের মতো ক'রে খোলা
এই সব নিশানা ধ'রেই
এখানে ফিরেছি আমি।

দুরন্ত রোদের টিলা পেরিয়ে এলাম,
কুয়াশা প্রান্তর বনবাদাড়ের রাত
আমায় ঘোরায়নি আর,
অচেনা হাটুরে আনাগোনা ক্রমেক্রমে মুছে গেছে,
নানান্ জিজ্ঞাসাবাদ বিচিত্র ভাষার স্তূপ ঠেলে
এখন আমার কান শুদ্ধ এক ধ্বনিতে পেতেছি।

সেই পিদ্দিমের আলো দেখা যায়,
জনমদুখিনীর ঘর।
কবে আমি বড় হ'য়ে তাকে ছেড়ে চ'লে আসি
তবু তার আঁচলের হাওয়া আজও আমার নিভৃতে,
ঘুমের সময় যত গল্প ছিল আমাদের

অন্ধকার ভরাত যা সবই সে তো রূপকথার
তবু দুঃখ-ঘোচানোর গোপনতা নিয়ে
গল্পের রাতের মধ্যে অভিভূত আমরা ঘুমোতাম।

তারপর একদিন বেরিয়েছি,
সন্ধ্যার সীমান্তজোড়া পাহাড় ডিঙিয়ে
কতদূর চ'লে গেছি,
বিভুঁই মনের মধ্যে পথ খুঁজে কতবার দিশেহারা,
রূপকথার কোনো দেশ দেখিনি তো।
আজ দুব্বা ধান পাখি দেখে
ভালোবাসার দু-একটা মুখ দেখে
এখানে ফিরেছি।

পিদ্দিম জলার একলা ঘর,
ঐ আলো অন্ধকার আমার নাড়িতে বাজে,
আমার শ্রবণ একক স্বরের স্থিতি পায়—
ভাঙাচোরা বুড়ী গলা
বিশুদ্ধ অতল স্পর্শ,
ঘরে ফিরতে ব'লে ডাকে।
সল্‌তেটা নেবার পরও এই ডাক ঘুরতে থাকবে
যতক্ষণ না আমি
রাত্তিরের গল্পগুলো মনে চেপে
আবার দাঁড়াব গিয়ে দুঃখের দুয়োরে।

বিষ্ণু দে

সার্কাসের বাঘ

গ্রামে গ্রামান্তরে শুনি মহা উত্তেজনা,
প্রকৃত সন্ত্রাসও বটে। শহরের সার্কাসের বাঘ
পালিয়েছে বাঘোয়া পাহাড়ে ঘেরা বনের আড়ালে।
উপদ্রব প্রায়ই ঘটে। আমরা এসেছি কয়জনা
বাংলো কুঠিতে, আমন্ত্রিত না হলেও রবাহুত বটে।
তিন পা বাড়ালে রাত্রে ঠিক দেড়টায়
শুনেছি সে ভাঁটা চোখ দেখা যায়, হিংসা জ্বালা রাগ
প্রচণ্ড আক্রোশে জ্বলে, খণ্ডিত মুক্তিতে
প্রচণ্ড আক্রোশে : কেননা সে খাঁচার সচ্ছল সুখ চায়
পলাতক অনভ্যস্ত স্বাধীন অরণ্যে অপ্রস্তুত
ফাঁসিকাঠে আসামীর দুর্গত দীক্ষায়।

আমাদের রাত্রি কাটে কাঁটাঝোপে ঘাসের পোকায়
কেঁচোয় মশায় দীর্ঘ প্রতীক্ষায়, শব্দ শুনি,
শুনি আজ এ গ্রামের ছাগল বাছুর
শুনি কাল ও গ্রামের মানুষের ছেলেমেয়ে গেছে।
তাড়া করি কয়জনা। চ'লে যাই বহুদূর
বেছে বেছে এ ঝোপ সে ঝাড়। পণ্ডশ্রম।
শহরের সার্কাসের ভূতপূর্ব বাঘের দারুণ চতুর খেল্,
কিছুটা বা ক্ষুধার অভ্যাসে আর কিছুটা বা শখের বিকারে
যেন বা সে কোটিপতি লোভ, যেন সারা বিশ্বের শিকারে
তার লোভ, তৃপ্তিহীন চিরদ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতায়।

জন্মবুনো বাঘেরাও তাই তাকে ভয় করে।
আর আমাদের অরণ্যবাসের তাই শেষ নেই,
কারণ এ উপদ্রব দূর করা আমাদেরও জিদ্, রোখ, ব্রত।
তাই অন্ধকারে প্রতিরাত্রে আমরা কয়জনা থাকি ছদ্মবেশে,
সদাজাগ্রত বীক্ষায়, যেমন ছিলেন লেনিন স্তালিন
উনিশশো সতেরোর অক্টোবরে উদ্যত প্রস্তুত,
প্রায় সেই মন নিয়ে—বড়তেই দাও যদি ছোটর উপমা—
আমরাও চুপ ক'রে বসি, কিংবা ছুটি নিঃশব্দ সঞ্চারে,
সর্পগন্ধা পায়ে পায়ে শিশু শাল সেগুনের উদ্‌গ্রীব অদ্ভুত
তীক্ষ্ণ আগ্রহের নিস্তব্ধ আশ্লেষে, প্রকৃতির নীরব উৎসাহে,
সভাসমিতির চেয়ে ঢের শক্ত ক্ষিপ্র তিতিক্ষায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ফলশ্রুতি

ফলের দোকানের সামনে
এক সময়ে একটা বাঁধা হরিণ
গলার শেকলে টান পড়িয়ে
আড়চোখে এই শহরটাকে দেখত।

কোন রকম আড়াল না নিয়ে,
কোথাও মাথা না গুঁজে—
সরাসরি আকাশের দিকে মুখ রেখে
দিব্যি চিৎপটাং হয়ে পড়ে থাকত ডাকাবুকো রাস্তাটা।

সকাল হলেই
অলিগলি আর গাড়িবাড়ির আড়াল থেকে
কল্‌কল্‌ ক'রে বেরিয়ে পড়ত মানুষ—
তারা সামনে দিয়ে হনহনিয়ে যেত
নিশ্চয় শিকারে।
বাসগুলো মোড় নিত হুম্‌হাম্‌ শব্দে ;
তাদের বন্ধ খাঁচায় গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ করত
ছোট ছোট বাঘের বাচ্চা।
ট্রামগুলো চলে গেলেই
তারের খেলা দেখাতে দেখাতে যেত
ছুরিতে শান দেবার একটানা হিস্‌হিস্‌ শব্দ।
ফুটপাথের কোলের কাছে কোথাও
তৃষ্ণার জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ত খাদে—

সামনে একটা থাম থাকায় দেখা যেত না।
মাঝে মাঝে হাওয়ায় উড়ে আসত বিড়ির পাতা—
তাতে নানা মাপের জানলা-দরজা ফোটানো ;
তার ভেতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে এ শহরকে দেখতে চাইত
দূরের এক ঘোমটা-দেওয়া অরণ্য।

ফলের দোকানের সামনে দিয়ে আসতে যেতে
লোকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ত—
বাঃ, কী সুন্দর!
দেখ দেখ, ঠিক ছবির মতন।

হরিণটা মুখ বিষ ক'রে তাকাত।
সুন্দর? মরণ আর কি! তার দাঁত কড়মড় করত।
গলায় শেকল পরানো এই পোষা প্রভুভক্ত 'সুন্দর'—শব্দটা
তার কিছুতেই আর বরদাস্ত হচ্ছিল না।

তার নাকের কাছে ঘোরাফেরা করছিল একটা আঁশ্‌টে সন্দেহ—
শহর-বসানো এই অরণ্যের ভেতরে ভেতরে
আসলে খুব হিংস্র একটা ব্যাপার চলেছে।
মানুষ মানুষকে আর
মানুষকে মানুষ এখানে শিকার করছে,
কিন্তু রক্তের কোন দাগ কোথাও রাখা হচ্ছে না।
'বাঃ, কি সুন্দর' ব'লে একটা দারুণ নিষ্ঠুরতাকে চাপার চেষ্টা চলেছে।

বাঁধা হরিণের মনে হল :
এর চেয়ে ঢের ভাল হত যদি তার প্রাণ হাতে করা সৌন্দর্য
মানুষ জঙ্গলে দাঁড়িয়ে একাগ্র লক্ষ্যে ধনুকে টঙ্কার তুলে দেখত।

ঢের ভাল ছিল সেই অকপট স্থূল ব্যবহার
আগুনে চড়ে
যা রসনায় গিয়ে মানুষকে তবু যাহোক হৃষ্টপুষ্ট করত।

সন্দেহটা চারদিকে ক্রমশ পচতে থাকায়
হরিণের মুখে
পয়সা দিয়ে কেনা ঘাস আর রুচল না।
ঠোঁটের সামনে
যেমন তেমনি উপুড় হয়ে রইল।

শেষে একদিন
গলার শেকল খুলে রেখে
সেই হরিণকে
নড়বড়ে লোহার চাকাওয়ালা একটা গাড়ির ঘাড়ে চড়ে
ড্যাডাং-ড্যাং ড্যাডাং-ড্যাং শব্দে
ঠ্যাং আকাশে আর চোখ কপালে তুলে
মহানন্দে এই শহরের বাইরে চলে যেতে দেখা গেল।

বিমল চন্দ্র ঘোষ

নির্জনতা

নির্জন হৃদয় মৃত্যু। সংশয় তো আছে বারোমাস!
প্রাকৃতিক ঘেরাটোপে সান্ত্বনা কোথায় গাছে ফুলে
সমুদ্রে নদীতে সূর্যে চাঁদে? দিন রাত্রি উর্ধ্বশ্বাস।
যত ফেলি-টানি শ্বাস, যত যাই চুপ্‌সে আর ফুলে
বাঁচার লড়াই করি প্রাণায়ামে। তবু অবিনাশ
নয় কাব্য। এ যুগের রসবৃক্ষে মাটি নেই মূলে।

বিতৃষ্ণা-বেষ্টিত মনে স্বস্তি নেই, পঙ্কিল জীবন
চড়াই উৎরাই ভাঙা বিভ্রান্ত মেধার গিরিপথে
প্রগতি হাঁপায়। আত্ম-মুকুরে স্বরূপ-নিরীক্ষণ
কুয়াসা-কলুষ লোভী যন্ত্রণার ক্ষীণ মনোরথে
মৃত্যুকেই ডেকে আনা। কী করুণ বাসনা পূরণ
মাধ্যমিক শিল্পধারা ভাবদ্বন্দ্বে পীড়িত ভারতে।

ক্ষুব্ধ গণ-চৈতন্যের বহুদূরে নিভৃত গুহায়
হৃদ্‌পিণ্ডের নির্জনতা দাঁতে পিষে স্বরুধির খায়।

আহত যৌবন

মণীন্দ্র রায়

এ কোন্ আগুনে তুমি আজ
যন্ত্রণার শিখা মেলে দিলে ?
আমার শরীরমন, স্পর্শ, শ্রুতি, দৃষ্টির আধার
জ্বলে তিলে তিলে !

শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, স্নায়ুতারে তোমার আঙুল
ক্রমাগত তীব্র ঝন্‌ঝনায়
নামে, আর জেগে ওঠে ঝড়—
হাজার অদৃশ্য টিয়া নিমেষে নিমেষে
ওড়ে যেন আকাশের উৎক্ষিপ্ত পাখায়,
তোলে আর্তস্বর।

নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর তুমি !
অস্তিত্বের কেন্দ্রশিলা ভেঙে ভেঙে এ কোন্ পাতালে
খোঁজ মগ্ন পিপাসার ধারা ?
নেই, কিছু নেই বুকে, অন্ধকারে পাথরে পাথরে
শূন্যতার প্রতিধ্বনি, আঘাতে কেবল
খ'সে পড়ে স্ফুলিঙ্গের তারা।

তারপর কী জানি কখন
থেমে যাও, দেখি সবিস্ময়ে—
গান নয়, স্বপ্ন নয়, সে আমার আহত যৌবন,
সময়ের পদ্মপত্রে হাসে স্থির অশ্রুর বলয়ে।

বিশ্বজয় যার বাসনা

গোলাম কুদ্দুস

তোমার বিস্ময় এত ধৈর্য কোথা পাই,
কোন উৎস আনে এত উৎসাহের স্রোত,
হাত তুলে দেখাই যদি লক্ষ লক্ষ হাত
হাস তুমি মুচকিয়ে,
যদি দেখাই চেতনার বাহকদের
চকিতে নাচাও তুমি ভ্রূ ও নয়ন !

অথচ আমাকে ছোঁয় অফুরন্ত শক্তির প্রবাহ,
প্রাণের স্ফূর্তির বেগ দেখি আমি প্রাণহীন অলিতে গলিতে,
ঐ যে শত শত নীরব নির্জীব
দোকানীরা ঝাঁপ খুলে বসে আছে
আঠালুর মতো তারা আঠারো ঘণ্টা
লেগে থাকে দোকানের গায়,
দিন যায় মাস যায় বৎসর বিগত
খদ্দেরের জন্যে শুধু হন্দ বসে বসে,
তবু ক্লান্তিহীন
কিম্বা ক্লান্তিতে কি এসে যায়
বাঁচা যদি না হয় বাচালতা।
দেখে না আকাশ,
তোমার আমার মত সমুদ্রের নিষ্ফল আহ্বান
কখনো শোনে না কানে,
ধ্যানজ্ঞান শুধু তার বিপুল ও বিপুলতর
বিপনী বিস্তারে,

আম্র মুকুলের মত
দাবদাহে ঝরে বহু আশা,
খসে কিছু ঝড়ের আঘাতে,
শিলাবৃষ্টি আরো কিছু করে আধমরা,
তবু ওরা জীবনের বৃন্তে দোল খায়
শহরে নগরে।
গ্রামের কি বৃত্তান্ত পৃথক ?
দুর্বল শিশুর মতো জমিগুলো কোলে ক'রে রাখে
পিতৃস্নেহে ক্ষুদ্র যত চাষী,
যত শ্রম তত ঋণ, কক্ষচ্যুত খসে পড়ে কেউ,
যারা থাকে ঘোরে নিত্য ক্ষুধার্ত ঘর্মাক্ত,
তবু ছেঁড়া কাপড়ের মতো তাকে থাকে আঁকড়িয়ে,
পৃথিবীটা নেমে আসে
সংকীর্ণ ক্ষেতের চতুর্ভুজে।
আর আমি ?
সমগ্র জগত যার জয়ের বাসনা
ওদের ধৈর্যের শিক্ষা নেবে না সে কেন ?
কত ঘণ্টা বসবে সে শেষ ঘণ্টার আগে ?
বিপ্লব-বাসরে বসে তুমি তবু
কর ছটফট
দেখনা কি উৎসবের নেমেছে প্লাবন,
বলতে হবে আফ্রিকার নাম ?
শোনাতে হবে কিউবার কাহিনী ?
এখানেও তুকি নাচ নাচাব দেখনা !

হতাশায় ডুবে মরতে চাইলে মরো !
তবে যেন আশা করো না
গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিয়ে কেউ করবে উদ্ধার।
সময় কোথা তার ?
নক্ষত্রের বন্দরে বন্দরে তরী নিয়ে যেতে হবে না ?
বিশ্বকর্মার দল বিশ্বকর্মের স্রোতে ভেসে
একেবারেই ভুলে যাবে বিশ্ববখাটেদের
আত্মার সদ্গতির কথা।

তোমাকে মায়ের মতো জানি
শিশুকাল থেকে,
জানি অন্ন তোমার ভাণ্ডারে
নুন ভাত দুধ রুটি জল।
কিন্তু তুমি আমার স্বপ্নকে
কি দিয়েছ মাটি ?
তোমাকে মায়ের মত জানি
কান্না তবু আমার সম্বল !

পেট জ্বলে তাই রাস্তা হাঁটি,
পাথর স্বদেশ !
ঘর বাঁধতে ঘৃণার আগুন...
মাটি, তুমি বাঁচাও আমাকে !
তোমাকে মায়ের মত জানি ;
কিন্তু কার দ্বেষ
আমাকে রক্তাক্ত করে ? আমি
বাঁচতে গিয়ে বিষালাম কাকে ?

মার-খাওয়া সর্বাঙ্গে আমার
রক্ত আর জ্বালা !
সে যন্ত্রণা তোমার বুকেও
চুঁইয়ে পড়ছে ; দেখনা প্রতিমা !
তবে কি মিছেই মাটি নাম ;
স্বপ্ন জন্মভূমি ?—
তোমাকে মায়ের মত পেতে
মুছে যাবে চোখের নীলিমা !

এই খরস্রোতে

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

বিষণ্ণ জাহাজ আমি, হে সমুদ্র, শুনি দূরে তরঙ্গের গান,
বন্দরের পানশালায় প্রাচীন দ্রাক্ষার সুরা লাগে যে বিস্বাদ ;
বিনষ্ট ভ্রূণের মতো পিছে থাক স্মৃতি, পড়ে থাক অভিজ্ঞান—
কুরঙ্গিনী গণিকার আলিঙ্গনে কীটদষ্ট জৈবিক আহ্লাদ।

এখন আকাশে নেই কোনোখানে স্থির ধ্রুবতারকার জ্যোতি
কাছে কিম্বা দূরে নেই, শ্যামউপকূলবর্তী কোনো দিগ্বলয় ;
তীরে ভিড়তে চাইনাক, বল্গাহীন গতি হোক যাত্রার সারথি
তরঙ্গ কল্লোল হয়ে বহে যাক ফেনশীর্ষ অনন্ত সময়।

গতি, তীব্র গতিবেগ করেছে কি নেশাতুর আমাকে মাতাল :
কে তুমি ভোলাও দুঃখ ক্লান্তির শিয়রে ঘুম-পাড়ানিয়া গানে,
এ আদিম আঁধারের তিমিরগুণ্ঠনবতী কে তুমি যমজ সহোদরা?

ভাঙা হালে যূথভ্রষ্ট, ক্ষিপ্ত ঝড়ে উড়ে গেছে কবে ছিন্নপাল—
আমাকে মাতাবে যদি ঘূর্ণিপাকে, নিরুদ্দেশে অলক্ষ্য উজানে,
ভাসাও না আমায় ক্ষিপ্র জোয়ারের এই খরস্রোতে, কলস্বরা!

শুদ্ধ সীমায় যেতে

চিত্ত ঘোষ

নীয়নে নীয়নে শহর অন্ধকার :
নীয়নে নীয়নে অন্ধকারের আলো—
স্রোতে তরঙ্গে পাথরে ধূলায় কত শোক পার হই
কত কমনীয় মুখের ফাটলে প্রতিবিম্বের শিকড়
খুঁজে খুঁজে খুঁজে মাটিতে কুড়িয়ে পাই
কত আলোকিত মুখের গোধূলিছায়া।

ভিন্ন স্মৃতির সমারোহ শেষ, ঘুমের মোমের আলো—
প্রবাহিত নদী সুদূর শীতল চোখে,
বিম্ন বিষাদ চিহ্নিত শাখা, রৌদ্র আবহমান
শুকায় শিকড়, প্রবলতা পীড়া, জাগে লুম্বিনীরাত
পাথরের সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে মর্গের দরজায়
সারারাত জলে শোকের অগ্নিশিখা।

পুরোনো পাতাল প্রতিবিম্বিত পলে।
পুরোনো রাত্রি গলে গলে স্মৃতি নদী।
হেঁটে হেঁটে হেঁটে ক্লান্তিকে পায়ে বেঁধে
আমি নির্জন শোকের পাথরে বসি,
চোখের দুধারে প্রতারণা, সুখ, শোক
আমি হাত রাখি কোন প্রবাহের জলে!

আড়ালে মগ্ন শূন্য, কাতর বালু :
দুরন্ত রেখা সমান্তরাল দ্বিধা—
প্রতিধ্বনির পেছনে পেছনে কারা
গোধূলিছায়ার আলোকিত মুখ খোঁজে।
হেঁটে হেঁটে হেঁটে কবে আমি সেই
শুদ্ধ সীমায় যাব!

অন্তিম প্রার্থনা

রাম বসু

আপাত তন্ময় আমি অরণ্যের স্বপ্নাবিষ্ট জল
অপলক চেয়ে আছি মুখের বৃত্তের সুষমায়
নিজেকে উৎসর্গ করে সমন্বিত বাঁচার কৌশল
ভেবেছি আয়ত্তাধীন কল্পনার বিনীত আভায়।

জানি নি আহ্নিকে এত কাঁকরের আলো, হাহাকার
রক্তে অন্ধ পাখি ওড়ে, প্রতিধ্বনি সত্তায় মুখর
বিবর্ণ বনশ্রী হিম, নতনেত্র ; বিষাদে অপার
পাষাণ প্রতিমা। কণ্ঠে নষ্ট কুসুমের ক্লান্ত স্বর।

নিষ্ঠুর আগ্রহে তাকে বুকে ভাঙি। মুখ তুলে দেখি
সে নেই শরীরে লিপ্ত। শূন্যতার শানিত স্তবক
ইতস্তত ক্ষমাহীন উন্মীলিত। এই চেয়েছি কি
কোরকের কূটকেন্দ্রে দুর্নিরীক্ষ্য কীটের কনক ?

আমার দিগন্ত নেই, ঈশ্বর অঙ্গার, স্মৃতি পাপ
কেবল তৃষ্ণার ধোঁয়া অবরুদ্ধ দেহের শিবিরে
কুণ্ডলী পাকিয়ে স্তব্ধ। দেওয়ালে খিলানে মনস্তাপ
নিষাদ শিকারে মত্ত লক্ষ্যভেদ সে করে তিমিরে।

অনিবার্য বিধিলিপি। শুধুমাত্র অন্তিম প্রার্থনা
তোমার চোখের মধ্যে হয় যেন সমাধি আমার
শ্যাওলা জোনাকি নিয়ে প্রীত-স্তব্ধ, তোমার রচনা
দ্বিতীয় সৃষ্টির মত হবে ছায়া স্নিগ্ধ সান্ত্বনার।

অন্তিম

শঙ্খ ঘোষ

আমায় বেছে বেছে বরণ করেছিল
বিশ্ববিধাতার একটি দুরাশা—
এখন দেখছি তা কিছুই পূর্ণ না,
বয়স যদ্যপি মাত্র বিরাশি।

সফল কীর্তি তো আঙুলে গোনা যায়
বসতি-নির্মাণ, বংশরক্ষা !
তাছাড়া ছিল বটে অন্ধকার ঘটে
সিঁদুর-চিহ্নের মতন সখ্য।

কিন্তু সখাদের অস্থি ডাক দেয়
মস্ত সময়ের দাঁতের কোটোয়,
প্রবল বহমান দুধারে গর্জিত—
অন্ধ শয়তান, টান দে বৈঠা !

প্রেমের চতুর্দশ পদাবলী

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

যন্ত্রণায় আমি দেখ শুদ্ধ হয়ে গেছি। ভালোবাসা
যেন পৃথিবীরতপস্বিনীউষা। বিষণ্ণ প্রতিমা।
করুণ। শোকার্ত চোখে অনুক্ষণ খসে যাওয়া-আসা
জীবনের। অন্ধকারেঘুরেঘুরে ক্লান্ত। নেই সীমা
কোথাও। এদেহে অন্ধ হয়ে মিছে স্পন্দন হারাই,
পাহাড়অরণ্যনদী অগুনিতচূড়ান্তচৈতন্য।
প্রবলহাতেরগন্ধেটেনেআনে সে-ই। আসিযাই
ঊর্মিমালা সমুদ্রের! স্পর্শেরআকাঙ্ক্ষানিয়েধন্য।

বল শুচিস্মিতী, উষা! পৃথিবীরস্মৃতিরশিকড়।
জীবনেররক্তেররক্তেজন্মদাও গাঢ়আলোকের!
ফুলফললতাপাতাতটিনীর পুলকিতধ্যানে
শরীরেজীবনআনো প্রেমআনো আশ্চর্যনিগড়
বাঁধনেজড়াতেচাও: নিষ্পাপ এজাতশৈশবের
দেহথেকেবিচ্ছুরিতশুদ্ধজালা আধারেপ্রয়াণে।

সিদ্ধেশ্বর সেন

একটি ছিন্ন সংলাপ, অংশ

: তুমি
: সময়ক্রান্তির যদি অন্ধকার নিশ্চিহ্ন ও নিশ্ছিদ্র
দীর্ণ পাদপীঠের উপর, আমি
: তোমার মুখের ছায়া, জলে
: স্মৃতি
: তোমার মুখরছায়া
: বিস্মৃতি
: মনে পড়ে, মনে পড়ে তোমার কারুকৃৎমুখ
: যা আনি নি
: মনে পড়ে, পড়ে
: যা আনিনি, আবৃত করেছি যা, উড়িয়েছি সময়ের বিশালনীল-
নির্লিপ্ত হাওয়ায়
: তবু স্বর, ও তোমার
প্রস্তর, পাতাল, প্রস্রবণ, জল
: হাওয়ার, হাওয়ায় প্রতি যুগ ভিন্ন ও অভিন্ন যেহেতু
নিরবয়ব
: তবু তোমার, তোমার, স্পষ্ট ও নিবিড়
: অনুপস্থিত
: স্পষ্ট, নিবিড়, একক, ব্যক্তিগত
: নির্বিশেষ
: ব্যক্তিগত, অথচ—
: অসম্পৃক্ত
: সম্পৃক্ত, আমি বলছি আমার রক্ত বাজে

: বৃথাই রক্তক্ষরাতাল
: রক্তের স্পন্দন মিথ্যা, তবে
: মিথ্যা নয়, বৃথা
: অস্তিত্ব, তবে অস্তিত্বের অসহটান, উন্ম লপ্রবল
টান, জন্মযন্ত্রণার নাড়ী, টান
: মুক্ত করো, মুক্ত হও
: তুমি কে আমায় হিংসা করো, আমার
মথিতসত্তাকে, দ্বেষে-ঘৃণায়
আমার—
: আমরা ভালোবাসায় প্রবাহিত,
তারপর—
: উত্তর, উত্তর নেই
: তারপর, বালিয়াড়ি, যেহেতু আমরা
: উত্তর, উত্তর
: যেহেতু আমরা ফল্গু নই, ফল্গু হ'তে
পারতাম কে কখন, কোনওকাল, সে সারল্য
অপহৃত
: এখন উত্তর নেই, শুধু তুঙ্গশীর্ষ হিম—
প্রপাত, শব্দ
শব্দের যোজনা শব্দ
: শব্দেই আরম্ভ, নাদ, নভোনিখিলের
গর্ভে বাজে, উত্তর মেলে না, দেখি আমরাই
এক সত্যে পরস্পর, যেহেতু
বিদ্ধ আজ, প্রশ্নে
প্রশ্ন ক'রে, প্রশ্ন ক'রে চলে যাব ব'লে
আমাদের ঢেকেছে একই ভবিতব্য, কাল।

তরুণ সান্যাল

মঞ্জীর কেহবা বলে

মঞ্জীর কেহ বা বলে, কেহ বলে চারু নৃত্যকলা,
রজ্জুতে রেখেছ উল্কা প্রণয় বন্ধনে, কতকাল,
পটক্ষেপ টেনে দিলে রহস্যমদির উর্ণাজাল
স্পন্দিত নক্ষত্রলীলা, কেহ বলে, বিদ্যুৎচপলা।
অচ্ছদ অরণ্য আছি দূরে, একা বর্ষণে শয়ান,
বিস্তার আয়ত হলে জলধর, দিগন্ত অবধি
হয়ে যাবে নিরবধি, স্মৃতি তরঙ্গিত এক নদী,
বৃষ্টিধারা ঝরে গেলে—মুকুলিত তোমার বয়ান।

তরঙ্গ নিদ্রিত আছে জলশীর্ণ, সঙ্কীর্ণ তড়াগে—
(আমার হৃদয় কবে ভরেছিল প্লাবিত কষায়
ঢেকে দিয়ে যেয়ো স্মৃতি মাটির জটিল তমসায়
উদ্‌ভিন্ন পুলকে পুঞ্জ তৃণদল শ্যাম অঙ্গরাগে) ।
ঐ বৃষ্টিধারা রাখে শিলীন্ধ্র, অরণ্য, শিলাস্তূপ
অবিভাজ্য সূত্রে বাঁধা ফুল্লপুষ্প জটিল প্রস্তরে—
অস্থির বিদ্যুৎরেখা যেয়ো রেখে সে-মেঘাড়ম্বরে
এবং উল্কায় রাখো পায়েল, মঞ্জীর, অপরূপ।

মঞ্চ জানি ঘুরে যাবে, নিরবধি নদীর মুদ্রায়
অর্ধনারীশ্বর শিল্প জলে ওঠে, নেভে, ভেসে যায়।

সত্যাসত্য উপন্যাসের শিল্পকর্ম

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যাসত্যের ভূমিকায় অন্নদাশঙ্কর জানিয়েছেন যে ইচ্ছা ছিল সত্যাসত্য
এপিক হবে, তথা রূপক। সুধী এবং বাদল হবে সত্য এবং অসত্যের
প্রতীক—এই ছিল লেখকের বাসনা। বাসনা ছিল—উজ্জয়িনী হবে সংকটারূঢ়
মানবাত্মা। লেখক বলছেন—'আইডিয়াটাকে মগজ থেকে কাগজে নামিয়ে
দেখা গেল বাদল সুধী উজ্জয়িনী আমার হুকুম মানে না। অবাধ্য সন্তানের
মতো যা খুশি বলে, যা খুশি করে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যায়।
দেখতে দেখতে তাদের চরিত্র বদলে গেল, সম্বন্ধ বদলে গেল। মানসসরোবর
থেকে নির্গত হয়ে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র দুই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হল, গঙ্গা
ধাবিত হল তৃতীয় দিকে—এই তিন নদনদীর সঙ্গ নিল ও ছাড়ল যত
উপনদ উপনদী, শাখানদ শাখানদী। তাদের সবাইকে রূপকের অঙ্গীভূত করা
যায় না, তারা এক একটা শক্তি নয়, ব্যক্তি। রূপক গেল, কিন্তু এপিক
রইল।' যে সচেতন উদ্দেশ্য সত্যাসিত্যের অব্যবহিত পূর্বপ্রেরণা, অচিরে
দেখা গেল যে সার্থক শিল্পের শাশ্বত ন্যায় অনুসরণ করে সেই সচেতন
উদ্দেশ্যের সংকীর্ণ চতুঃসীমাকে লেখক অতিক্রম করে গেছেন। 'আমার
হুকুম মানে না'—এ কথাটা কতকটা সৌখীন উক্তি। কেননা ঔপন্যাসিক
হন অথবা নাট্যকারই হন, সৃজনী ক্ষমতা জীবন এবং শিল্পের দ্বৈত লীলার
সেতুবন্ধন প্রয়াসী; তাই সেতুরচনা নামত রচনা হলেও যেহেতু তা বন্ধন
বন্ধনের কঠিন নিয়ম শিল্পীকে পালন করতেই হয়। তথাপি রূপকের হাত
সত্যাসত্যের শেষপর্যন্ত উপস্থিত এবং তাতে তার মর্যাদার হানি হয়
শুধু রূপকের বেশ বদল করার জন্য সিদ্ধির তারতম্য এসেছে। সে কথা
বর্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য।

অন্নদাশঙ্কর রবীন্দ্রনাথ এবং চৌধুরি মহাশয়ের মুক্তদৃষ্টির প্রসাদলব্ধ হয়ে
শুধু প্রসাদের মূল্যেই প্রসন্ন ছিলেন না। উপন্যাসে এক ধরনের বিশ্ব
বা সভ্যতা-সচেতনতাকে তিনি ব্যবহার করলেন, যার বিমুক্ত সংস্কৃতি-মনস্ক

…ভিত্তিতে হয়তো প্রমথ চৌধুরি এবং তাঁর প্রকৃতিচেতনা ও সহজ মানবিকতার
…মূলে হয়তো রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে অপার আধুনিক
…আগ্রহের জন্য যা হয়ে উঠল বিশিষ্ট। "উজ্জয়িনী হবে সংকটারূঢ় মানবাত্মা"—
…শেষপর্যন্ত উজ্জয়িনী নিজে তা হয় নি কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইউরোপের মানবতার
…সংকটকে অন্নদাশঙ্কর উপন্যাসস্থ করেছিলেন। এই সভ্যতার সঙ্কট সম্বন্ধে
…চেতনা এবং আগ্রহের গূঢ় অর্থে অন্নদাশঙ্করের আধুনিকতা এবং স্বাতন্ত্র্য
…টুকুই গৌরবময়। স্মর্তব্য, যে বাংলা সাহিত্যে এখন শরৎচন্দ্রের জনতা-
…প্রিয়ের কাল, তখনই কল্লোলের কলরবে সমুদ্রের গভীরতা না বাজলেও
…নানা জলতরঙ্গের বিদেশী সুর,—শ্রীকান্ত-অমিত এবং অচিন্ত্য-প্রেমেন্দ্রের
…পথিক চিত্তসম্পন্ন নায়কেরা তখনকার অস্থিত-মূল মধ্যবিত্ত-মানসের প্রতিভূ—
…এই সাহিত্যিক পরিবেশে তখন অন্নদাশঙ্করের নায়ক নায়িকাবৃন্দ একে একে
…আবির্ভূত হল। শরৎচন্দ্র তাঁর ধারেকাছে নেই, কল্লোলের পথিক-স্বভাব
…বেদনা-বিলাসের তিনি কেউ নন। তিনি বললেন—'এপিকের বিষয়বস্তু
…সত্যাসত্যের হিসাব-নিকাশ। পটভূমিকা কেবলমাত্র মানব সংসার নয়,
…নক্ষত্রনীহারিকার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় পারম্পর্য, অণুপরমাণুর চিরন্তন অস্তিত্ব।
…নায়ক-নায়িকার তিনজনের তিন পন্থা। সুধী গ্রহণ করেছে ইন্টুইশনের মার্গ,
…বাদল ইন্টেলেকটের, উজ্জয়িনী আত্মনিবেদনের। তিনজনের আকাংক্ষা
…তীব্র ও বিপুল, অধ্যবসায় একাগ্র ও একান্ত, নিষ্ঠা নিবিড় ও নিগূঢ়।'
…সুতরাই দেখা যাচ্ছে যে এ উপন্যাসে মানুষের আত্মচেতনার বহু সাক্ষ্য বিদ্যমান
…থাকার কথা। এবং সেই দ্বন্দ্বসংঘাতসংযুক্ত চেতনা-লোকের ভাষাও লেখককে
…খুঁজে নিতে হবে। সত্যাসত্যের এপিক ধর্মসম্বন্ধেও লেখক নিজেই একটি
…নিরিখ আমাদের দিয়েছেন—যথাকালে এই উপন্যাসের ভাষার বিচারও হবে
…সেই নিরিখের ব্যবহারে। নিরিখটি হল—'এপিকের লক্ষণ নায়ক-নায়িকার
…লক্ষ্যের উচ্চতা ও প্রয়াসের মহত্ত্ব।'

…লক্ষ্যের উচ্চতা সম্বন্ধে পূর্বে সুনিশ্চিত হয়ে প্রয়াসের মহত্ত্বের কথা
…আলোচনা করা যাবে। বাদল এই উপন্যাসের নায়ক, অন্যতম নায়ক সুধী।
…বাদলের বক্তব্য হল Free will এবং determinism-এর দ্বন্দ্বে Free will-এর
…জয় কল্পনাতীত নয়। বাদল ভারতীয়। কাজেই বাদলের পক্ষে Free
…will-এর প্রবক্তা হওয়া বলিষ্ঠ সত্যসন্ধিৎসারই পরিচয়। সুধী বাদলকে
…বলে—জীবনের সঙ্গে ফ্লার্ট করো না। সম্ভবত এইটাই সুধীর জীবনের

তাৎপর্য। উজ্জয়িনী জীবনের রসপিপাসায় পরিপূর্ণ। 'কার [illegible] 'কার কচ্ছে আমার আদর'? আত্মনিবেদনের জন্য সে আকুল। [illegible] তিনটি চরিত্রের লক্ষ্যের তাৎপর্য কী? সম্ভবত অস্তিত্বের মূলীভূত [illegible] অবহিত হওয়াই কুশীলবদের লক্ষ্য। জীবন শুধু বিরহমিলন কাহিনী [illegible] নয় শুধু মনের আগমরহস্যের সিংহদ্বার উন্মোচন। প্রকৃতপক্ষে [illegible] একালের বেঁচে থাকায় উপলব্ধির সর্তটি প্রধান। সমাজ, সভ্যতা [illegible] ইতিহাসের জটিল রূপসম্বন্ধে সচেতনতায় জীবনের তাৎপর্য অন্বেষণের [illegible] ত্রিশের ইউরোপে সেই সচেতনতা জন্মলাভ করেছে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের [illegible] রক্তহারা ক্লান্তির পথে। জীবনের গার্হস্থ্য চেহারায় এই ক্লান্তির [illegible] প্রতিফলন। ভারতবর্ষে জীবনের চেহারায় ত্রিশের যুগেও মাত্র চাকুরির [illegible] সঙ্কটের ছায়া। কল্লোলের শ্রেষ্ঠ রচনা গোকুল নাগের পথিক। [illegible] আভিজাত্যের প্রতি বিদ্রূপ, অথবা অসহযোগ আন্দোলনের কথা থাকা [illegible] পথিক শেষপর্যন্ত বিরহ-মিলন কথা। প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপনয়নে [illegible] বাঞ্ছিত রূপ সৃজনে সহানুভূতি নির্মাণের প্রয়াস—যদিও তা [illegible] শরৎচন্দ্রের (মেজদিদি গল্পে) কেষ্ট যেমনভাবে সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে [illegible] শিল্পহিসাবে নিকৃষ্ট হয়েছে, সে পথে পদার্পণ করে নি। জীবনের [illegible] ত্রিশের যুগের কাল-লক্ষণ। কিন্তু সে আশার স্পষ্ট কোনো [illegible] আমাদের মনে গড়ে ওঠে নি। কাজেই আশাভঙ্গের বেদনাও [illegible] পর্যায় ছাড়িয়ে পৌরুষের যন্ত্রণায় গিয়ে উপনীত হল না। সীমিত [illegible] বোধকে নিয়ে বড়ো উপন্যাস সম্ভব নয়। গোরা এবং চতুরঙ্গের পর, [illegible] আমাদের উপন্যাস-সাহিত্য—প্রধানত ক্লান্ত মধ্যবিত্ত জীবনের সর্বরি[illegible] অলস, কর্মবিমুখতাকে রঙিন এবং ভাবময় করে তুলতে চেয়েছে। [illegible] এবং শ্রীকান্ত তার প্রমাণ। এই কারণে অন্নদাশঙ্কর তাঁর নায়কদের ইউরো[illegible] পটভূমিকায় স্থাপিত করেছেন। ভেবেছেন, বাদল-সুধী-র লক্ষ্যের উচ্চ[illegible] এই স্বাদেশিক অষ্টাবক্র জীবনের আধারে ধারণ করা অকল্পনীয়। [illegible] ইউরোপে সভ্যতার অন্তর্দ্বন্দ্ব-জাত টানাপোড়েনে এই লক্ষ্যগত [illegible] বাস্তব পরীক্ষা। উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ ব্যতীত সমতলে যেমন শৈলবীরদের [illegible] অভাবনীয় সেইভাবে বলা যায় ইউরোপের জটিল গ্রন্থিল জীবন[illegible] মাঝখানে না দাঁড়ালে গ্রন্থিমোচনের গ্রন্থপাঠ সমাপ্ত হবে না। [illegible] সকলেরই উদ্দেশ্য জীবনকে বাইরের শক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট ছকের হাত [illegible]

[illegible] করা—এককথায় গ্রন্থিমোচন। বাদলের Free will এবং সুধীর [illegible] জীবনপ্রীতি দুয়েরই লক্ষ্যমুখ এই দিকে। উজ্জয়িনীর ব্যক্তিজীবনের [illegible]মোচন-কল্পনাও এই প্রসঙ্গেই বিবেচ্য। আধুনিক অর্থে যে তীব্র [illegible]স্বাতন্ত্র্যে সত্যাসত্য উপন্যাসের প্রধান পাত্র-তিনজনের উদ্ভাসন [illegible]বর্ষের পক্ষে সে আলোকরশ্মির কথা জনশ্রুতি। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এখানে [illegible]-সভ্যতার বিবর্তনের অমোঘ টানে উদ্ভূত নয়। কেতাবে পাওয়া [illegible]। নানা মতবাদের মতো এও হয়তো আমাদের কাছে একটা [illegible]'। উজ্জয়িনীর পিতার মতোই অসম্পূর্ণ এবং অসহায় এখানকার [illegible]স্বাতন্ত্র্যবাদীর চেহারা। এখানে জীবন নিয়ে ওরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার [illegible] স্বাধীনতা কল্পনা করা দুরূহ। বাদলের মতো আত্মগোপনের ব্যাপারও [illegible]নে সন্ন্যাসের ছকে বাঁধা। জীবনের মধ্যবর্তী হয়ে আশ্রমধর্মের অবহেলা [illegible]কাতাতেও ত্রিশ সালে সম্ভব ছিল না। কাজেই ইউরোপ ছাড়া [illegible]সত্যের ঔপন্যাসিক কল্পনার স্বভূমি লেখকের পক্ষে ছিল দুরধিগম্য। [illegible] উচ্চতার সঙ্গে এই পটভূমি অপরিহার্যভাবে জড়িত।

প্রয়াসের মহত্ত্ব এপিকের নায়কের আরেক অন্যতম চরিত্রলক্ষণ। [illegible] উচ্চতা সত্যের সন্ধানে—প্রয়াসের মহত্ত্ব সন্ধানের তীব্রতায়। কিন্তু [illegible] হল এই যে রামচন্দ্র এবং সীতার জীবনে সত্যের প্রতিষ্ঠা ছিল অবিচল [illegible] দৃঢ়বদ্ধ। প্রশ্নটা আমাদের মহাকাব্যের নায়কের কাছে এ ছিল না যে [illegible]টা কী? সত্য ছিল তখন জীবনাচরণের সঙ্গেই যুক্ত। তাঁদের সংগ্রাম [illegible] প্রতিষ্ঠিত সত্যের মহিমাকে রক্ষার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের তীব্রতায় [illegible] প্রয়াসের মহত্ত্ব। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থদশকে সত্য কী সে সম্বন্ধে [illegible] সন্দিগ্ধ। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দানে র‍্যাশনালিজম ধর্মকেও একদা [illegible]বিত করতে চেয়েছে বটে কিন্তু উনিশ শতকের ইংলণ্ডের হ্যাঁ এবং [illegible]-এর দ্রুত কাটাকুটির ভিতরে সমুদয় Imperfect Synthesis-এর [illegible] সত্যের পূর্ণ চেহারা মেলে নি। যুদ্ধোত্তর ইউরোপেও সঙ্কটের [illegible] ছায়ারণ্যে সত্যের সন্ধানেই মানুষ ফিরেছে। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত [illegible] মহিমা রক্ষার জন্য সংগ্রামে যে ইতিবাচকতা তার ফলস্বরূপে প্রাচীন [illegible] সরল বলিষ্ঠতা ছিল স্বাভাবিক। 'সত্য কী'—এই অন্বিষ্ট নিয়ে [illegible] আধুনিক সন্ধানী যাত্রা সেখানে নায়কের জীবনরেখা জটিল বঙ্কিম হতে [illegible]। টমাস মানের ম্যাজিক মাউণ্টেন তার প্রমাণ।

দুই

ম্যাজিক মাউণ্টেনের জন্য নির্ধারিত ঘটনাস্থল ইউরোপের সংস্কৃতির রূপকরচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। নায়ক Hans Castorp-এর জীবনজিজ্ঞাসাকে এই রুগ্নাবাসের পটভূমিকায় স্থাপিত করেছেন লেখক। Research অথবা The Snow প্রাকৃতিকতা অথবা জীবের প্রা... Settembrini-র বিতর্ক, Walpurgis Night-এর বিচিত্র ... অন্তরালবর্তী প্রাণোল্লাস—সমস্ত কিছুই Hans Castorp-এর কাছে জীবন... পটকে বিস্তৃততর করে তুলেছে। এগুলি যেন নায়কের কাছে ... জীবনের নানা অনুন্মোচিত অধ্যায়কে আলোকিত করেছে। যখন নায়কের জীবনান্বেষার সঙ্গে—যক্ষ্মাবাসের সার্বজনীন প্রচ্ছন্ন মৃত্যুচিন্তার এবং অন্য... অধ্যায়ে বিকশিত ইউরোপের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি, তার বিজ্ঞান, ... মানবতাকে—সম্পৃক্ত হতে দেখি, তখনই 'সত্য কী' এই বোধের ... জীবনসন্ধানী অপরাজেয়তা অধিকতর সত্য বলে প্রতিভাত। সত্যাসত্য উপন্যাসের নায়ক বাদল জীবন অথবা জীবনসত্যকে খুঁজেছে এই জাতী... পদ্ধতিতে একথা উভয় উপন্যাসের যে কোনো তুলনাই অবান্তর জেনে... বলা চলে। ম্যাজিক মাউণ্টেনের লেখক বুঝেছিলেন যে যুদ্ধপূর্ব ইউরোপ রোগজীর্ণ। যুদ্ধ এল আর ঘনিয়ে এল সঙ্কট তা নয়। নানা খাত ... সঙ্কটের স্রোত এসেছে বলেই যুদ্ধ। Joachim যেমন নিজের সমস্ত ... শারীরিকতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে সাহসী সৈনিকের মতো, Hans Castorp-এর শেষতম পরিণতিতেও হয়তো তারই ছায়া দুর্লক্ষ্য না। আমাদের নায়ক বাদল দেখেছিল যুদ্ধদীর্ণ ইউরোপকে। বাদলের জগৎ যুদ্ধো... বিশ্বজনীন শূন্যতার রূপক, ইংলণ্ডের দ্বীপভূমি তার উপযুক্ত অনুকূল ক্ষে... সেও এখানে সন্ধান করেছে জীবনসত্যের।

বাদলের অভিজ্ঞতার মাধুকরীতে আশ্চর্য শক্তি দেখিয়েছেন অন্নদাশঙ্কর। এই গ্রন্থখানি যে পথে-প্রবাসের বিদেশবিবরণের সঙ্গে কাহিনী ও চরি... সংযোগ মাত্র হয়ে ওঠে নি তা অন্নদাশঙ্করের প্রখর বক্তব্য-সচেতন... জন্য। তা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন চরিত্রে। মিঃ ওয়েলি দাবারু। ... মাঝে বাদলকে তিনি আহ্বান করেন খেলার জন্য। হাসি তাঁর ... বাদল দেখে নি, মুখের মাংসপেশীতে তাঁর নেই কোনো ভাবতরঙ্গ। ... বিশুদ্ধ র‍্যাশনালিস্টকে দেখে পাঠক নিঃসন্দেহে আকৃষ্ট হবেন। কিন্তু ...

আছে তাঁর ঔদাসীন্যের ব্যাখ্যায় আমরা ইউরোপের গত দুশো বছরের ছায়ার বদলে যেন দেখতে পাব শূন্য ভবিষ্যতের ছায়া। 'ওয়েলি কোনো জিনিসকে ভালো বলেন না মন্দ বলেন না। কারো ভালো বা মন্দ চান না। তাঁর জিজীবিষা নেই। তিনি বেঁচে আছেন, কারণ বাঁচা ছাড়া অন্য কিছু করতে পারেন না, করবার ইচ্ছে যে নেই। আত্মহত্যা করলে যে অস্তিত্ব থাকবে না অথবা আবার বাঁচতে হবে না, এর প্রমাণ কই?' আশ্চর্য এই যে ইতিহাসের শঙ্কিল গিরিপথে এই সমস্ত উক্তি যে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে তা শুধু দার্শনিকতার জনক নয়, রিক্ত বর্তমান ও হতাশ্বাস ভবিষ্যতের যে বোধ তৎকালীন ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীমহলে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তার ইঙ্গিতবহ বটে। বাদলের কাছে ওয়েলির বক্তৃতাটি তাৎপর্যপূর্ণ: 'ইচ্ছা কাকে বলব সেন? কার ইচ্ছা? ঐ সমস্ত cell-এর ইচ্ছা? Cell-সমষ্টির ইচ্ছা? ইচ্ছার লক্ষ্যটা কী? আরো কিছু কাল জীবনধারণ? দুদিন কমবেশিতে কি আসে যায়? জীবন যদি যায়ও তবে এমন কি আসে যায়? Cell-গুলো বাঁচতে পাবে না, শুকিয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। কিন্তু শেষপর্যন্ত atom-গুলো তো থাকবে? Personal immortality-র কথা ওঠে না, যেহেতু person বলে কিছু নেই। আর atomic immortality তো স্বতঃসিদ্ধ।'

মানবজাতি থাক বা না থাক তাতে ওয়েলির ভ্রূক্ষেপ নেই। Nothing matters in the last analysis। অন্নদাশঙ্কর গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে উপন্যাসের সমকালীন বুদ্ধির সঙ্কটকে অনুভব করেছেন এবং ওয়েলি-চরিত্রের সাহায্যে তার রূপ নির্মাণও করেছেন। কিন্তু বাদলের কাছে ওয়েলি শুধুই ইংলণ্ডীয় বৈচিত্র্যমালায় নানা ফুলের একটি ফুল, নাকি বাদলের কাছে এর কোনো মূল্য ছিল? পরবর্তী অধ্যায়ের বাদলকে দেখে মনে হয় ওয়েলি তার মধ্যে পলায়নের প্রকৃতি ছাড়া কোনো বৃহৎ প্রশ্ন সঞ্চার করতে পারে নি। Hans Castorp-এর What is Life? আর বাদলের মুক্ত জীবনাকাংক্ষায় যে মূলগত তফাত তারই ফলস্বরূপে এই প্রশ্নর অবিদ্যমানতা। বাদলের মুক্ত জীবনাকাংক্ষা প্রকৃতপক্ষে একটা কিছু প্রমাণ করতে চাওয়া। প্রমাণের প্রয়োজনে তার যা কিছু। উজ্জয়িনীকে পরিহার এবং পান্থজীবনের গতিবেগ সবই প্রমাণের প্রয়োজনে। জীবনের কোনো সঙ্কট থেকে, জীবনবোধের অমোঘ আকর্ষণে এগুলো ঘটে নি। তাই কারো আসা-

যাওয়াই তাকে কোথাও পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যগ্রিত হচ্ছে না। Research অধ্যায়ে প্রাণতত্ত্বের গবেষণার শেষে Hans যেমন জীবনকে ভালোবাসার রূপকে ভেবেছিল, বাদলের জন্য সে জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ কোনো পরিস্থিতি সৃজিত হল না। বাদল যেন ইংলণ্ড আবিষ্কারে বেরিয়েছে। অথচ বাদলকে দিয়ে লেখকের করণীয় ছিল অনেক। প্রতি মুহূর্তের বেঁচে থাকা মানেই প্রতিনিমেষের 'হওয়া'। সেই হওয়ার যে পদ্ধতি তা কি শুধু দু-একজনের সঙ্গে দু-একবারের ইষ্টগোষ্ঠীতেই রূপায়িত করা সম্ভব? ধরা যাক মি মারউডের কথা। দু-বগলে ক্রাচ, খবরের কাগজ নির্ভর এই ব্যক্তিটি আরেকবার লেখকের অন্তর্দৃষ্টির দূরস্পর্শী শক্তির সাক্ষ্য দেয়। সমুদ্রতীর থেকে দূরে একটি ছোটো মার্কেট টাউনে এর সাক্ষাৎ পেয়েছিল বাদল। এর আগে বাদল পেরিয়ে এসেছে মেরিয়ন এবং অশ্বারোহণ-পর্ব। তখন অদম্য উৎসাহে ঘোড়ায় চড়তে যাওয়ার মধ্যে বাদলের স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়াসকে আমরা দেখেছি। মারউড ওয়েলির মতোই ইতিহাসের স্মৃতি। প্রথম মহাযুদ্ধের স্মৃতি। মারউডের বিখ্যাত উক্তি, 'আমার ভবিষ্যৎ নেই, আছে অতীত' অথবা 'বহু সংস্কারকের ঘা খেয়ে খেয়ে পৃথিবী বুড়ি দাসী হয়ে গেছে—একে ভেঙে গড়বার কল্পনা বৃথা'—তখন আমাদের তৎকালীন ইউরোপকে চিনতে দেরি হয় না। হৃত-বিশ্বাস মারউড এবং প্রায় শূন্য-বিশ্বাস ওয়েলি নিশ্চয় লেখকের পশ্চিম ইউরোপের বিপর্যস্ত সামাজিক অবস্থা উপলব্ধির প্রমাণ। এদের দুজনের কথায় এবং আচরণে যে তৎকালীন অবক্ষয়ের মাঝে ধ্বনিত এলিয়ট এবং অডেনের স্বর শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই অকৃত্রিম স্বরের পরেই যখন বাদল বলে (মারউডের প্রশ্ন ছিল, ভারতবর্ষের লিবারেলদের সঙ্গে এদেশের লিবারেল পত্রিকার কী সম্পর্ক)—'আঃ মিস্টার মারউড সারা ইংলণ্ডকে আমি বারবার এ কথা বলে ক্লান্ত হয়ে গেলাম যে আমি জন্মত ভারতীয় হলেও স্বেচ্ছায় ইংরাজ। জন্মের উপর হাত নেই, সেখানে Free will খাটে না। তাবলে কি জন্মের পরও determinism মেনে নিতে হবে?' তখন আমাদের বাদলকে চিনতে কষ্ট হয়। জন্মের পর determinism-কে যে চ্যালেঞ্জ করবে ভারতবর্ষই তা উপযুক্ত ক্ষেত্র হওয়া উচিত। ইউরোপ নানাভাবে নানা দ্বন্দ্বময় জীবন ধারণার মধ্য দিয়ে তার ইতিহাসকে গড়ে তুলেছে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময়েও ইউরোপের জীবন-ভাবনায় ত্রিমুখী চাপ। মুখ্য

রূপে তৃতীয় চাপটা প্রবল। সেটা সোস্যালিজম বা তাকে এড়াতে চেয়ে ফ্যাসিজম। একদিকে ছিল প্রেম ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের খ্রীষ্টীয় ধর্মবাহী ঐতিহ্য, অন্যদিকে পাশাপাশি ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর প্রাধান্য-আরোপী Enlightenment ও Liberalism-এর দর্শন, এর সঙ্গে শক্তিমান হয়ে উঠল যুদ্ধোত্তর সমাজতন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ভূমিকা। এখানে যখন chief desiderata of the age ছিল good life, সামাজিক সাম্য-সুবিচার প্রভৃতি, কিন্তু এ সম্বন্ধে, মানুষের জীবনাচরণের যথার্থ বিন্যস্ত রূপ সম্বন্ধে কোনো মীমাংসিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সম্ভাবনা ছিল দূরপরাহত, যখন মূল্যায়নের সঙ্কট শুরু হয়েছে এবং সঙ্কটের মূল্যায়নও, তখন বাদলের ভারতীয় determinism-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের যদিবা কোনো তাৎপর্য মেলে, ইংলণ্ডীয় হবার জন্য Free will-এর সাধনা হয় হাস্যকর। তার শেষ অধ্যায়ও এ থেকে বিচ্যুত হতে পারে নি। বাদলের 'আমাদের' 'কথাটির মধ্যে যে বিশ্বগ্রাহী সারল্য, একমাত্র তাকে আমরা যুবকবলিষ্ঠতার পরিচয়চিহ্ন বলেই গ্রহণ করে সন্তুষ্ট।

মিস্টার পিউ ভারত-ফেরত ইংরাজ। বাদলের সঙ্গে মারউডের সাক্ষাৎকার যখন ঘনিষ্ঠতার পর্যায়ে তখনই মিস্টার পিউর সঙ্গে বাদলের সংঘাত। ইনি ভারতবিদ্বেষী। বাদলকে কুলির দেশের মানুষ বলেই বোধ হয়, তিনি কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলেন। মিস্ এফিংহামের বাড়ির পার্টিতেও মিস্টার পিউ এবং বাদলের সংঘাত হল। অপমানিত বাদলের পক্ষে মিস্ এফিংহাম আতিথেয়তার ব্রিটিশপরাকাষ্ঠায় অবশ্যই রইলেন। কিন্তু বাদল আইনের আশ্রয় নিতে গিয়ে দেখল যে তার সমর্থকেরা অন্তর্হিত। এ ব্যাপারে বাদলের ক্ষোভ ভারতীয় হিসাবে নয়। মানুষ হিসাবেই। কিন্তু ত্রিশের ভারতীয় যুবক একেবারে বর্ণাধিকার চেতনাবিহীন একথা কল্পনা করা দুষ্কর বলেই এর প্রস্তুতি আমাদের সম্মুখে ঘটা সমীচীন ছিল। সে কারণেই আমাদের কাছে বাদলের পুরো চেহারাটা কখনই স্পষ্ট হল না। জীবনবোধ ব্যাপারটা জীবনেরই পরিণতি। স্বপ্ন বাস্তব স্মৃতি অধ্যায়ে সুধীর অতীত স্মৃতি বিবরণে আমরা বাদলের অতীত পরিচয় পেয়েছি। মাঝে মাঝে আরো নানা প্রসঙ্গে বাদলকে অতীতে বিন্যস্ত দেখেছি, কিন্তু তার চাওয়ার পুঞ্জীভূত শক্তির উৎসটা কোথায় বোঝা গেল না। অথচ যখনই সাধারণ ইংলণ্ডীয় চরিত্রের সঙ্গে বাদলের সাক্ষাৎ হচ্ছে সে অভিভূত হয়েছে তাদের

প্রাণবত্তায়। কলিন্স এমনই এক সাধারণ চরিত্র। মেরিয়নের আগে কলিন্সের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। কলিন্স বইয়ের দোকানদার। এক একজন খাঁটি কর্মিষ্ঠ ইংরাজতনয়ের মতো সে বইয়ের দোকানী হয়েই খুশি নয়—হতে চায় প্রকাশক, নিউইয়র্কে থাকবে তার শাখা অফিস। কলিন্স মেরিয়নকে দিয়ে বাদল জীবনের সহজ রূপসাধনাকেও বুঝল না, দেখল শুধু।

তাই বাদল যেখানে গিয়ে পৌছল সর্ববিধ অহমিকামুক্ত সেই উপসংহারে, সেখানে সত্যের সাক্ষাৎ মিলল না। দেশলাই বিক্রেতার জীবনে একটা করুণ ব্যঞ্জনা-গৌরব আছে হয়তো, কিন্তু সত্য গৌরব কোথায়? শ্রেণী পরিচিত মানুষের পরিচয় না থাকতে পারে কিন্তু বিমুক্ত মানুষের Free will-এর ও পরিচয় বাদল খুঁজছিল দেশলাই বিক্রেতার জীবনে কি তার ইঙ্গিত ছিল। আসলে বাদলের চরিত্র পরিকল্পনায় এবং তাকে উপন্যাসে উপস্থাপনায় অন্নদা-শঙ্করের একটি মূলগত ত্রুটি ঘটেছে। বাদলের বীর্যবান সারল্য প্রশ্ন চিন্তা পক্ষে উপযুক্ত নয় এটা প্রথম ত্রুটি। দ্বিতীয় ত্রুটি যতগুলি তাৎপর্যপূর্ণ চরিত্রের সঙ্গে বাদলের সম্পর্ক ঘটেছে তারা সকলেই উপসংহারে উপনীত চরিত্র। ওয়েলি মারউড তার উজ্জ্বল উদাহরণ। অন্যদিক থেকে পিউ ব্যতিক্রম নয়। ফলে এদের উপসংহার থেকে বাদল কোনো উপক্রমণিকার সন্ধান পেল না। ওয়েলির কাছ থেকে সমুদ্রতীরে গমন এবং উদ্দাম জীবনের প্রয়াস যতটা ওয়েলির কাছ থেকে পলায়ন ততটা ওয়েলির প্রতিক্রিয়া নয়। শুধু একটা বিপরীত ছক সৃজন। আবার ওখান থেকে মারউডের অভিজ্ঞতায় যাওয়ার কোনো জিজ্ঞাসার বিস্তৃতি সাধন নয়। ফলে কমিউনিস্ট বাদল, মিস্টিক বাদল, নানা বাদলের দেখা পেলাম বটে কিন্তু তার অন্তিম পরিণতিকে কোনো সত্য জিজ্ঞাসার অপরিহার্য ফল বলে মেনে নেওয়া গেল না। বড় বড় রাশি বসানো হল। যোগফলে এত বড় শূন্য সেই রাশিগুলিকে মিথ্যা করে দিল। বাদলের যাত্রাই দুর্বল হয়ে গেল।

তিন

সেদিক থেকে উজ্জয়িনী এবং সুধী এ উপন্যাসের বলিষ্ঠ নির্ভর। উজ্জয়িনী আমাদের কাছে আদি অন্ত সমেত পূর্ণ এক নারী হিসাবেই প্রতিভাত। উজ্জয়িনীর পিতা, উজ্জয়িনীর শ্বশুর যোগানন্দ এবং মহিমচন্দ্র, উজ্জয়িনীর সখিবৃন্দ, স্বদেশে বিদেশে তার অভিজ্ঞতা সব মিলিয়ে সে শুধু সংকীর্ণ

মানবাত্মা নয় সম্ভবত আধুনিক ভারতবর্ষও। উজ্জয়িনীর পিতা এবং উজ্জয়িনীর শ্বশুর আধুনিক ভারতবর্ষের দুই রূপ। এখান থেকে উজ্জয়িনীর শুরু। কাজেই এই উভয়ের সামান্য পরিচয় গ্রহণ প্রয়োজন। উজ্জয়িনীর পিতা নব্য ভারতবর্ষের একদিক। যেদিকে তার সংস্কারমুক্ত মানসিকতায় পাশ্চাত্য ভাবাকাশের উজ্জ্বল আলোকরশ্মির প্রতিফলন। উজ্জয়িনীর শ্বশুর ভারতবর্ষের বিকৃতির চিহ্নধর। শ্বশুর বাড়িতে উজ্জয়িনীর কোনো পরীক্ষার আয়োজন লেখক করেন নি! ব্রিটিশ উপনিবেশের চাকুরিঅন্ত আভিজাত্যের রায়বাহাদুরীর প্রতীক উজ্জয়িনীর শ্বশুর। মিসেস শ্যামুয়েলসের অবতারণা করিয়ে লেখক এই ভদ্রলোকের হ্যাংলামিকে চূড়ান্ত কশাঘাত করেছেন। বিদ্রূপ যে অন্নদাশঙ্করের স্বক্ষেত্র নয় উজ্জয়িনীর শ্বশুরের কাঙালপনাকে কুকুরের হ্যাংলামির সঙ্গে তুলনা করে তা তিনি প্রমাণ করেছেন। এ আঘাতে আমাদের লৌকিক ক্ষোভের নিরসন ঘটে বটে, কিন্তু বিদ্রূপের আতিশয্য বোধহয় এই গভীর যন্ত্রণা মথিত উপন্যাসে সুসঙ্গতি লাভের উপযুক্ত বিষয় নয়। সে যাই হোক এখানে উজ্জয়িনীকে আকর্ষণ করত—সম্ভতঃ এই বাড়িরই পিঙ্গল প্রাণহীনতার প্রতিক্রিয়ায়—পাশের বাড়ির ছোট সাধারণ শ্রমক্লান্ত পরিবারের দাম্পত্যজীবন। যে আত্মনিবেদনের থালা পূর্ণ করার সাধনা উজ্জয়িনীর—এই ছোট পরিবারের রূপকে হয়তো তারি কিছু আভাস সে পেয়েছিল। ওদিকে ছিল তার পিতার প্রভাব। যে পিতা সম্বন্ধে ইংলণ্ডে একদা সূচীমুখ জিজ্ঞাসার যন্ত্রণায় জলতে জলতে সে ভেবেছিল: 'অন্তর উদ্বেল হয়। তার সেই স্নেহের বাবাটি নেই। বেচারা বাবা। কেউ তার মর্যাদা বোঝে নি, না ঘরের লোক, না বাইরের লোক। কেউ তাকে চিনত না, তিনি ছিলেন মনের গহনে একাকী। সেই উপেক্ষিত বাবা, পরাজিত বাবা, নিরহঙ্কার ও নিঃসঙ্গ বাবা আজ নেই।' নিঃসঙ্গ একাকিত্বের সাধক উজ্জয়িনীর পিতাকে আমরা মাত্র উজ্জয়িনীর চোখ দিয়েই দেখেছি। চরিত্র হিসাবে সেই বিড়ম্বিত স্বতন্ত্রতার সাধক মানুষটি আমাদের কাছে তত স্পষ্ট নয়। বাবা এবং শ্বশুর দুজনেই শুধু উজ্জয়িনীর ভূমিকা। যে নব ভারতবর্ষ উজ্জয়িনীকে রূপ দিতে চেয়েছে তার দুই দিক এঁদের দুজনের মধ্যে।

উজ্জয়িনীর প্রশ্ন কাকে দেব আমার জীবনের নৈবেদ্য? 'আমি যদি পাখি হতুম, উজ্জয়িনী ভাবে, আমার কোনো প্রশ্ন থাকত না। আমি অসংশয়ে বাঁচতুম ও তেমনি সহজে মরতুম। আমার আসাযাওয়ার চিহ্ন রইত না।

আমি যদি গাছ হতুম তবে তো আমি ভাবতুমই না কোনো কথা। আমি অকারণে বাঁচতুম ও কখন এক সময় চুপ করে মরে যেতুম। কেউ মনে রাখত না যে এখানে একটা গাছ ছিল। আমি যদি পতঙ্গ হতুম তবে হয়তো জানতুমই না যে বেঁচে আছি কি মরে গেছি। আফসোসের বিষয় আমি মানুষ। তাই প্রশ্ন ওঠে বেঁচে কি হবে? কার জন্যে বাঁচব? কার কাছে আমার আদর?'

উজ্জয়িনীকে অনেক কিছুর সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। মিলিয়ে নেওয়া যায় ভারতীয় রসসাধনার ধারার সঙ্গে। মিলিয়ে নেওয়া যায় প্রেমধর্মের নায়িকা রূপে। দেখা যায় তাকে সংকটারূঢ় মানবাত্মার রূপকে, চেনা যায় তাকে চিরকালের রাধাভাবের আখরে চিহ্নিত বলে। এগুলিই উজ্জয়িনীর শক্তির নিদর্শন। আসলে উজ্জয়িনী জীবনের ভাস্বর রূপক। অন্নদাশঙ্করের জীবনার্থ। উজ্জয়িনী কেন দে সরকারকে গ্রহণ করেছিল মাত্র এই অভিযোগে উজ্জয়িনী চরিত্রের ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। কিংবা রূপক সাহিত্যের সনাতন রীতি অনুমোদন করলে এমন উপসংহার কল্পিত হত না—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই মন্তব্যেও উজ্জয়িনীর স্বরূপ নির্ণয় হবে না। শূন্যেরে করিব পূর্ণ এই ব্রত বহিব সদাই—এমন ধরণের একটা লাবণ্য-সুলভ জীবনার্থ-বোধ উজ্জয়িনীর ছিল এমনও নয়। উজ্জয়িনীর সমস্ত জীবন এবং মনন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সে যা খুঁজেছিল তা হল কিসে তার সার্থকতা। উজ্জয়িনী জীবনের রূপক বলেই রূপকের ক্লাসিক বন্ধনগুলি তার প্রসঙ্গে শিথিল। সে বারবার বলেছে আমার মূল্য কোথায়? উজ্জয়িনী বীণাকে দেখে যা বুঝেছে সেইটাই প্রকৃতপক্ষে তার প্রধান উপলব্ধি। সেইটাই বস্তুত তার স্থায়ীভাব। তার পরের যা কিছু সমস্তই অকৃতার্থতার অস্থিরতা থেকে। বাদলের জন্যে রয়েছে তার আকুলতা, অথচ বাদলের জন্য যদি তার 'মানব জমিন রইল পতিত' হয় তাহলে সেই চরম অচরিতার্থতায় সান্ত্বনা কী? তার রাধাকৃষ্ণ, তার মক্ষিরানী-বৃত্তি, তার সকল কিছুর মধ্যেই এই অস্থিরতা। এই লক্ষণ নিঃসন্দেহে এক যুগের 'সঙ্কটারূঢ় মানবাত্মারই' লক্ষণ। যে যুগে মানুষ সার্থকতার পথ সন্ধান করে ফিরেছে—পথ কোথায় হয়তো কেউ কেউ তাদের মতো করে সে কথা জেনেও ছিল কিন্তু অন্য সকলের জটিল পথের অরণ্যে তাদের পথের মুখ গিয়েছিল হারিয়ে। চূড়ান্ত হতাশার মাঝখানে উজ্জয়িনী যখন বলছে 'কেন বাঁচব' তখন তার সঙ্গে দেখা হয়েছে ললিতার। স্বামীপুত্রের সম্পদে

একেশা-ধরা কিন্তু আজ সর্বরিক্ত এই নারীর প্রথম প্রবেশ শোকের শান্ত পদক্ষেপে, অচিরেই কথা বলতে বলতে ললিতা জীবন্ত হয়ে উঠে উপস্থাপিত করলে তার মোক্ষম প্রশ্ন 'কেন বাঁচব না'? 'তুমি জীবনের স্বাদ পেয়েছ, যদিও সাধ মেটে নি তোমার। তোমার পক্ষে বলা সাজে, জীবন নিয়ে কী করব? কিন্তু জীবনের সিংহদ্বারে প্রবেশ করবার সময় যার চোখের ওপর দ্বার বন্ধ হয়ে গেল, প্রাণের পেয়ালাখানি তুলে ধরে পান করবার সময় যার মুখ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হল, তার পক্ষে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করছি আমি, কেন বাঁচবে না?' এই প্রসঙ্গে উজ্জয়িনীর আবেগদীপ্ত সিদ্ধান্ত-বাচন—ঠিক। কেন বাঁচব না। কেন বুঝে নেব না আমার অধিকার, বুঝে নেব না কেন? অবশ্যই কথার আবেগে কথা। কিন্তু তার পরবর্তী জীবন কিছুটা এই বিশ্বাসের বোধে চালিত। সুধীর কাছে প্রত্যাহত হয়ে দে সরকারে আত্মসমর্পণও এই বোধের ফল। দে সরকারের পরিবর্তনের মধ্যে উজ্জয়িনীর সার্থকতার সন্ধান মেলে। সেই দে সরকার, যে সব সময়েই একটা না একটা অ্যাফেয়ারের নায়ক সে ধীরে ধীরে সৌখীন প্রেমিকের বেশ পরিহার করে প্রেমের শুদ্ধ উপকূলে পৌঁছে গেল। এই উপনায়নের মূলে উজ্জয়িনীর প্রতি তার প্রেমের অনুভূতি। দে সরকার সকল দিক থেকে জীবন্ত চরিত্র। সুধীর সঙ্গে উজ্জয়িনী সংক্রান্ত কথোপকথনের কালে সুধীকে তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে, পরাজয়কে নিশ্চিত জ্ঞান করে সে যখন-কথা বলছিল তখনই দে সরকারের সমস্ত প্রবঞ্চিত জীবনের রূপ আমাদের কাছে ধরা দিয়েছে। দে সরকার-রূপী ধূলিমুঠিকে উজ্জয়িনী যখন নিজের অজ্ঞাতে সোনামুঠিতে রূপান্তরিত করে ফেলল তখন উজ্জয়িনীর সর্বরিক্ততাও কাঙাল হয়ে অপেক্ষমানা। এই অবস্থায় দে সরকারকে উজ্জয়িনী গ্রহণ করেছে। এই গ্রহণের ভিতরে অভিজ্ঞতা-দীর্ঘ জীবনের যন্ত্রণার ছায়া পড়েছে, জীবনের অনেয় সম্ভাবনার ইঙ্গিত দুলে উঠেছে। এই দুই আলোকে উজ্জয়িনী হয়েছে জীবনের রূপক। এই উপন্যাসের একটা ব্যাপার লক্ষ্য না করে পারা যায় না। অনেক বিষয়ে দেখা যায় যে একের পরিণতি বা পরিস্থিতি দিয়ে অপরকে লেখক স্ফুটতর করছেন। উজ্জয়িনীর উপসংহার এবং বাদলের উপসংহার যখন এইভাবে আমরা একত্র যুক্ত করে দেখি তখনই জীবনের অপচয় এবং সম্ভাবনার ব্যাপারটা আমাদের কাছে করুণোজ্জ্বল সমগ্রতা লাভ করে।

জীবনকে উজ্জয়িনী কোনো পূর্ব নির্ধারিত দৃষ্টিকোণের সাহায্যে দেখে নি।

সুধীও দেখে নি। তথাপি এই দুজনের মধ্যে সাদৃশ্য দুর্লভ। সুধীর মার্সেলের ভালবাসা আর উজ্জয়িনীর সোনিয়াকে আদর করার মধ্যে তফাত অনেক। একটা জীবন সম্বন্ধে স্নিগ্ধ প্রসন্ন মনোভাব থেকে উৎসারিত। আরেকটা অতৃপ্তি সঞ্জাত। সুধী মানুষের দিকে তাকায়, প্রকৃতির দিকে তাকায়, আত্মার পূর্ণতার আনন্দের মনোভাব নিয়ে। সে স্থিতধী এবং স্থিত-প্রজ্ঞ। সে প্রকাশ্যভাবে ভারতবর্ষের কথা না বলেও ভারত আত্মার যথার্থ প্রতিভূ। সেদিক থেকে সকলের প্রিয় কিন্তু আপন অন্তরে একাকী অথচ অপূর্ণতার কোনো গ্লানি যাকে স্পর্শ করে নি সেই সুধী যেন সত্যের প্রতীক। অন্নদাশঙ্করের রূপকাভিপ্রায় সুধীতে শিল্পসম্মত হয়েছে। এ কথা বলার হেতু এই যে বাদলকে অসত্যের প্রতীক বলা দুষ্কর। তার সত্যজিজ্ঞাসা কোনো ক্ষেত্রেই অসত্য নয়। উজ্জয়িনীর বাদলের জন্য যে আকুলতা তাকেও সংকটের প্রতীক বলা যাবে না। লেখক সে কারণেই বলেছেন যে শিল্প নিজ নিয়মে সেই রূপকাভিপ্রায় খণ্ডিত করেছে। জীবন এবং শিল্পের নিয়ম মেনেও যেখানে এই রূপকাভিপ্রায়কে খণ্ডিত করা প্রয়োজন হয় নি সে হল সুধী। সেই অর্থেই এ উপন্যাস রূপক যে অর্থে মনন ধর্মী উপন্যাসমাত্রেই রূপক। অন্নদাশঙ্কর উজ্জয়িনী এবং সুধীকে দিয়ে সেই রূপকার্থকে তাৎপর্যান্বিত করে তুলেছেন। লেখকের জীবনবোধ সঞ্জাত যে বক্তব্য সেটা চরিত্রপাত্রের বাইরে কোথাও নেই। বক্তব্য ও চরিত্রের পরস্পর ক্রিয়ায় রূপার্থ সমন্বিত আধার-আধেয়ের রূপকে এ ক্ষেত্রে লেখকের শিল্পোদ্দেশ্য সাধিত হয়। লেখকের গদ্য শৈলী নির্মাণে, ঘটনা সংস্থানের, চরিত্র উপস্থাপনায় সর্বত্রই সেই পরস্পর সম্পর্কের অমোঘ প্রভাব। অন্নদাশঙ্করের সত্যাসত্যের শিল্পকর্মেও সেই সামগ্রিক তাৎপর্য সন্ধেয়।

সেই বিচারে সুধী উত্তীর্ণ হয় উজ্জয়িনীর সঙ্গেই। তথাপি—যদি ধরা যায় যে উজ্জয়িনী এবং সুধীর মধ্যে তুলনায় সুধী রূপককে অধিকতর আভাসিত করেছে, তাহলেই শিল্পগত যাথার্থ্যের দিক থেকে সুধীর একক জয়লাভ সূচিত হয় না। কেন না শেষ পর্যন্ত উজ্জয়িনীর রূপকানুগামী না হওয়া এবং সুধীর লেখকের অভিপ্রেত রূপকার্থকে সংহত রাখা—দুইই উপন্যাসে এসেছে উপন্যাসের শিল্প-নিয়মের আবশ্যিক ছন্দের অনিবার্য অভিব্যক্তিতে। লেখক যে শেষ পর্যন্ত জীবন নিষ্কাশিত তাৎপর্যের দিকেই তাকিয়েছেন এটা তারই প্রমাণ বটে।

আগেই বলা হয়েছে যে অন্নদাশঙ্করের মহাকাব্য-কল্প উপন্যাস চিন্তায় প্রধান ত্রুটি ঘটেছে নায়ক চরিত্রের ক্ষেত্রে। নায়কের জীবনের দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা বুদ্ধির স্তরে সীমিত থাকায় আমাদের আপত্তি নেই। যদি সেটা চিন্তার সংকটের আকারে নায়কের জীবনকে নানাদিক থেকে ছায়াচ্ছন্ন করত তাহলে নায়কের মাধ্যমে বা নায়কের চরিত্রের পরিভাষায় বলা লেখকের জীবনবোধ রূপান্বিত হতে পারত। তখন যে কোন দিকেই সে হতে পারত বিচারের যাতসহ। নায়ক কল্পনায় এই ত্রুটি লেখকের বক্তব্য বিষয়ক অসংগতির ফল বলে উপন্যাসের ভাষায় তার কিছু প্রকাশ ঘটেছে। মহাকাব্য-কল্প উপন্যাসে উপন্যাসের উপযুক্ত সংহতি নির্মাণে প্রয়োজনীয় নিরাসক্তি এ ভাষা সর্বত্র রক্ষা করতে পারে নি। মহিমচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করে শাণিত ব্যঙ্গময়তা ভারসাম্যকে লঙ্ঘন করেছে। যে কোনো স্বগত চিন্তায় কবির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বড় দ্রুত। অবশ্যই উপন্যাসের মননধর্মিতার জন্য যদি বা এ হয় প্রাসঙ্গিক—মহাকাব্যকল্প হতে হলে প্রয়োজন যে সংহতির তার পক্ষে এ ক্ষতিকর। সত্যাসত্যের ভাষা সম্বন্ধে মনে হয় মননধর্মী উপন্যাসের পক্ষে এর ভাষা বড় বেশি ঋজুভাষী। চৌধুরি মহাশয় সেখানে প্রত্যক্ষ। মহাকাব্য কল্প উপন্যাসের পক্ষে এ বড় বেশি লেখকের ব্যক্তিস্বাক্ষর চিহ্নিত। 'আঁধার রাতে একলা-পাগল যায় কেঁদে' এই গীতিময় ভাবোচ্ছ্বসিত উদাহরণে বাদল আমাদের সহানুভূতির ভিখারী হয়—যেটা এ উপন্যাসের অভিপ্রেত নয়। অথচ ধূর্জটিপ্রসাদের অনুচ্চভাষী উপন্যাসের মননজাত পরিবেশে গদ্যের কাব্যিক প্রয়োগ কেমন মানিয়ে গেল তা লক্ষণীয়। বিষয় বর্ণনায় যদি উভয়ের তুলনা করা যায় তাহলে দেখি : অন্তঃশীলায়—'কাঠ ক্রমে ধরে উঠল, প্রথমে ধীরে ধীরে, খানিক পরে জোরে, অতি শীঘ্র দাউ দাউ করে। মাথার একরাশ চুল গেল পুড়ে, কী দুর্গন্ধ যেন উনুনে ফেন পড়েছে। সাবিত্রী একবার রাঁধতে গিয়ে ভাতের হাঁড়ি ফাঁসিয়ে ফেলে। তখন তার চুল আধখানা বাঁধা ছিল। তাই দেখে খগেনবাবু বলেছিলেন, যে রাঁধে সে বুঝি চুল বাঁধে না। সাবিত্রী ভীষণ রেগে উত্তর দেয়—এখান থেকে চলে যাও।'

সত্যাসত্যে : 'আমাদের চেয়ে কত অসহায় ঐসব ছোট ছোট পাখী। কত অনায়াসে ওরা সাগর পারাপার করল। পথে ওদের কত না স্বজন হারিয়ে গেছে, তবু ক্ষণকাল পাখা থামায় নি, থামালেই সিন্ধুর অতল।

আটলান্টিক অভিযাত্রীদের ছোট ছোট ডানাগুলিতে কি দুরন্ত দুঃসাহস আর তাদের ছোট ছোট প্রাণগুলিতে কী প্রখর প্রাণপিপাসা।'

স্পষ্টই বোঝা যায় যে সত্যাসত্যের ভাষায় কাব্যের প্রয়োগ সম্বন্ধে সচেতনতা অন্নদাশঙ্করের লক্ষ্য। এই স্বভাবধর্ম এই উপন্যাসের উপযুক্ত। লেখক যেখানে কবিত্বকে নিজে সঞ্চারিত করতে গেছেন সেখানে ভাষার কষ্ট-কল্পনা সহজে ধরা পড়ে। যেমন : 'প্রকৃতির কাছে উত্তর খুঁজতে বেরোয়। বৃষ্টির আধিপত্য থাকলেও কালটা বসন্তের আস্থ। ফুলের বিপণিতে তার সূচনা লক্ষিত হয়। পথের ও পার্কের তরুরাজি নব কিশলয় সজ্জিত। সাগর পার থেকে পাখীরাও ফিরেছে। তাদের পুনর্মিলনের চাঞ্চল্যে উপবন মুখর।'

এখানে কবিত্বের জন্য লেখকের চেষ্টা ধরা পড়ছে 'আস্থ' এবং 'বিপণি' অসতর্কতায়। যেটা লেখকের স্বভাবত ত্রুটি নয়। পক্ষান্তরে ধূর্জটিপ্রসাদের উপন্যাসে গদ্য যখন ভাবঘনতায় উপন্যাসের নিয়মে কাব্যের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে গদ্যের ছন্দপ্রবণতা আমাদের কাছে উপন্যাসে স্বাভাবিক বলে মনে হয় : 'দুঃখ আসে বনের মাঝে সন্ধ্যার মতন, ধীরে গোপন সঞ্চারে— আমার প্রিয়ার মতো তার নম্রগতি। দুঃখ নামে করুণার মতন, আমার প্রিয়ার মতো বিষাদমাখা স্মিতহাস্যময়ী মুখটি নিয়ে, দুঃখ আচ্ছন্ন করে আমার প্রিয়ার চোখে অশ্রুকণার মতন।'

অন্নদাশঙ্করে গদ্য নায়কের মতো কিঞ্চিৎ অস্থিতমতি বলে মননের ভারে ক্লান্ত। উজ্জয়িনীর নিজের কথার পক্ষে এ মেয়েলী আটপৌরে প্রসাদগুণ শক্তিময়ী। সেখানে আর একবার বোঝা যায় সত্যাসত্যের প্র… শক্তি কোথায়!

বহুদিন আগে অন্নদাশঙ্কর বিষ্ণু দে-কে লিখেছিলেন—'তুমি কবি যত কর্মী যত শ্রমিকের, আমি কবি যত প্রেমিকের।' এ কথার মধ্যে গোলমাল থাকলেও এটা ঠিক যে মানুষের কর্মিষ্ঠসততাকে না ধরতে পারলে সত্যাসত্যের পরীক্ষা অবশ্যই হয় না। প্রেমে মানুষের মুক্তি ঘটে—সভ্যতার সর্ব প্রশ্নেও একথা সত্য। কিন্তু উজ্জয়িনীর মুক্তি ঘটল কিনা সে কথা আমি জানি না। সঙ্কটারূঢ় মানবাত্মা মুক্তি ঘটার পূর্বেই সাধারণ মানুষ হয়ে গেল, আত্মা বদ্ধ হয়ে গেল দেহের বন্ধনে। জীবনকে সহজ সাধারণ করে যে মুক্তি। সম্ভবত এই কথাই সে সমস্ত অভিজ্ঞতার পরিণামে বলতে চায়। সত্যাসত্যের পরীক্ষায় উজ্জয়িনী স্বীকার করল জীবনের সত্য।

গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলা

রবীন্দ্র মজুমদার

আমাদের চিত্রকলার ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে নতুন আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তাতে গগনেন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। গগনেন্দ্রনাথ সেই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। অথচ, সেই সঙ্গে এই কথাটিও বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, সেই নব্য ভারতীয় শিল্প-আন্দোলনের পেছনে যে আদর্শবাদের প্রেরণা ছিল, গগনেন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টি ও শিল্পসৃষ্টি ছিল তার থেকে আলাদা। আমাদের নব্য ভারতীয় শিল্পান্দোলনের একেবারে পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, সেই অবনীন্দ্রনাথ-প্রমুখ শিল্পীদের সঙ্গে থেকেও গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে স্বতন্ত্র, সবচেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির। অথচ, "ভারতীয়ত্ব" আর স্বাজাত্যবোধের দিক থেকে তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি কারও চেয়ে কম ছিলেন না।

গগনেন্দ্রনাথ নিজের তাগিদে এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রেরণায় চিত্র রচনার কাজে নামেন। পরে জাপানী শিল্পী তাইকান ও আরাই যখন কলকাতায় আসেন, তখন তাঁদের আর অন্যান্য জাপানী চিত্রকরদের রচনাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি এক নতুন রূপলোকের সন্ধান পেলেন। গগনেন্দ্রনাথের রচনাবলীর অনুসরণ করবার সময়ে এই কথাটি স্মরণীয়। তাঁর এই সময়ের আঁকা ছবিগুলিতে জাপানী প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে গগনেন্দ্রনাথের রচনা আরেকটি সম্পূর্ণ নতুন বাঁক নিল : ত্রিকোণ চতুষ্কোণ ইত্যাদি জ্যামিতিক 'মোটিফ'-এর ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে রচিত রহস্যভরা কল্পলোকের নানা ছবি—যার ফলে গগনেন্দ্রনাথের চিত্রকলাকে তথাকথিত কিউবিস্ট চিত্রকলার সঙ্গে সমপাংক্তেয় করে উল্লেখ করার একটা ঝোঁক সাধারণত দেখা যায়।

ব্যাপারটা রীতিমতো বিস্ময়কর। সাধারণত আমাদের শিক্ষিত সমাজের

অনেকেই গগনেন্দ্রনাথের ছবিকে আধুনিক ইওরোপীয় চিত্রকলার কিউবিজ্‌ম্‌ -এর সঙ্গে—যে কারণেই হোক—সংশ্লিষ্ট করে দেখেন। এর থেকে কিউবিজম সম্বন্ধে এবং গগনেন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্ত ধারণা তো প্রকাশ পায়ই ; সেই সঙ্গে সাধারণভাবে চিত্রকলা সম্পর্কে আমাদের সাধারণ জ্ঞানের অভাবও রীতিমতো প্রকট হয়ে ওঠে। চিত্র অনুশীলনের বেলায় আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেহাত অশিক্ষিত পটুত্বের ওপরে নির্ভর করে থাকি, চোখকে বিশেষভাবে শিল্পশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার দরকারটাকে তেমন আমল দিই না। সেই জন্যেই আমরা এই রকম ভুল যোগসূত্র তৈরি করে গগনেন্দ্রনাথকে ইওরোপীয় কিউবিস্টদের সমপাংক্তেয় করে দিই ; আবার সেই একই সঙ্গে তাঁকে নব্য ভারতীয় শিল্পীগোষ্ঠীর অন্যতম বলে চিহ্নিত করে নিই।

মনে রাখা দরকার, গগনেন্দ্রনাথ নব্য ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রচরিত্রদের সমসাময়িক ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সেই শিল্পীগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। গগনেন্দ্রনাথের পক্ষে—অথবা কোনো শিল্পীর পক্ষেই—একই সঙ্গে নব্য ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকর আর কিউবিস্ট হওয়াটা সম্ভব নয়—কারণ ইওরোপে কিউবিস্ট আন্দোলন আর আমাদের দেশের নব্য ভারতীয় চিত্রকলার আন্দোলনের মধ্যে প্রকৃতিগত কোনো মিল নেই। ইওরোপীয় শিল্পধারার বিকাশ-বিবর্তনের যে-পর্যায়ে কিউবিস্ট আন্দোলনের জন্ম, আমাদের শিল্পধারা আর শিল্পীমানস তখন মোটেই সেই স্তরে গিয়ে পৌছায় নি। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের মানুষের জাতীয়াবাদী মনোভাবেরই প্রকাশ নব্য ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রকরদের রচনায়—স্মৃতিভ্রষ্ট ভারতশিল্পের ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টার মধ্যে দিয়ে।

চিত্রের বহিরঙ্গের দিক থেকে গগনেন্দ্রনাথের কোনো কোনো রচনার সঙ্গে কিউবিস্টদের রচনার কিছু মিল পাওয়া যায় বটে। যেমন, চিত্রপরিকল্পনায় ত্রিকোণ চতুষ্কোণ ইত্যাদি জ্যামিতিক ছাঁদ—যে-কথা আগেই বলেছি। কিন্তু চিত্রের ভাবধর্মের দিক থেকে এবং চিত্রিত বিষয়কে দেখার জন্যে বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের দিক থেকে গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে কিউবিস্টদের কোনো বিন্দুমাত্র মিল নেই।

তেমনি আবার স্বদেশী মানসিকতার দিক থেকে, ভাবধর্মী রোমান্টিক রচনার দিক থেকে তিনি নব্য ভারতীয় চিত্রকরদের পাশাপাশি থাকলেও, রচনা-

আর চিত্রের আঙ্গিকগত রূপরীতির দিক থেকে গগনেন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, বিস্ময়কর রকমের ইন্‌ডিভিডুয়ল। নব্য ভারতীয় চিত্রকরদের থেকে গগনেন্দ্রনাথের আঙ্গিক রচনাশৈলী আর রূপরীতি আলাদা তো বটেই, বিষয়বস্তু নির্বাচন আর মানসিকতার দিক থেকেও তিনি ভিন্ন প্রকৃতির। যেমন ধরা যাক, নব্য ভারতীয় চিত্রকলার অঙ্কন পদ্ধতি প্রধানত রেখানির্ভর : ভারতশিল্পের ঐতিহ্য-অনুসারী রেখার চারুতা—যার সবচেয়ে সৌন্দর্যময় প্রকাশ দেখতে পাই মুঘল আর রাজপুত চিত্রকলায়—সেইটেই আবার নতুন করে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা ছিল নব্য ভারতীয় চিত্রকরদের রচনার একটা মস্ত বড়ো কথা। গগনেন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছবিই কিন্তু রেখানির্ভর নয়। ছোপের কাজের ওপরেই তিনি বেশি নির্ভর করেছেন। তার মানে এই নয় যে তাঁর রেখা অঙ্কনের কৃতিত্ব কিছু কম ছিল। তাঁর আঁকা 'আনন্দ কুমারস্বামী' 'ওকাকুরা' ইত্যাদি পোর্ট্রেট-স্কেচগুলি দেখলেই বোঝা যাবে—রেখার ব্যাপারে গগনেন্দ্রনাথ মোটেই দুর্বল ছিলেন না। তাঁর রঙের বিন্যাসও নব্য ভারতীয় চিত্রকরদের রঙের তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল সুস্পষ্ট আর সুপরিকল্পিত। নব্য ভারতীয় চিত্রকরদের ছবির সেই অতি পরিচিত জলরঙের ওয়াশ দেওয়া অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্নতা গগনেন্দ্রনাথের মধ্যে নেই। তাঁর অধিকাংশ ছবিতেই —বিশেষত রূপকথার দেশের রহস্যের আভাস জাগানো কল্পনাময় ছবিগুলিতে আলো-ছায়ার যে তীব্র আর নাটকীয় বিরোধ আছে, নব্য ভারতীয় চিত্রকরদের রচনায় তা একান্ত বিরল।

বিষয়বস্তু বির্বাচনেও গগনেন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িকদের থেকে ঢের বেশি আধুনিক। রামায়ণ মহাভারত বা পৌরাণিক কাহিনীকে তিনি তাঁর ছবির বিষয়বস্তু করেন নি বললেই চলে। তাঁর রচনাবলীর সবচেয়ে বড়ো অংশ জুড়ে আছে—দৃশ্যচিত্র বা ল্যাণ্ডস্কেপ, রূপকথার দেশ জাতীয় কল্পনাময় চিত্রাবলী, প্রতিকৃতি, রাজনৈতিক-সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র, আর কিছু ঐতিহাসিক —যেমন চৈতন্যদেবের জীবনসংক্রান্ত—ছবি।

এরপরে, কিউবিস্ট চিত্রকলার সঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের তথাকথিত 'কিউবিস্ট'-ধর্মী ছবির তুলনায় আরও মূলগত এবং গুরুতর পার্থক্যের দিকটা বোঝার চেষ্টা করা যাক।

প্রথমত, ইওরোপীয় চিত্রকলায় উনিশ শতকের স্বাভাবিকতাবাদ বা ন্যাচারালিজম্‌-এর বিরুদ্ধে এবং ছবির মধ্যে দিয়ে গল্প বলার ঝোঁকের

বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে কিউবিজম্-এর উৎপত্তি। আমাদের দেশে গগনেন্দ্রনাথের সময়ে এই কারণগুলি অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং কিউবিস্ট মতবাদ তাঁর পক্ষে গ্রহণ করাটা ছিল নিতান্তই অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, কিউবিস্টদের লক্ষ্যটা ছিল চিত্রিত বিষয়টিকে কোনো বক্তব্য কাহিনীর অনুষঙ্গ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে এনে শুধু তার বস্তুসত্তাকে কতকগুলি জ্যামিতিক প্যাটার্নে বিশ্লিষ্ট করে নিয়ে আঁকা। অর্থাৎ কিউবিস্টরা জোর দিয়েছিলেন শুধু চোখে দেখার জিনিস হিসেবেই বস্তুর জ্যামিতিক বিশ্লেষণের দিকে। গগনেন্দ্রনাথ মোটেই তা করতে চান নি। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল—চিত্রদর্শকের কল্পনাকে উজ্জীবিত করে দিয়ে এক রহস্যানুভূতির ব্যঞ্জনা আনা। এবং এর জন্যে তিনি যথেষ্ট গল্পের উপাদান ছবির মধ্যে ঢুকিয়েছেন। এইসব ছবিতে তিনি বস্তুর জ্যামিতিক চেহারার চেয়ে তার স্থাপত্য-সংগঠনগত ছাঁদের ওপরেই বরং বেশি জোর দিয়েছেন। ফর্ম-সর্বস্বতাই কিউবিস্টদের চূড়ান্ত লক্ষ্য। পক্ষান্তরে, গগনেন্দ্রনাথের 'রূপকথার দেশ' 'স্বপ্নসৌধ' 'তুষারপুরী' 'সাত ভাই চম্পা' (রবীন্দ্রনাথের কবিতার চিত্ররূপ) 'ঐ যে তোমার মানস-প্রজাপতি' (রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রিতা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) ইত্যাদি ছবির আবেদন ও মূল লক্ষ্য এক নিবিড় রোম্যান্টিক কল্পনাময়তা—রূপকথার কাহিনীর রসে যা জারিত। গগনেন্দ্রনাথ তাঁর এইসব তথাকথিত 'কিউবিস্ট'-ধর্মী ছবিতে জ্যামিতিক মোটিফ ও ডিজাইন-নির্ভর পরিকল্পনাকে গ্রহণ করেছিলেন অতি অল্প মাত্রায় শুধু বহিরঙ্গের সামান্য রূপাভাসের দিক থেকে।

গগনেন্দ্রনাথের আঁকা দৃশ্যচিত্রগুলি—পুরীর মন্দির, বীরভূমের লাল কাঁকর বিছানো রাস্তা, ইছামতী, ধলেশ্বরী মধুমতীর তীরে গ্রাম-কুটির, কলকাতার জোড়াসাঁকো শ্যামবাজার পাথুরিয়াঘাটার রাস্তা-গলি, ইত্যাদি—রীতিমতো রিয়লিষ্টিক ধরনে আঁকা। কিন্তু এই রিয়লিষ্টিক বর্ণনার মধ্যে সমগ্রভাবে প্রত্যেকটি ছবিতেই শিল্পীর নিজস্ব একটি মুড অনুভব করা যায়। গগনেন্দ্রনাথের এই ছবিগুলি দেখলে মনে হয়, ছবি আঁকার জন্যে শিল্পী কলকাতার এই রাস্তাঘাটগুলি কোন্ বিশেষ সময়ে কি বিশেষ রূপে সেটা যেন অনেক পর্যবেক্ষণের পর বাছাই করে নিয়েছেন একটি বিশেষ ভাবিত হয়ে। চিৎপুরের রাস্তাকে তিনি ছবিতে ধরেছেন সন্ধ্যা বেলায়

বর্ষা বৃষ্টি হয়ে যাবার পরেকার দৃশ্যে—সারাদিনের চলমান কর্মবহুল ট্রাম-বাস মুখর এই নোংরা রাস্তাটি বৃষ্টি নামার ফলে হঠাৎ নির্জন হয়ে গেছে। শ্রাবণের জলে ধোওয়া তার পরিবেশের মধ্যে দিনান্তের শান্তি নেমেছে।

এই-যে একটি বিশেষ সময়ে বিশেষ অবস্থায় শিল্পী চিৎপুরের রাস্তাকে বেছে নিয়েছেন তাঁর রচনার বিষয় হিসেবে, এইটেকেই বলছি গগনেন্দ্রনাথের নিজস্ব মুড। ছবিটির রঙ-রেখা-কম্পোজিশন ইত্যাদিতে বিশেষ কিছু অসাধারণত্ব নেই—অথচ সব মিলিয়ে চিৎপুরের রাস্তার এই দৃশ্যমান অংশটুকু দূর অতীত কিছু-একটার রূপাভাস জাগায় দর্শকের মনে। কলকাতার নিরন্তর রুদ্ধশ্বাস জীবনের প্রতীক এই চিৎপুর রোডকে বর্ষণক্লান্ত সান্ধ্য আকাশের নীচে হঠাৎ বেশ একটু একান্ত আর মায়াময় বলে মনে হয়।

আর-একটি উদাহরণ, গগনেন্দ্রনাথের 'কাক' চিত্রটি। ইতিপূর্বে তাইকান ও হিসাই-এর উল্লেখ প্রসঙ্গে গগনেন্দ্রনাথের ছবিতে জাপানী প্রভাবের কথা বলেছি। এই ছবিটি সেই জাপানী অঙ্কনপদ্ধতির স্মারক। এখানে চিত্রিত বিষয়ের বস্তুসত্তাকে—অর্থাৎ কাকের অবয়ব, অ্যানাটমি, বসার ভঙ্গী ইত্যাদি—শিল্পী যথাযথভাবেই এঁকেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, রচনার মধ্যে বিশেষ একটি কোমলতা আর কমনীয়তা সঞ্চারিত হয়েছে। এই কাকটি যেন তার বাস্তবতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এক ধরনের সাব্লিমেশন পেয়েছে। কাকের প্রতি দর্শকের মনে এক ধরনের আবেগ সৃষ্টি করেছেন শিল্পী। গগনেন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে কাইব্রাস কাগজের ওপর তুলির ছোপে রঙ ছড়িয়ে দিয়ে শুধু কালির গুরুত্ব-লঘুতার মারফতে মাত্রাগত গভীরতা এনেছেন ড্রয়িংয়ের আশ্রয় না নিয়েই। সব মিলিয়ে এই কাক দর্শকের মনে যে-অনুভূতি জাগায়, তা যেন কাকের এক নতুনতর আর গভীরতর পরিচয়ের চেতনা আনে। প্রত্যক্ষ বস্তু জগৎকে শিল্পী যেমনটি দেখছেন তেমনটিই আঁকছেন, অথচ তার মধ্য দিয়ে নিজস্ব রূপমানসটিকে দর্শকের কল্পনায় ভাবরসাশ্রিত করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'র প্রথম সংস্করণে গগনেন্দ্রনাথের আঁকা কতকগুলি ইলাস্ট্রেশন আছে। রবীন্দ্রনাথের বর্ণনার চিত্ররূপ এই ছবিগুলি সেই বর্ণনার সঙ্গে আশ্চর্য রকম একাত্ম বলে মনে হয়। শুধু সাদা-কালোয় আঁকা এই ছবিগুলির সেই প্রাচীন বট, মেঘলা দুপুর, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির ছাদের উপর থেকে দেখা গঙ্গার দৃশ্য, এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই যেন 'জীবনস্মৃতি'তে

রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তিটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে: "শিশুকাল হইতে কেবল চোখ দিয়া দেখাই অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ যেন সমস্ত চৈতন্য দিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম।" কবির, শিল্পীর এই চৈতন্য দৃশ্যবস্তুর সঙ্গে ভাবের আবেগ আর কল্পনার যোগ ঘটায় এবং অন্যের মনেও সেই ভাবাবেগকে সংক্রামিত করে দেয়।

গগনেন্দ্রনাথের আর এক শ্রেণীর ছবি—যেগুলিকে সম্পূর্ণ কাল্পনিক দৃশ্য-চিত্রের পর্যায়ে ফেলা যায়—সেগুলির কথা আগেই বলেছি। 'রূপকথার দেশ' 'স্বপ্নসৌধ' 'আজান' কিংবা এই জাতীয় সম্পূর্ণ কাল্পনিক দৃশ্যচিত্রে অদির বস্তুসত্তাগুলির একটা সুস্পষ্ট রূপ আছে, প্রাসাদ-সৌধ-মিনারগুলির একটা স্থাপত্য-পরিকল্পনা আছে এবং দেশগত গভীরতা বা স্পেশিয়ল ডেপ্থ্ আছে। তাছাড়া আবেগগত উপলব্ধি তো আছেই—সব মিলিয়ে এইসব ছবি স্বপ্নে দেশের মায়াপুরীর এক অদ্ভুত রহস্যের অনুভূতিও জাগাচ্ছে। ছেলেবেলা রূপকথার গল্প শোনার বিস্ময় কৌতুহল আর রোমাঞ্চ জাগিয়ে তোলে এই ছবিগুলি—সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জেগে-ওঠা রাজকন্যার তুষারপুরীর আশ্চর্য রহস্যাভাস। অপূর্ব অনুভূতিময় এই শ্রেণীর আরও দুটি ছবির কথা আগে উল্লেখ করেছি: একটি রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত কবিতা-সংকলন 'সাত ভাই চম্পা'; অন্যটি 'বিচিত্রিতা'র "ঐ যে তোমার মানস-প্রজাপতি ঘরছাড়া সব ভাবনা যত অলস দিনে কোথা ওদের গতি" কবিতাটির চিত্ররূপ।

গগনেন্দ্রনাথের সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রগুলিকে তাঁর রচনাবলীর আরেকটি শ্রেণীতে ফেলা যায়। গগনেন্দ্রনাথের এই কার্টুন ছবিগুলি আমাদের এক মস্তবড়ো ঐতিহাসিক সম্পদ। এই ব্যঙ্গচিত্রগুলির মধ্য দিয়ে গগনেন্দ্রনাথের সমাজসচেতন মনের আর রাজনৈতিক উপলব্ধির স্বরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। 'বিরূপবজ্র' 'নবহুল্লোড়' 'অদ্ভুতলোক' ইত্যাদি গগনেন্দ্রনাথ আমাদের নানান সামাজিক প্রথার হাস্যকর নিরর্থকতা আর নিষ্ঠুর হৃদয়হীনতার ওপর সরাসরি আঘাত হেনেছেন। আমাদের ইংরেজী শিক্ষিতদের সাহেব সাজার প্রয়াসকে, বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার স্বদেশিয়ানাকে, শিক্ষাপ্রথার গোঁজামিল দেওয়া ব্যবস্থাকে নির্মম বিদ্রূপ করেছেন। ব্রাহ্মণ জাতাসুর ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামির জাঁতাকলে

মানুষটাকে পিষে মারছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয়েছে গ্র্যাজুয়েট ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিনে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যে বিপুল ইণ্ডাস্ট্রিয়ল অগ্রগতি ঘটেছে, তারই সঙ্গে পাল্লা দিতে দাঁড়িয়েছে আমাদের চরকা! মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্ম্স্-কে বিদ্রূপ করেছেন মণ্টফোর্ড-এর 'ঘাটতি' সন্তান-প্রসবের ছবি এঁকে আর "ভারতের প্রতি ভয়ঙ্কর রকম সহানুভূতিসম্পন্ন" রাজা জর্জ-এর প্রতিকৃতি এঁকে। এই ধরনের অজস্র কার্টুন গগনেন্দ্রনাথ এঁকেছেন যার ব্যঙ্গের তীব্রতা মাঝে মাঝে রীতিমতো দুঃসহ। পরাধীনতার গ্লানি, অশিক্ষা আর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, ব্রাহ্মণ-জমিদার প্রভৃতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্রোধ তাঁর ব্যঙ্গচিত্রগুলিতে তীব্র আবেগের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। এবং, এই সব ছবির মধ্যে দিয়ে গগনেন্দ্রনাথের যে সমাজ-সচেতন মানবতাবাদী প্রগতিশীল মনের পরিচয় ফুটে উঠেছে, তা আমাদের পক্ষে একান্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার যোগ্য।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

বিমল ভৌমিক

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক'। রচনাকাল ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০। ইতিমধ্যে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অনেক ওলটপালট ঘটে গেছে। আধুনিক বাঙলা কবিতার পরিমণ্ডলও বদলেছে অনেকখানি। রীতিপ্রকরণে ও আঙ্গিকে এসেছে অনেক বেশি দক্ষতা, ভাবনাবৃত্তের দিকবলয়ের চেহারাও গেছে পালটে। কিন্তু তবু 'পদাতিকে'র প্রাণোন্মাদনা তথা যৌবন-আত্মার নির্ভীকতা আজো স্বাদু লাগে; বোধ করি বেশিই লাগে, কেননা সাম্প্রতিক কবিতায় হৃদয়বৃত্তির জটিলতা কিংবা রহস্যময় অন্তরাশ্রয়িতা কিংবা নব্য রোমান্টিকতা যত বেশি বাড়ছে, সেই হারে প্রাণময় আবেগের পেশল প্রকাশ কমে আসছে। কবিতায় আমরা পরিশুদ্ধ বুদ্ধির শীতল সৌষ্ঠব নিশ্চয়ই চাই, কিন্তু আরো বেশি খুশি হই যদি আমাদের ঠাণ্ডা ও নিশ্চল অস্তিত্বকে কেউ দোলাতে পারেন, উত্তপ্ত বেহিসাবী দুরন্তপনায়। পদাতিক দুরন্ত, অস্থির, উত্তপ্ত এবং কা… যন্ত্রণাময় ভাবনার অবকাশ থেকে একেবারে নিরবকাশ রৌদ্রালোকের নি… বৃত্তে নেমে আসার মতো প্রবল অনুভব। আঙ্গিক বিন্যাসের আশ্চর্য অভিনবত্ব যা একদা বুদ্ধদেব বসুর 'কালের পুতুলে' সঙ্গত স্বীকৃতি পেয়েছিল, আজ আর ততটা অভিনব বা চমকপ্রদ মনে না-ও হতে পারে এবং সময়ের ব্যবধানে 'পদাতিকে'র সেই উজ্জ্বল অবেগ ও বুদ্ধিপ্রাখর্যকে স্তিমিত মনে হতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পদাতিক বাঙলা কাব্যের ইতিহাসে একটি অনতিক্রম্য অধ্যায়।

'পদাতিক' ঘোষণায় ঋজু, ব্যঙ্গে নিষ্ঠুর, ভাবনায় তির্যক এবং বক্তব্যে প্রত্যক্ষ। আমাদের বহুকাল ধরে লালিত কাব্যবোধ তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বপ্নালোকে স্বস্তি পায়, ভাবাবেগের স্তিমিত নির্জনতাই হয়তো আমাদের চি…

কিন্তু পদাতিক নিষ্ঠুর। কেননা আমাদের পরিচিত কাব্যসংস্কারকে তা কখনো প্রশ্রয় দেয় নি। 'পদাতিকে' নেই দীর্ঘশ্বাস, নেই স্বপ্নচারণা, নেই মাধুর্য। প্রকৃতি এখানে অনুপস্থিত, প্রেম অপাঙক্তেয়। ত্রিশঙ্কু অস্তিত্বের প্রতি আঘাত দিতে 'পদাতিক' নির্মোহ। এবং সাম্প্রতিককালের কাব্যধারার পটভূমিতেও 'পদাতিক' স্মরণীয়। জীবন সম্পর্কে এ কবি উদাসীন নন, নিরপেক্ষ নন, রাজনীতিকে কাব্যোত্তর বিষয় ভেবে কখনো তিনি বাতিল করেন নি। যৌবন-আত্মার অমেয় উল্লাস ও প্রখর প্রতিভাই 'পদাতিকে'র প্রধান শর্ত।

কাব্যে সমকালীন রাজনীতি গ্রাহ্য কিনা, এ নিয়ে একালেও মতবিরোধ আছে। এমন অভিমতও কখনো কখনো শোনা যায় যে সমকালীন রাজনীতি কাব্যের গভীরতা ক্ষুণ্ণ করে এবং নাকি ভালো কবিতার জাত মারে। এসব অভিমতকে আমি কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত নই, কেননা 'বিশুদ্ধ কাব্য'-বাদও কোনো না কোনো নীতির মুখাপেক্ষী। কবিতার বিষয় বলে কবি যা গ্রহণ করেন, আবেগ ও ভাবনাসাযুজ্যে কবির অস্তিত্বের সঙ্গে যদি তার একতান সৃষ্টি হয়, তবেই তা কবিতা। সমকালীন রাজনৈতিক অন্তঃস্রোত 'পদাতিকে'র সমস্ত ভাবমণ্ডলের সঞ্চারী। আমার বিশ্বাস, 'পদাতিক' থেকে আজো আমাদের ঋণগ্রহণের দিন ফুরোয় নি।

'পদাতিকে'র রূপকল্প ও বিন্যাসনৈপুণ্যের কৃতিত্ব নিয়ে বহুকাল ধরেই আলোচনা হয়ে আসছে। কখনো কখনো এই নৈপুণ্যকে নেহাতই কারিগরি বলে অভিহিত করার চেষ্টা যে হয় নি তাও নয়। তবু 'পদাতিকে'র মনোযোগী পাঠকমাত্রকেই মানতে হয়, আঙ্গিকসিদ্ধিই এ কাব্যের শেষকথা নয়, এ কাব্যের সিদ্ধি পুরনো ও নতুন মূল্যবোধের ভাঙচুরের অনিবার্য বিরোধ ও বিকাশগুলিকে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে পাইয়ে দেওয়া। রসোত্তীর্ণ হওয়া কাকে বলে, এ নিয়ে বিতর্কের অবতারণা নিষ্ফল, কেননা, রস নামক অনুভবটাই গ্রহীতার মুখাপেক্ষী। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তথা সমগ্র বাঙলা কবিতায় 'পদাতিক' একটি অনিবার্য অধ্যায়।

অর্জিত সাফল্যের পুনরাবৃত্তি যদিচ নিরাপদ, তবু সুখের কথা, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই নিরাপত্তায় আপন কাব্যপ্রগতির সহজাত বিকাশের পথ রুদ্ধ করেন নি। পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'চিরকুটে' কবি আরো অনিশ্চিত ও বিপজ্জনক পরীক্ষায় নেমেছেন। এই পর্যায়ে কবি তাঁর কাব্যলক্ষ্য সম্পর্কে

আরো নিশ্চিত এবং আরো বলিষ্ঠ। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা যায় নি, কিন্তু প্রকাশভঙ্গি অনেক বেশি সদর্থক। 'চিরকুটে'র রচনাকাল ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬। এ সময় বাঙলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট অনেক বেশি গভীর। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত বিপর্যয়ে বাঙালীমানসে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, 'চিরকুটে'র কাব্যভাবনায় তা স্পষ্ট ও সোচ্চার। যেহেতু কবির সমাজচেতনা তথা জীবনবিশ্বাস এই বিপর্যয়কে চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে পারে নি, তাই 'চিরকুট'-এও প্রত্যয় কখনো শিথিল নয়, আবেগ কখনো দ্বিধান্বিত হয়। এই পর্যায়ের কবিতায় একদিকে চড়াগলার সুর এবং অন্যদিকে জটিল আঙ্গিকসিদ্ধ কবিতার চর্চা—দুই-ই লক্ষ্য করা যায়। ব্যঙ্গের শানিতধার তেমনি অব্যাহত। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা ছেড়ে কবি যে একেবারে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ও লড়াই-এর ময়দানে নামতে প্রস্তুত 'চিরকুটে' তার আভাস স্পষ্ট। এ কাব্যের প্রথমেই কবি 'অলীক স্বপ্নের প্রজাপুঞ্জ'কে স্পষ্টতই বিদায় জানিয়েছেন, কাব্যভাবনা সংগ্রামের দুর্জয় সংকল্পের সুরে বাঁধা। যদিচ 'ভূতপূর্ব', 'প্রস্থান', 'সাজঘর', 'চলচ্চিত্র' প্রভৃতি কবিতায় 'পদাতিকে'র সেই তির্যক ব্যঙ্গ-বক্রিম রচনার প্রতিধ্বনি মেলে, তবু 'চিরকুটে'র মূল স্বর ঘোষণায় দীপ্ত, সংগ্রাম-সচেতনায় দৃপ্ত এবং নিশ্চিত প্রত্যয়ে বলিষ্ঠ। অবশ্যই 'চীন : ১৯৪১', 'জনযুদ্ধের গান', 'প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার', 'স্ফুলিংগ', 'দীক্ষিতের গান', 'স্ট্রাইক', 'জবাব চাই' প্রভৃতি কবিতায় কবি বড়ো বেশি স্পষ্টবাক। ঘোষণাগুলি বড়ো বেশি উচ্চস্বর। কবি এখানে স্পষ্টতই কবিতাকে সংগ্রামের হাতিয়ার করে তুলতে চেয়েছেন। সংহতি ও সংগ্রামের শপথ নেবার যে ভঙ্গি এ কবিতাগুলিতে স্পষ্ট, আজকের ভাবনায় তাকে অনিবার্যভাবে কৃত্রিম এবং আরোপিত বলেই মনে হবে। এ কবিতাগুলিকে তাই একটি পরীক্ষার স্তর হিসেবে মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আবেগের অন্তঃস্রোতের অভিঘাতে কবিতা বহির্জাগতিক বিষয়কে কাব্যের অঙ্গীভূত করে। বিষয় তখন বিশেষ থাকে না, হয়ে ওঠে নির্বিশেষ এবং সমগ্র কবিতা আবহে সৃষ্টি হয় কবির বাঞ্ছিত আবেগ-পরিমণ্ডল। উপরোক্ত কবিতাগুলিতে এই পরিমণ্ডল সৃষ্টি হতে পারে নি। অবশ্য এ পর্যায়ের কবিতায় কিন্তু কথনো কখনো প্রায় করায়ত্ত হয়েছে, যেমন 'চিরকুট' কবিতাটির একেবারে সহজ সরল কথ্য রীতিতে লেখা, আবেগ এখানে প্রক্ষিপ্ত নয়,

বক্তব্যের সঙ্গে আবেগের সমীকরণ এ কবিতায় সার্থক। 'এই আশ্বিনে', 'স্মারক' কিংবা 'স্বাগত'-এ একটি গভীরতর সুর স্পষ্ট শ্রুতিগোচর। 'চিরকুট' কাব্যগ্রন্থে উচ্চারণপদ্ধতির বহুমুখিনতা লক্ষ্য করার মতো, কখনো তা ব্যঙ্গে তির্যক, ঘোষণায় সোচ্চার, আবার কখনো বা বেদনাময় আবেগে স্পন্দিত। স্পষ্টই বোঝা যায়, নতুন পথ খুঁজছেন কবি, বিপর্যস্ত মূল্যবোধগুলিকে ভেঙেচুরে কাব্যে একটি মহৎ মূল্য প্রতিষ্ঠার জন্যে ঠিক কোন্ সুর, কোন্ স্বর, কোন্ উচ্চারণপদ্ধতি গ্রহণীয়, সন্ধানী কবি যেন তারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। সাম্যবাদকে কবি জীবনচর্যা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, কাব্যে প্রত্যয়ের সুস্থিরতা তাঁর অধিগত। কিন্তু সংগ্রামী মানুষের চেতনা যে নতুন রূপকল্প ও নতুন প্রতীকের সন্ধানী তা এখনো কবির অনায়ত্ত। এবং অনায়ত্ত বলেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, নানা স্বরবৈচিত্র্যে এই সন্ধানের সততা প্রতিফলিত। 'চিরকুটে'র অধ্যায়কে তাই আমার পরীক্ষামূলক অনুসন্ধানের অধ্যায় বলে মনে হয়।

'চিরকুটে'র পর ১৯৪৮ সালে লেখা 'অগ্নিকোণে'র কবিতাগুচ্ছে 'পদাতিকে'র যুগকে সম্পূর্ণ পেছনে ফেলে একটি নতুন কাব্যধারার প্রবর্তনা ঘটল। মাত্র পাঁচটি কবিতার সংক্ষিপ্ত একটি সংকলনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেল নতুন রূপকল্প প্রতীক। 'একটি কবিতার জন্যে' এবং 'মিছিলের মুখ' এই দুটি কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র প্রত্যয়ের অনিবার্যতা নয়, সামান্যকে অসামান্য করে তোলা হয়েছে এই দুটি কবিতায়। 'একটি কবিতা' শুধুমাত্র একটি কবিতাই তো নয়, এ কবিতা হচ্ছে অনুভবের নতুন এক ভুবন, যা গড়ে তোলাই সৎ কবির অন্বিষ্ট। 'মিছিল'কে কবি শুধু কাব্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাই নয়, 'মিছিলে'র মুখকে করে তুলেছেন একটি প্রতীক। 'চিরকুটে'র পর এ কবিতা দুটোর মধ্যে একটি নতুন স্বাদ পাওয়া গেল, পাওয়া গেল প্রত্যয়কে আবেগের উষ্ণতায় গলিয়ে কাব্য করে তোলার আশ্চর্য সাফল্য।

১৯৫১—১৯৫৭ পর্যন্ত 'ফুল ফুটুক' পর্যায়ের কবিতায় অগ্নিকোণের তীব্রতা নেই, কিন্তু পরিণতির একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে কবির মুখ ফেরানো। লক্ষ্য করার বিষয় 'পদাতিক' ও 'চিরকুটে'র পর থেকেই কবি ক্রমাগত কেতাবী শব্দ বর্জন করে আমাদের প্রত্যহ ব্যবহার্য ভাষার কাছ থেকে শব্দ আহরণ করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, প্রতি দিনের চোখে দেখা ঘটনা এবং আপাত সরল

জীবনের মর্মমূল থেকে আহরণ করে চলেছেন কাব্যের উপাদান। অনেকটা গল্প বলার ভঙ্গিতে স্বল্পরেখায় আঁকা কয়েকটি ছবি—এক একটি মানবিক দলিল। 'মা, তুমি কাঁদো', 'সালেমনের মা', 'অগ্নিগর্ভ', 'একটি লড়াকু মোরগ', 'বাসি মুখ', 'এক অসহ্য রাত্রি', 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' প্রভৃতি কবিতাগুলির প্রত্যেকটিতে এক একটি কাহিনীর আভাস আছে। সে কাহিনী থেকে স্বভাষ মুখোপাধ্যায় আবিষ্কার করছেন তাঁর কাব্যের উপাদান। ঘরোয়া ভাষায়, ঘরোয়া পরিবেশে আঁকা এই কাব্যচিত্রগুলিতে কবি বাহুত কোনো আবেগের প্রক্ষেপ ঘটান নি, অথচ কবিতাগুলোর মধ্যে একটি হৃদয়বান দৃষ্টি আমরা খুঁজে পাই।

একথা ঠিক 'পদাতিকে'র সেই আঙ্গিকসিদ্ধ কবিকে এসব কবিতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেননা এসব কবিতায় নেই আপাত-চমক, নেই বুদ্ধির ঝলকানি, কিংবা নেই ছান্দসিকের কারুকলা। স্বভাষ মুখোপাধ্যায় কাব্য প্রকৃতি আপন রীতি আবিষ্কারের যে পথ বেছেছে, আমার বিশ্বাস, সেই পথে কাব্যের মুক্তি। জীবনের নিষ্ঠুর সত্যের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আত্মমুখী ভাবনা হয়তো চতুর কাব্য রচনা সম্ভব, কিন্তু সে কবিতার প্রভাবের আয়ুষ্কাল স্বভাবত সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। এ কালের ভাবমণ্ডলে আজ এলোমেলো হাওয়া পুরনো মূল্যবোধগুলো আজ একান্তভাবেই ভাঙতে শুরু করেছে, সৌন্দর্য লোকের নিশ্চিত আশ্রয় বিপন্ন, বিচ্ছিন্ন বোধের ঐক্য, নিরাশ্রয় ধ্রুব মূল্যবোধ স্বাধীনতা পরবর্তী প্রত্যাশাগুলো বিধ্বস্ত হল। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় তিক্ততা। সামগ্রিক সমাজ-সংকটের চোরাঘূর্ণিতে নিরাশ্রয় চেতনায় স্বভাবতই সুস্থিরতা নেই। সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতায় তাই একটি উল্টো স্রোতের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। লিরিসিজম্, সিম্বলিজম্, স্যুররিয়ালিজম্-এর নিষ্ফল চর্চায় সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতা অনেকাংশে লক্ষ্যভ্রষ্ট। আধুনিক বাঙলা কবিতায় রিল্কে-মালার্মে-র‍্যাঁবো-বদলেয়র প্রভৃতি কবির অনুকৃতি, বলাই বাহুল্য ব্যর্থ অনুকৃতি বহুলাংশে এই মানস বিপর্যয়ের সাক্ষ্য। সুখের কথা, স্বভাষ মুখোপাধ্যায় শিল্পী হিসেবে আপন কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হন নি।

বাঙলা কবিতায় পয়ার ত্রিপদীর যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কথ্যরীতির পূর্ণ স্বীকৃতি ঘটে নি। এ অবস্থায় ধ্রুপদী রীতিতে প্রত্যাবর্তন শুধুমাত্র বৈচিত্র্য হিসাবেই গ্রহণীয়। কিন্তু কাব্যের সমূহ মুক্তির জন্যে অবশ্য

কবিতাকে কেতাবী চৌহদ্দি ছাড়িয়ে জীবনের আবর্তে নেমে আসতে হবে। স্বভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ফুল ফুটুক' পর্যায়ের কবিতার উল্লেখযোগ্য বিশিষ্টতা এইখানেই যে কবি একেবারে সাদামাটা জীবনের কাছ থেকেই উপাদান আহরণে মনোযোগী। চতুর চিত্রকল্প ও নিপুণ ছন্দোবিন্যাসে তার অবাধ দখল ছিল বলেই একথা সন্দেহ করার অবকাশ ঘটে না যে, ছন্দোবিষয়ে ও কবিতার কারুকর্মে তিনি অমনোযোগী। একটু নজর দিলেই দেখা যায়, মিল প্রয়োগে এখনো তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্য, চিত্রকল্পের বিন্যাসে স্বচ্ছন্দ সৌকর্য। 'পাগল বাবরালির চোখের মতো আকাশ', 'ফাঁসির দড়িতে ঝুলছে কাল বিকেলে মাজা ভাতের হাঁড়ি', 'মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র' প্রভৃতি চিত্রকল্পে আভাস মেলে স্বভাষ মুখোপাধ্যায়ের দৃষ্টি কোন্‌খান থেকে সৌন্দর্য আহরণে উদ্যোগী। বস্তুত কবি নতুন এক কাব্য-জগতের অভিলাষী। এ জগতে সাধারণ মানুষের জীবন থেকে তিনি উপমা খোঁজেন, কথা খোঁজেন, সৌন্দর্য খোঁজেন। 'সুন্দর' কবিতাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেযোগ্য।

স্বভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যধারার ক্রমবিবর্তন একটি নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার অভিযাত্রার সাক্ষ্য বহন করে। সাম্প্রতিক কালের কাব্য প্রয়াসের সঙ্গে তাঁর কাব্যের গরমিল তাই অনেকখানি। বলা বাহুল্য তাঁর কাব্যবিচারে শেষ কথা বলার দিন আজও আসে নি। জীবন থেকে আহরিত উপাদানকে সার্থক কাব্য করে তোলার প্রয়াসে তিনি যে দুরূহ পরীক্ষার পথ বেছে নিয়েছেন, আমরা প্রত্যাশা রাখি, সেই পথেই হয়তো বাঙলা কবিতার দুর্দিন ঘুচবে।

ব্যক্তিগত মনীষায় জাতীয় মানসকে ফুটিয়ে তোলাই কবির কাজ, অভিজ্ঞতা ও চৈতন্যকে প্রতীকী সার্থকতা দিতে পারাই শ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি। স্বভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় অভিজ্ঞতার অনুরণন আছে, কিন্তু আজও তা জাতীয় মানসের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে নি। তাঁর কাব্য প্রত্যয়ের সুদৃঢ় ভিত্তি পেয়েছে, কিন্তু সে প্রত্যয় নতুন জীবন-চেতনার গভীরে দানা বাঁধতে পারে নি। তাই কখনো কখনো তাঁর কাব্য স্বকাশ্রয়ী মনে হয়। শ্রমজীবী মানুষের দিকে তাঁর কাব্য মুখ ফিরিয়েছে। কিন্তু "নতুন নায়ক" তাঁর কাব্যে আসে নি। ভয়ানক সামাজিক আলোড়ন ছাড়া তাঁর কাব্য স্বভাবতই নিরাশ্রয়। অথচ সাম্যবাদী প্রত্যয় তো শুধুমাত্র আন্দোলন-সর্বস্ব নয়। রাজনীতি তো কাব্যে শুধুমাত্র কর্মসূচী হিসেবে আসবে না, আসবে বোধের

তাৎপর্যে। সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষুরধার চূড়ায় দাঁড়িয়ে সামাজিক বিশৃঙ্খলার মরিয়া তাগিদে কবি অবশ্যই উর্দি নিতে পারেন, কিন্তু শুধু ঐটুকুতেই সিদ্ধি সম্ভব নয়; এই সংঘর্ষক্ষত সমাজ-মানসের সমস্ত দুঃখবেদনার ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে ঘটাতে হবে চূড়ান্ত সমীকরণ। জীবনের প্রত্যয়কে শুধু ফর্মূলা হিসেবে নিলে কাব্য ত্বকাশ্রয়ী হতে বাধ্য। তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের স্বীকৃতি দিয়েও কবিকে তাই তাৎক্ষণিকতার সীমানা ডিঙোতে হয়। বোধের গভীরে অবগাহন ছাড়া কাব্যের সার্থকতা সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য, প্রতিবাদী কাব্যের পক্ষেও এ-কথা সত্য।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য, আধুনিক বাঙলা কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে। সমগ্র বাঙলা কাব্যের ধারায় তিনি যোগ করেছেন সমাজ-সচেতনতা—রাজনীতি তাঁর কাব্যে পেয়েছে সহজ স্বীকৃতি, ক্ষুরধার ব্যঙ্গে তিনি অদ্বিতীয়, গ্রাম্য শব্দের বহুল ব্যবহারে তাঁর জুড়ি মেলা ভার, বিষয়বস্তু ও রূপকল্প উভয়তই তিনি বিশিষ্ট স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। প্রত্যয় ও বিশ্বাসের ধ্রুবলোকে তাঁর অধিবাস। জীবনচর্যায় নিরপেক্ষতা কোনো প্রশ্রয় পায় না তাঁর কাছে। বোধের গভীর তাৎপর্যে কাব্যকে তিনি সমাজ-চৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত করবেন এবং ঐতিহ্যকে আরও কিছুটা এগিয়ে দেবেন—এ প্রত্যাশাই করি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যক্রমের পরবর্তী অধ্যায়ের জন্যে তাই আমাদের সাগ্রহ প্রতীক্ষা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা (১৯৩৮-৫৭)। নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

চীনা নাট্যের ইতিকথা

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

কোনো বিদেশী প্রথম চীনে গেলে তার কানে তালি লাগায় এবং চোখ ধাঁধিয়ে দেয় একটা জিনিস—যাকে আমরা এক কথায় বলি অপেরা। সীমান্তের কাস্টম্স-এর হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে রেলগাড়ির কামরায় বসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে লাউডস্পীকারটা খুলে দিলেই প্রচণ্ড আওয়াজে চীনা অপেরার 'ছা' নামীয় করতাল ও 'লুও' নামীয় কাসর এবং দু-তারের যন্ত্র 'আরহু' চীৎকার করে আপনাকে স্বাগত জানাবে। রেডিওতে যে কোনো স্টেশন ধরুন—পিকিঙই হোক, তিয়েনসিং হোক কি সিয়ানই হোক—মিটারব্যাণ্ডে যথেচ্ছা বিচরণ করলে যার সঙ্গে সাক্ষাৎ অনিবার্য—সেটা হল অপেরার গান। আপনি একজন সঙ্গীত-সমজদার ব্যক্তি হলেও আপনার কানে মনে হবে সবই এক সুর। কিন্তু যেকোনো হোটেলবয়কে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন—গান শুনেই সে বলে দেবে এটা চেকিয়াং প্রদেশের 'শাওশিং' অপেরা কিংবা হুপেই প্রদেশের 'হোয়াংমেই' অথবা জেছুয়ান প্রদেশের 'চুয়ান' অপেরা। এমনি মিশে গেছে অপেরা ওদের রক্তে। অপেরা শুনে শুনে ওদের কানের তৃষ্ণা মেটে না—দেখে দেখে মেটে না চোখের ক্ষুধা। চীনা আর্টের সমস্ত শাখা-প্রশাখায় অপেরার প্রভাব অপ্রতিহত। পুতুলনাচ দেখতে যান সেখানেও পুতুলের মাধ্যমে অপেরা। ছায়ানাট্য দেখতে যান সেখানেও অপেরা। আগে থেকে খবর না নিয়ে চলচ্চিত্র দেখতে গেলেও হয়তো দেখবেন পর্দায় প্রতিফলিত অপেরা। জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত রঙীন চলচ্চিত্র চীনের রোমিও-জুলিয়েট 'লিয়াং-শান-পো ও চ-ইন-থাই' দেখতে গেলাম অসীম সাগ্রহে—কিন্তু দেখলাম 'অপেরাচিত্র'—যাকে কোনো অবস্থাতে চলচ্চিত্র বলা যায় না।

যদি আমাদের দর্শককে বলা যায় movie-minded, তবে চীনের দর্শককে

বলতে পারি opera-minded। যেখানের সমগ্র চীনে পেশাদার মঞ্চ... শিশুনাট্যসহ আছে আটান্নটি, সেখানে চলচ্চিত্র ১৯৫৮ ইংরেজীতে ... একশো তিনটি (তার মধ্যে প্রায় বিশটিই 'অপেরা-চিত্র') সেখানে ... ইংরেজীর হিসাবমতো সারাচীনে ছড়িয়ে আছে পেশাদারী সর্বক্ষণ অপেরার দল তিন হাজারের উপর। অপেশাদার অপেরা তো অন্তহীন। আর ... সম্মান এই অপেরাশিল্পীদের। চিত্রতারকারা সব এদের সামনে নিষ্প্রভ। এদের জনপ্রিয়তা এত যে পল্লীর কৃষকদের ঘরোয়া আলাপে শুনতে পাবেন পিকিঙ অপেরার মেইলাংফাং, মা লিয়েন লিয়াং কিংবা সাংহাই অপেরার ইউয়ান-শুয়ে-ফান্ কিংবা কোয়াংটুং অপেরার হোংসিয়াং হ্যা প্রমুখ শিল্পীদের নাম। অর্থ উপার্জনের বেলায়ও তেমনি। সেখানে পাই-ইয়াং, চাউ... প্রমুখ প্রথম সারির চিত্রতারকারা মাসে পান তিনশো ইউয়ান বা ছয়শো টাকা ... মতো সেখানে উপরোক্ত প্রথম শ্রেণীর অপেরা-শিল্পীরা মাসে কেউ ... হাজার ইউয়ান অর্থাৎ দু-হাজার টাকার কম পান না।

বিদেশীর চোখে

অপেরাময় চীন। অথচ প্রথম একবছর যতই দেখেছি ততই ভেবেছি— চীনারা এতে এমন রস পায় কেন? পিকিঙ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রী মিস লাহিড়ী তিন বৎসর চীনা ইতিহাস অধ্যয়ন করে দেশে ফিরবার ... আমাকে বলেছিলেন—দেখুন ওদের সবই ভালো লাগল কিন্তু এই অপেরা— অসহ্য! চীনে আগত আমাদের দেশের সমজদার ব্যক্তিদেরও অনেক ... একথা বলতে শুনেছি। পিকিঙে ভারতীয় চলচ্চিত্র-প্রতিনিধিদের ... সোহরাব মোদী পিকিঙ অপেরা দেখে আসার পর জিজ্ঞেস করেছিলাম—... লাগল? উত্তরে বললেন: যতটা নাম শুনেছিলাম তেমন কিছুই লাগল না।

কোনো দেশের ঐতিহ্যবাহী নাট্য বা সঙ্গীতের রসোপলব্ধি ... রসবোদ্ধাদেরও গভীর অনুধাবন সাপেক্ষ। আর্টের 'সর্বজনীন আ... কথাটা অর্ধসত্য। তাতে চক্ষু-কর্ণের অভ্যস্ততার ব্যাপার আছে। ... একটা জাতির সামগ্রিক ঐতিহ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। পা... উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চীনের সমজদাররাও ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। রাশিয়ান ব্যালে দেখে কথাকলির প্রবক্তা মহাকবি ভাল্লাথল বলেছি... এ তো নাচ নয়, অ্যাক্রোবেটিকস্।

চীনা ভাষা ও সংস্কৃতিতে সুপণ্ডিত খ্যাতনামা লেখক রিউ এলী চীনা নাট্য ... আমাকে প্রায়ই বলতেন—দেখে যাও, অনুধাবন কর—অবশেষে রসের সন্ধান মিলবে। রিউ এলী নিউজিল্যাণ্ডের লোক হলেও ৩৫ বৎসর যাবৎ চীনে আছেন। চীনা সংস্কৃতির মহানদীর অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় এমন স্বচ্ছন্দবিচরণকারী কোনো বিদেশীকে আমি জানি না। তাই বিজ্ঞ বন্ধুর এই উপদেশ পালন করবার চেষ্টা করেছি। এপথে আমার প্রধান শিক্ষক হলেন আকাদেমি সিনিকার সভ্য অধ্যাপক বন্ধু উ-শিয়াও-লিং। তিনি শান্তিনিকেতনে ছিলেন পাঁচ বৎসর। সংস্কৃতনাট্যে সুপণ্ডিত। তিনি মূল সংস্কৃত থেকে 'নাগানন্দম্' ও 'মৃচ্ছকটিক' চীনাভাষায় তরজমা করেছেন। চীনামঞ্চে শকুন্তলা সাফল্যপূর্ণভাবে অভিনীত হবার পথে তাঁর দান অনেকখানি।

চীনা নাট্যের বৈশিষ্ট্য

অপেরাকে চীনাভাষায় যা বলে তা বাংলা হরফে শুদ্ধভাবে লেখা সম্ভব না হলেও শুনতে অনেকটা 'শিচ্যু' বা হ্ছি-চুই-এর মতো। স্থানের নামের পিছনে চ্যু বা হ্ছি লাগিয়ে কোন অপেরা তা বোঝানো হয়। চীনা অপেরা দু-শাখায় বিভক্ত। একটি 'ওয়ান-শি' বা সিভিল অপেরা অন্যটি 'উ-শি' বা মিলিটারি অপেরা। বাংলায় প্রথমটিকে গীতধর্মী এবং দ্বিতীয়টিকে সমরধর্মী বলা চলে। 'ওয়ান-শি' বা গীতধর্মী অপেরায় থাকে রোমান্স, মাতৃভক্তি, অপত্যস্নেহ, প্রেমিকের প্রতি বিশ্বস্ততা—চরম আত্মদান প্রভৃতি অর্থাৎ শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ ও বাৎসল্য রসের অবতারণা। আর 'উ-শি' বা সমরধর্মী অপেরায় থাকে প্রতাপশালী রাজার রাজ্যশাসন, দুষ্কৃতের দমন, বিশ্বস্ত সেনাপতির বীরত্ব, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি অর্থাৎ রৌদ্র, বীর, ভয়ানক ও বীভৎস রসের অবতারণা।

চীনা নাট্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। 'কুতিয়েন' অর্থাৎ ক্লাসিক্যাল, দ্বিতীয় ...য়ান-থুং' অর্থাৎ ট্র্যাডিশন্যাল, তৃতীয় হল 'তিফাং' মানে লোক্যাল বা আঞ্চলিক। দক্ষিণের 'খুইন', উত্তরের 'ই-ইয়াং', পূর্বের 'লিউংজে' ও ...অঞ্চলের 'পানজে' অপেরাকে বলা হত ক্লাসিক্যাল। কিন্তু আজকাল ক্লাসিক্যাল বলতে একমাত্র 'খুইন চ্যু' বা খুইন অপেরাকেই বোঝায়। বর্তমানে একমাত্র পিকিঙ অপেরাকেই বলা হয় ট্র্যাডিশন্যাল এবং সারা দেশময় বিভিন্ন

প্রদেশ ও অঞ্চলের নিজস্ব যেসব লৌকিক অপেরা আছে এককথায় ওদের
তিফাং বা লোক্যাল অপেরা। স্টাইলের দিক থেকে হিসেব করলে সংখ্যা
গিয়ে দাঁড়াবে প্রায় তিনশত।

চীনা নাট্যে মূল চরিত্রগুলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়। 'স্বেং'-নায়ক,
'তান্'-নায়িকা, 'চিং'-চিত্রিতমুখ এবং 'ছৌ'-বিদূষক। সংস্কৃত নাটক মৃচ্ছকটিক
যদি চীনা অপেরা স্টাইলে মঞ্চস্থ করা হয় তবে চারুদত্ত হবেন 'স্বেং',
বসন্ত সেনা হবেন 'তান্', রাজার শ্যালক শকার হবেন 'চিং' এবং মৈত্রেয়
হবেন 'ছৌ'। চরিত্রের এইসব মূল ভাগগুলির আবার ছোট ছোট বিভাগ
আছে। যেমন 'লাও-স্বেং' অর্থাৎ বৃদ্ধ নায়ক, 'শিয়াও-স্বেং' মানে যুবক
নায়ক। নায়িকাও তেমনি। যেমন 'হুয়া-তান' মানে চপলমতি Coquette
type কিংবা 'ছিং-ঈ' বা শান্তমতি Demure type, 'লাও-তান' বৃদ্ধা নায়িকা
বা 'ছাই-তান' সুন্দরী নায়িকা।

বিদেশী দর্শককে চীনা নাট্যে প্রথমেই দুটি জিনিস আকর্ষণ করে সে
হল 'হুয়াতান' এবং চিং বা চিত্রিতমুখ। ঢিলা বর্ণালী রেশমী পরিচ্ছদ, পেছনে
আজানুলম্বিত টাসেল, ভারতীয় দেবীমূর্তির চোখের মতো তির্যক চো
গোলাপী শেড্ দেওয়া মুখের উপর অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত মস্তকাবরণ;
গোড়ালিযুক্ত চপ্পল পায়ে মন্থর আন্দোলায়িত ভঙ্গিমায় 'তান' যখন বাঁদি
থেকে মঞ্চে প্রবেশ করেন—তৎক্ষণাৎ তিনি দর্শকের মন হরণ করে নে
মনে হয় সে সৌন্দর্যসুষমা, লাস্য ও লালিত্যের প্রতিমূর্তি। তার পা
দর্শককে সচকিত করে দেন—ড্রাগন-অঙ্কিত কিংখাব পরিচ্ছদে পৌরু
প্রতিমূর্তি চিত্রিতমুখ চিং চরিত্র। আমাদের কথাকলির সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য

চেন জেন-তুও প্রমুখ চীনা ভাষাবিদ্‌দের মতে চীনা নাট্যের চিত্রিত
নাকি ভারতীয় নাট্যের প্রভাব থেকেই। তবে চীনা অপেরায় তা অ
বিচিত্র ও জটিল। চিত্রিতমুখ চরিত্রগুলি যখনই মঞ্চে অবতরণ করে তা
চরিত্র দর্শকের কাছে আত্মপ্রকাশ করে মুখের বিচিত্র রঙ ও রে
জলরঙে সাদা মুখ—পাতলা কালো গোঁফ ও ভুরু, ঠোঁটে একটু
আভাস ও গোলাপী কান থাকলেই বুঝতে হবে এটা ভিলেন চ
ভিলেন কোনোদিন তেলরঙে চিত্রিত হয় না। চকচকে তেলরঙের
উপর কালো তির্যক ভুরু, চোখ ও গোঁফ, মাথার তিলকে চন্দ্র ও
চীনা তাও দর্শনমতে যাকে বলে 'ইয়াং-ইং'—থাকলে বুঝতে হবে এই

সৎ, স্বদেশভক্ত ও বিচক্ষণ। আবার মুখে তেলরঙের সাদার উপর তেলরঙে ঘন
কালো কয়েকটি রেখা ও গোলাপী চোয়াল দেখলে বুঝতে হবে তিনি
একজন শক্তিশালী বীর কিন্তু বিচক্ষণ নন। মুখের তেলরঙের ঘন নীলের
প্রাধান্যের সঙ্গে পাশিপাশি চিত্রিত লাল, কালো, হলদে রেখার মাঝখানে
কেটে বার-করা মুখের দুদিকে লতানো সাদা রেখা দেখলে বুঝতে হবে এ
চরিত্র অত্যন্ত জটিল ও দুজ্ঞের্য়। এমনি অসংখ্য রঙ ও রেখা ও মেকআপের
চমৎকারিত্বে—চিং চরিত্রগুলি অনভ্যস্ত দর্শককে তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করে কিন্তু
সঙ্গে সঙ্গে হেঁয়ালিরও সৃষ্টি করে, অথচ চীনা সাধারণ দর্শকদের কাছে এসব
চিত্রিত চরিত্রগুলি অতিপরিচিত। কোনো বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না।

প্রতীকী অভিনয়

বিদেশী দর্শকের রসোপলব্ধির প্রধান অন্তরায় হল চীনা নাট্যের প্রতীকী অভিনয়
ও মুদ্রার ব্যঞ্জনা। একজন হাতে একটি আন্দোলায়িত কালো পতাকা নিয়ে
মঞ্চের এপাশ থেকে ওপাশে দ্রুতগতিতে বিশেষ ছন্দে ঘুরে গেলে বুঝতে হবে—
ঝড়ো বাতাস বইছে। অভিনেতার দুপাশে দুজন পরিচারক দুটি চক্রঅঙ্কিত
হলদে রেশমী পতাকা নিয়ে যখন প্রবেশ করেন, বুঝতে হবে সেই চরিত্র রথে
আরোহণ করে আসছে। টাসেল-বাঁধা চাবুকহাতে যখন কোনো চরিত্র
মঞ্চে প্রবেশ করেন, বুঝতে হবে তিনি অশ্বারোহী। কোনোসময় কল্পিত
ঘোড়া নিয়ে নায়কের সঙ্গে হয়তো তার সহিস ঢোকেন। অদৃশ্য দুর্দান্ত
ঘোড়া মঞ্চে লাফালাফি করছে—অনেক কষ্টে সহিশ তাকে কাবু করে আনলে
নায়ক হয়তো অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করছেন—আবার অবরোহণ করছেন—
ইত্যাদি সমস্ত অ্যাকশনই অভিনয়ের মাধ্যমে ঘটছে। কোনো বিদেশীর পক্ষে
সহজ দৃষ্টিতে তা উপলব্ধি করার কথা নয়।

চীনা নাট্যের অভিনয় অত্যন্ত stylised। বিশেষ বিশেষ চরিত্রের
চাল-চলা হাতনাড়া হাসা-কাঁদা বাচনভঙ্গী সবই অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে
নিয়মবদ্ধ। একচুল ব্যতিক্রম ঘটলে চলবে না। চীনানাটকে চরিত্র—রক্ত-
মাংসের চরিত্র নয়—চরিত্রের quintessence বা abstraction। যে ভালো
সে সম্পূর্ণ দোষশূন্য দেবপ্রতিম—যে খারাপ সে শয়তানের প্রতিমূর্তি।

নাট্যশিক্ষায় একজন সাধারণ অভিনেতাকে অতি ছোটবেলা থেকে
প্রায় পনেরো বৎসর কঠোর অনুশীলনের অগ্নিপরীক্ষার ভেতর দিয়ে যেতে

হয়। অ্যাক্রোবেটিক্স্, অসিচালনা, কণ্ঠসংগীতে প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে পারদর্শী হতে হয়। কারণ চীনা অপেরায় তা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অবশ্য এর মধ্যে যাঁরা সমরধর্মী নাট্যের দিকে যান তাঁরা অসিচালনা, অ্যাক্রোবেটিক্স্ ইত্যাদিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন আর যাঁরা গীতধর্মী নাটকে যান তাঁদের কণ্ঠসংগীতে ও নৃত্যে বিশেষ পারদর্শী হতে হয়। চীনা অপেরায় যে নৃত্য তাকে উঁচুদরের প্যান্টোমাইম বললেই ঠিক হয়, ভারতীয় মানদণ্ডে তাকে নৃত্য বলা চলে না। সেদিন পর্যন্ত চীনে কোনো কোনো অপেরায় পুরুষরাই মেয়ের অভিনয় করতেন। যেমন পিকিঙ অপেরায়, আবার কখনো মেয়েরাই পুরুষের ভূমিকায় নামতেন যেমন শাওসিং অপেরায়। এরজন্য যে দক্ষতা অর্জন করতে হত তা ছিল অনায়াস। আজও ৬৫ বৎসর বয়সে মেইলাং ফাঙ-এর অভিনয় দেখলে—তাঁর চলায় ভঙ্গী, দেহচালনা ও বিশেষ করে কণ্ঠস্বর আগে থেকে না জানা থাকলে বলা অসম্ভব যে তিনি পুরুষ। তেমনি শাওসিং অপেরায় যে-সব মেয়ে পুরুষের ভূমিকায় নামেন—তাঁদের অঙ্গভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরে এঁদের মেয়ে বলে ধরা সম্ভব না।

মঞ্চসজ্জা

যদিও আধুনিক নাটকের প্রভাবে অনেক অপেরায় আজকাল কিছু কিছু মঞ্চসজ্জা এবং আলোকসম্পাতের কলাকৌশল দেখা যায় তবু প্রধানত চীনা নাট্যে মঞ্চসজ্জার কোনো বালাই নেই। কোনো ফ্রন্টকার্টেন থাকে না এবং সেট্স্ ও সিনের জটিলতাও নেই। একটি রঙীন ব্যাকড্রপই প্রধান অবলম্বন। এই ড্রপের বাঁপাশ দিয়ে প্রবেশপথ এবং ডানপাশ দিয়ে নিষ্ক্রমণ। মঞ্চে ঘর, কোঠা, অলিন্দ, দরজা, দরজা খোলা বন্ধ করা সমস্তই অভিনয়ের মুদ্রার মাধ্যমে করা হয়। স্টেজে থাকে ব্রকেড দিয়ে ঢাকা একটি সাধারণ টেবিল ও উঁচু-পিঠ চেয়ার। তাকে অনেক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। চেয়ার যেমন সংস্থাপন হয়, তেমনি কোনো অভিনেতা যদি চেয়ারের পিছনে আশ্রয় নেন তবে তাকে বুঝতে হবে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর। আবার কোনো অভিনেতা যদি লাফ দিয়ে টেবিলের উপর উঠে যান তবে তা হয় দুরতিক্রম্য পাহাড়। নিশীথের সূচিভেদ্য অন্ধকার, ঘন বনানী, নদী, সেতু—সেই সব দিয়ে নদী অতিক্রমণ সবই অভিনয়ের মাধ্যমে সাজেস্ট করা হয়। প্রতীকী অভিনয় ও মঞ্চসজ্জা—চীনানাট্যের বড়ো সম্পদ ও শক্তি।

সংগীত

চীনের অসংখ্য অপেরার মধ্যে যে পার্থক্য, তা প্রধানত সংগীতেই নির্দেশিত হয়। কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত চীনা অপেরার শুধু অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই নয়—অপেরার চরিত্র ও স্টাইলের প্রধান পরিচায়ক। ভালো অভিনেতা বা অভিনেত্রী মাত্রেই ভালো গায়ক বা গায়িকা। পিকিঙ অপেরা উৎকৃষ্টতায় শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য, যদিও তার সমজদার সীমাবদ্ধ। সঙ্গীতের বেলায় ও কণ্ঠের বিস্তারে ও তান এবং লয়ের জটিলতায় পিকিঙ অপেরার গান—আমাদের উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে তুলনীয়। তবে পিকিঙ অপেরায় পুরুষের Falsetto Soprano-তে মেয়েদের অনুকরণে গান বিদেশীর কাছে ভালো লাগে না। অবশ্য মেইলাং ফাঙ তার ব্যতিক্রম। কিন্তু মেয়েদের বেলায়—যেমন তু চিং কং-এর অনুপম কণ্ঠে উচ্চগ্রামে অবলীলা-খেলায় যে কোনো অনভ্যস্ত বিদেশীকে মুগ্ধ করে। কিন্তু দৃশ্যের পর দৃশ্যে নায়ক-নায়িকা একই রাগ অবলম্বনে গান গেয়ে যান, যা আমাদের কানে অনেক সময় একঘেয়েমী এনে দেয়। ভারতীয় সাংস্কৃতিক ডেলিগশনে পালুস্কর যখন চীনে যান—পিকিঙ অপেরা শুনে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—পিকিঙ অপেরায় তিনি শুধু ছুটি রাগেরই সন্ধান পেয়েছেন। অথচ তাঁর মতে বিভিন্ন ঘটনা ও বিভিন্ন রসের সৃষ্টিতে শুধু ছুটি রাগ যথেষ্ট হতে পারে না। তার উত্তরে মেইলাং ফাং নাকি বলেছিলেন যে অভিনয়ের সঙ্গে গায়কীর ও প্রকাশভঙ্গীতে একটি রাগই বিভিন্ন রস সৃষ্টি করতে সক্ষম। সে যা হোক ভারতীয় প্রাচীন নাট্যে অভিনয় যেমন সংগীত-নিরপেক্ষতা অর্জন করেছিল—চীনা অপেরা তা পারে নি।

অর্কেস্ট্রা

চীনা নাট্যের আরেকটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল অর্কেস্ট্রা। এই অর্কেস্ট্রায় বহু লৌকিক ও প্রাচীন যন্ত্রের ব্যবহার হয়। তার মধ্যে যেগুলি খুবই সাধারণ এবং প্রায় সকল অপেরাতেই দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি হল: তেপায়ায় দাঁড় করানো চামড়ায় মোড়া কাষ্ঠযন্ত্র 'পান্-কু', দুহাতে কাঠি দিয়ে বাজানো হয়। এই 'পান্-কু'ই চীনা অর্কেস্ট্রার "কন্ডাক্টর্"। অন্যান্যরা এই পান্-কুরই ইঙ্গিত অনুসরণ করে। এর পরেই আসে 'চা' নামীয় পিতলের বড়ো করতালি বা ঝাঝ এবং 'লুও' নামীয় কাঁসর। তার পরেই

আসে দু-তারের চীনা বেহালা 'আরহু' বা 'হুছিন'। চীনা অর্কেস্ট্রায় আর আধিপত্য অপরিসীম। এর সঙ্গে আসে বাঁশের 'তি' বাঁশি। এই বাঁশির প্রথম রিড মাকড়সার ডিমের খোলস দিয়ে মোড়ানো, সেজন্য একটি buzzing বা ঝিঁঝিঁ শব্দ হয়। দু-তারের যন্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিন-তারের চীনা ব্যাঞ্জো 'ছিন্-ছিন্' কিংবা সাপের চামড়ায় বাঁধানো উত্তরবঙ্গের দু-তারার মতো তিন-তারের 'সানশিয়েন' নামে সুরেলা যন্ত্রটি। স্টীলের প্লেটের উপর বহু তারের বাঁশের পাতলা কাঠি দিয়ে বাজানো 'ইয়াংছিং' আরেকটি বিখ্যাত যন্ত্র। কিন্তু সবচেয়ে সুশ্রাব্য চীনা যন্ত্রের অন্যতম হল চীনা ম্যাণ্ডোলিন 'পিপা'।

চীনা প্রাচীন নাট্যে অর্কেস্ট্রা ভারতীয় পদ্ধতিতে ব্যাকড্রপের সামনে দর্শককে সম্মুখ করে বসত। কিন্তু আজকাল ডান কিংবা বাঁ উইংসের আড়ালে এবং কোনো কোনো সময় ইউরোপীয় কায়দায় মঞ্চের নীচে অডিটোরিয়ামের সামনেও বসতে দেখা যায়।

চীনের অপেরার মিউজিক সম্বন্ধে প্রত্যেক বিদেশীকেই কঠোর মন্তব্য করতে শোনা যায়। বিশেষত নামকরা পিকিঙ অপেরা সম্পর্কে। সে মিউজিককে এফেক্ট মিউজিক কিংবা accompaniment বলা চলে না কিছুতেই সে নিজস্ব নিয়মে অনর্গল চলতে থাকে। মঞ্চের 'মুড'-এর ধার ধারে না সংলাপ ও গীতকে মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ চেপে দেয়। যদিও যুদ্ধবিগ্রহে বাদ্য এফেক্ট সৃষ্টি করে—কিন্তু অন্য সময় 'লুও' কাসরের ও 'ছা' করতালের শব্দ ও 'আরহু' বেহালার তারস্বর-চীৎকার বিদেশী দর্শকের কর্ণপীড়ার কারণ হয়ে ওঠে। শুধু বিদেশী নয়—অনেক চীনা সমালোচকেরও এই মত। লু... তাঁর 'আমার গ্রাম' গল্পে শাওসিং অপেরার বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে তীব্র ... করেছেন। কিন্তু চীনের সাধারণ শ্রোতা তাতে বেশ অভ্যস্ত—ঠিক যেমন আমাদের মহাষ্টমীর আরতি কোনো বাঙালীর কানকে পীড়া দেয় না। অবশ্য সব অপেরা সম্বন্ধে একথা বলা চলে না। ক্লাসিক্যাল 'খুইন্‌চি'-তে দেখলাম 'আরহু' কিংবা 'লুও' নেই, সেখানে প্রাধান্য বাঁশি এবং 'দিপা'... সে-কারণে খুইন্‌চির মিউজিক একটি সুললিত-শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। আরো অনেক স্থানীয় অপেরা যেমন সাংহাই-এর 'ইউয়ে চি' কিংবা নানকিং-এর 'উ-শি'-তে দেখেছি মিউজিক অত্যন্ত সংযত এবং নাট্যের ঘটনাধারার অনুসরণকারী।

...কাহিনী

চীনারা অপেরা দেখতে আসে যতটা, শুনতে আসে তার চেয়ে বেশি। রামায়ণ মহাভারতের মতো কোনো মহাকাব্য চীনে নেই। কিন্তু তার স্থান পূরণ করেছে চীনের কয়েকটি ক্লাসিক্যাল উপন্যাস। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাগ্রগণ্য হল মঙ্গোল রাজবংশের শেষে ও মিঙ রাজবংশের (১৩৬৮–১৬৪৪) গোড়ার দিকে লিখিত দুটি উপন্যাস। প্রথমটি হল 'সোয়হু' বা 'সরোবর তীরে' (ইংরেজীতে তরজমা হয়েছে Water Margin নামে; পার্ল বাক অনুবাদ করেছেন All Men are Brothers নাম দিয়ে); দ্বিতীয় উপন্যাসটি হল 'সান কুও' বা 'তিন রাজ্যের কাহিনী' (The Romance of Three Kingdoms)। সুঙ রাজবংশের (৯৬০-১২৭৯) আমল থেকে চলে-আসা লোকগাথা আহরণ ও সংযোজনা করেই এই এপিক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর সুঙ সম্রাটের বিরুদ্ধে কৃষকবিদ্রোহের একশত আটটি বীরচরিত্র নিয়ে 'সোয়েহু' বা 'Water Margin' রচিত। দ্বিতীয় উপন্যাস 'Romance of the Three Kingdoms'-এর পশ্চাৎপট হল—তৃতীয় শতাব্দীতে তিন রাজ্যে বিভক্ত চীনের বিভিন্ন রাজবংশ, গোষ্ঠী ও সামন্তশ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ ও সংগ্রাম। সমপর্যায়ের আরো কয়েকটি ক্লাসিক্যাল উপন্যাস আছে। যেমন মিঙ রাজবংশের শেষের দিকে লিখিত 'পশ্চিমযাত্রী' (The Pilgrimage to the West)। হিউ-এন-সাঙের দুঃসাহসিক ভারতযাত্রা পথে তাঁর প্রধান অনুচর ও রক্ষক হনুমান সন্-উ-খুং-এর অলৌকিক বীরত্বের কাহিনী নিয়ে এই উপন্যাস লিখিত। কিন্তু 'সোয়েহু' এবং 'সানকুও'—এই দুটি এপিকের পরই সবচেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হল 'হোং-লৌ-মং' বা 'লালকুঠির স্বপ্ন' (The Dream of the Red Chamber)। এই বৃহৎ উপন্যাসটি মাঞ্চু রাজবংশের আমলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত। প্রেমিক চিয়া-পাও-উ ও প্রেমিকা লিন্-টাই-উর জীবনের ট্র্যাজেডির মাধ্যমে তদানীন্তন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সম্ভ্রান্ত-শ্রেণীর অন্তঃসারশূন্যতাই এই উপন্যাসের অসংখ্য চরিত্র ও ঘটনার প্রবাহে বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের দেশে রামায়ণ মহাভারত ছাড়া যেমন আমাদের সংস্কৃতির কথা চিন্তাই করতে পারি না, তেমনি এই সব এপিক উপন্যাস ছাড়া চীনা সংস্কৃতির কথা ভাবাই যায় না। আমাদের রাম, রাবণ, মেঘনাদ, ভীম, অর্জুন, দুর্যোধনের মতো চীনে এই সব উপন্যাসের যেমন 'সোয়েহু'-র সুঙ-চিয়াং,

উ-ইয়ুং, উসুং কিংবা 'সানকুও'-র লিউ-পেই, কুয়ান-ইউ বা চুকে লিয়াং প্রভৃতি চরিত্র আবহমান কাল অগণিত জনসাধারণের চিন্তা ও কল্পনা জুড়ে আছে। চীনের অধিকাংশ অপেরা এই সব উপন্যাসের একটি পর্ব বা অনুচ্ছেদ নিয়ে রচিত। যেমন বিখ্যাত অপেরা 'মৎসজীবীর প্রতিশোধ' 'সোয়েহু'-রই একটি এপিসোড। কোনো বিশেষ চরিত্র মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই চীনা দর্শকের কাছে তিনি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমাদের কাছে সে-চরিত্র অপরিচিত। আমরা আশা রাখি মঞ্চে ঘটনার সংঘাতে তাকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে। কিন্তু অধিকাংশ অপেরায়ই মঞ্চে ঘটনা ততটা ঘটে না যতটা গীতাভিনয়ের কাব্যময় সংলাপে ঘটনা বিবৃত হয়। তাই আমাদের কাছে চীনানাট্যের মন্থরতা অনেক সময় বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।

এসব ক্লাসিক্যাল উপন্যাস ছাড়াও আছে চীনের আটশত বৎসরের অনন্য ক্লাসিক্যাল নাটকের অবিচ্ছিন্ন ও বিস্ময়কর ঐতিহ্য। ইউয়ান (মঙ্গোল) রাজবংশের চীনের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার কুয়ান হান ছিং থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর হুং-সেং, কু-সান রেন প্রমুখ প্রতিভাশালী নাট্যকারগণ যে নাটক লিখে গেছেন বিশ্বনাট্যের ভাণ্ডারে তা অমূল্য সম্পদ। এই সব নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি চীনের জাতীয় চরিত্রেরই প্রতিভূ। ইউয়ান যুগের পরবর্তী সকল নাটকই অত্যন্ত দীর্ঘ। চল্লিশ-পঞ্চাশ, এমনকি একশত অঙ্কের নাটকও আছে। সেইসব নাটকের একটি অঙ্ক বা একটি দৃশ্য মাত্র হয়েছে আজকের একটি তিনঘণ্টাস্থায়ী অপেরার বিষয়বস্তু।

নাট্যকার হুংস্বেং (১৬৪৫-১৭০৪)-এর পৃথিবীবিখ্যাত নাটক 'অনন্ত যৌবনের প্রাসাদ' হল টাঙ রাজবংশের সম্রাট সিংহুয়াং ও তার প্রেমিকা ইয়াং কুয়েই ফেই-কে নিয়ে লিখিত। কুয়েই ফেই মানে উপপত্নী। ইয়াংকুয়েই ফেই বা লেডি ইয়াং হলেন চীনের ক্লিওপেট্রা। চীনের কাব্যে, চিত্রে, নাট্যে 'নটী ইয়াং' অমর হয়ে আছেন। ইয়াং-এর ভূমিকায় প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ অভিনয় করে আসছেন চীনের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা মেই লাং ফাং। সেই নাটকের মাত্র একটি episode হল পানমত্তা সুন্দরী ইয়াং। তাকে নিয়ে একটি বিখ্যাত অপেরা। প্রমোদ উদ্যানে প্রতীক্ষারত সুন্দরী ইয়াং—এমন সময় খবর এল সম্রাট অন্য প্রণয়িনীর সঙ্গে বিহারে যান। আশাভঙ্গে আকুলা ইয়াং তখন দুঃখ ভুলবার জন্য পানপাত্রে ডুব দেন। এই হল নাটক। দুজন পার্শ্বচর ও ইয়াং এই তিনটি চরিত্র। প্রায়

দেড়ঘণ্টাকাল যাবৎ ষাট বৎসরের উর্ধ্ব বয়স্ক মেইলাং ফাঙ ষোড়শী ইয়াং-এর ভূমিকায় অপরূপ দক্ষতায় অভিনয় করে দর্শককে আচ্ছন্ন করে রাখেন। নাটকটি যখন দেখছিলাম আমার পাশে বসেছিলেন এক প্রৌঢ়া মহিলা। দেখলাম ইয়াং-এর স্বগত গীতি-সংলাপ তাঁর কণ্ঠস্থ। তিনি মেইলাং ফাঙ-এর সঙ্গে গুনগুন করে আবৃত্তি করছিলেন। আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম অভিনয়ের জটিল অভিব্যক্তি, কিন্তু মহিলাটি মনে হল কাব্যরসেই অধিক মত্তা। অথচ আমি এ-রসে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস।

ক্লাসিক্যাল নাট্যসাহিত্য ছাড়া আছে অগণিত লৌকিক নাট্যের সম্ভার। এসব নাটক আবহমানকাল যাবৎ প্রচলিত রূপকথা বা লোক-কাহিনী অবলম্বন করে রচিত।

তেমনি এক গল্প হল লিয়াং শাং পো ও চু-ইন-তাই। চীনের রোমিও ও জুলিয়েট। মেয়ের শিক্ষালয়ে যাওয়া সম্বন্ধে পিতার সামন্তযুগীয় সংস্কার থাকায় কিশোরী চু-ইন-তাই বালক বেশে বিদ্যালয়ে পড়তে যান। সেখানে সহপাঠী কিশোর বালক লিয়ান সাংপোর সঙ্গে দেখা। লিয়ানকে চু ভালোবাসতে শুরু করে কিন্তু লিয়ান বুঝতে পারে নি যে চু একটি ছদ্মবেশী মেয়ে। বিদ্যালয়ে পাঠ সমাপ্ত করে চু ঘরে ফিরে যাবার পর লিয়ান জানতে পারে যে তার সহপাঠী বন্ধু চু হচ্ছে ছদ্মবেশী মেয়ে। তখন লিয়ান উতলা হয়ে চু-ইন-তাইয়ের বাড়ি গিয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করেন। কিন্তু চু-র অর্থগৃধ্নু পিতা মেয়ের বিয়ে স্থির করেন এক অত্যাচারী ধনীর ছেলের সঙ্গে। লিয়ানের জীবন বিপন্ন দেখে লিয়ানকে বাঁচাবার জন্য চু স্বদেশ ত্যাগ করার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কিছুদিন পর বিচ্ছেদে ও মনোভঙ্গে লিয়ান-এর মৃত্যু হয়। এদিকে ঢাকঢোল বাজিয়ে সিল্কলণ্ঠনে সজ্জিত মিছিলে চু-ইন-তাইকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বিবাহের উদ্দেশে। মিছিল লিয়ানের কবরের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিল—ভীষণ শিলাবৃষ্টি ও ঝড় নেমে এল। হঠাৎ তখন বজ্রপাতে লিয়ানের কবর দ্বিখণ্ডিত হয় এবং চু-ইন-তাই পালকি থেকে নেমে সেই কবরে গিয়ে প্রবেশ করে। তারপর সূর্যরশ্মি যখন আবার নীল আকাশকে রাঙিয়ে দিল—সেই কবর থেকে পাখা মেলে বেরিয়ে এল—দুটি অপরূপ প্রজাপতি!

এমনি আছে 'শুভ্র সর্পকুমারী', 'যাদু-পদ্মলণ্ঠন'—কত মনোজ্ঞ রূপকথা। চীনের আঞ্চলিক লৌকিক অপেরা এইসব রূপকথায় ভরপুর। কোনো

কোনো লৌকিক অপেরায় কোনো নাটকীয় কাহিনী একেবারেই থাকে না। মনে হয় যেন নক্সা। যেমন 'রাখাল ছেলে ও গাঁয়ের মেয়ে'—একটি গাঁয়ের মেয়ে ও রাখাল ছেলেতে দেখা হয়। মেয়েটি পথের সন্ধান জিজ্ঞেস করে—ছেলেটির মেয়েটিকে ভালো লাগে। সে নানা কথার ছলে মেয়েটিকে আটকিয়ে রাখবার ফন্দি আঁটে। এই হল গল্প, কিন্তু তা নিয়ে হয়তো চলবে দেড়ঘণ্টার অপেরা।

চীনা নাট্যের জীবনদর্শন

চীনা অপেরার মূল প্রাণ হল—জীবনবাদ ও বাস্তববাদ। কোনো আধ্যাত্মিক বা অলৌকিক শক্তির খেলা তাতে নেই। চীনের নাটকে স্বর্গীয় পরীরা কোনো কোনো সময় নেমে আসে বটে কিন্তু কোনো দেব-দেবীর আধিপত্য একেবারেই দেখা যায় না। রাষ্ট্রের বা সমাজের অত্যাচার, অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রতিবাদ এবং সংগ্রাম—নাটকের উপজীব্য বিষয়। নিয়তি বা Nemesis-এর অমোঘ শক্তির হাতে পুতুল হিসাবে কোথায়ও মানুষকে দেখানো হয় না। তাই বলছিলাম Symbolic ও Stylised রূপরীতি নিয়েও চীনানাট্যের মূল সুর বলিষ্ঠ বাস্তববাদ ও জীবনবাদ।

চীনের উপর বুদ্ধধর্মের প্রভাব, ভারতের চেয়েও বেশি বলে আমরা জানতাম। কিন্তু চীনের প্রাচীন নাটকে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা শ্রমণীকে অধিকাংশ সময়েই সংসার-বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হিসেবে দেখা যায়। এরকম কয়েকটি নাটক আমি দেখেছি। একটি অতি জনপ্রিয়—মিঙ রাজবংশের আমলের নাটিকা হল 'পলাতকা শ্রমণী'। পাহাড়ের উপর নিঃসঙ্গ বৌদ্ধমঠের একজন শ্রমণী একদিন পর্বতের সানুদেশে একদল তরুণ-তরুণীকে আনন্দে ক্রীড়ারত দেখে নিজের অর্থহীন বন্দীজীবনকে ধিক্কার দিয়ে মুক্তজীবনে বের হয়ে আসে প্রাচীরের গায়ে অর্হত মূর্তিগুলিকে ব্যঙ্গ করে।

এই রিয়ালিজমই চীনা নাট্যের সুদীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো কথা।

সাম্যবাদ ও সমাজ

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশের প্রধান মন্ত্রী, আর সবদিক থেকে প্রধান ব্যক্তি, শ্রীযুক্ত জওয়াহরলাল নেহরু সম্প্রতি আবার কমিউনিস্টদের নিন্দায় কোমর বেঁধে লেগেছেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার অবশ্য কিছু নেই, কমিউনিজম্ সম্পর্কে জওয়াহরলালজীর বিরাগ সুবিদিত। তাছাড়া সব দেশেরই কর্তৃপক্ষীয়েরা তো আজ একশো বৎসরেরও বেশি ক্রমাগত শুধু কমিউনিজমের কুৎসা নয়, তার মুণ্ডপাতের জন্য সর্ববিধ প্রয়াসে প্রবৃত্ত থেকেছেন। এদেশে যে তার ব্যতিক্রম ঘটবে, এমন কোনো কারণ দেখা যায় নি।

বাস্তবিকই কমিউনিজমের কলঙ্ক রটনা এমন প্রচণ্ডভাবে চলেছে যে মুখের অভিশাপ কাজে ফললে বহুদিন আগেই কমিউনিজম্ একেবারে ভস্মীভূত হয়ে যেত বলা চলে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ যাঁদের বলেছিলেন "সম্রাটবংশীয় পাদরী", তাঁদের আক্রোশের তো সীমাপরিসীমা ছিল না, এখনও নেই। একদিকে ক্যাথলিকদের ধর্মগুরু 'পোপ' আর অন্যদিকে দুনিয়ার যত ধনপতি একত্রিত হয়ে কমিউনিজমের বিনাশ ঘটাতে চেষ্টার কোনো ত্রুটি কখনও করে নি। "মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী!"—এ-কথা গত একশো বৎসরের মধ্যে কমিউনিজমের শত্রুদের বারবার ভাবতে হয়েছে। আর আজ অর্ধজগৎ জুড়ে কমিউনিজমের বিজয়বৈজয়ন্তী উড়ছে। মহাশূন্যে অভিযানের যে আয়োজনে কমিউনিস্ট সমাজ অগ্রণী, তারই মধ্য দিয়ে মানুষের জয়যাত্রা আজ সূচিত হচ্ছে। অবিরাম অপবাদ আর বৈরিতার আঘাতেও সেই অগ্রগতিকে রোধ করা সম্ভব হয় নি।

কমিউনিজম্ সম্বন্ধে ঘৃণা ও আতঙ্কের ভাব যে কেমন করে মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তার বেশ পরিচয় পেয়েছিলাম বছর তিনেক আগে হাসপাতালে আটক থাকার সময়। অস্ত্রোপচারের পর অসহায় অবস্থায় পড়ে আছি, ফিরিঙ্গী নার্স দেখাশুনা করছে। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের তখন

দিনদশেক বাকি। কথায় কথায় জানা গেল নার্সটি থাকে শিয়ালদা স্টেশনের কাছে, আমি নিজে যে কেন্দ্র থেকে লোকসভার নির্বাচনপ্রার্থী সেখানকার ভোটার। আমাকে কোনোকালে জানত না, আমার কংগ্রেসী প্রতিদ্বন্দ্বীকেও কখনও দেখে নি, শুধু গোঁড়া ক্যাথলিক হিসাবে পাদরীসাহেবের হুকুম তাকে মানতেই হবে, কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেসপ্রার্থীকে তার ভোট দিতেই হবে। এতে সে খুশি নয়, যে রোগীর সেবা করছে তার বিরুদ্ধে ভোট দিতে মন সরছে না, কিন্তু আমি যে কমিউনিস্ট ! কেমন করে যে আমি কমিউনিস্ট হতে পারলাম, সে ভেবে উঠতে পারল না—কমিউনিস্ট বলতে সে বোঝে নরপিশাচ-জাতীয় জীব, যা আমাকে ঠাওরাতে তার সংকোচ ঘটছিল। হঠাৎ একদিন কি ভেবে গির্জার কতকগুলো কাগজ আমাকে দিল—তাতে দৈববলে যীশু-জননী মেরীর গর্ভাধান প্রভৃতি ক্যাথলিক ধর্মের অকাট্য সত্যে বিশ্বাস না থাকলে নরকবাস অনিবার্য, ইত্যাদি বহু সুসমাচার দেখলাম। পাপীর উদ্ধার সম্বন্ধে কিছু আশা হয়তো ছিল, কিন্তু সে যাই হোক, কমিউনিস্ট বলে আমি ঘোর পাপী সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ তার ছিল না।

কমিউনিস্ট হলে যদি কারও কাছে পাপী বলে গণ্য হতে হয় তো সেই পাপ সম্বন্ধে আমাদের অনুশোচনা নেই, প্রায়শ্চিত্তের কোনো প্রবৃত্তি নেই। বহু জনের যে লাঞ্ছনা যুগ যুগ ধরে ইতিহাসকে কলুষিত করে রেখেছে, তাকে নির্মূল করার প্রযত্নে প্রবৃত্ত হতে গেলে যদি পুণ্যলাভ না ঘটে তো দুঃখ নেই।

ফীল্ডিং-এর সুবিখ্যাত "টম্ জোন্স্" উপন্যাসে ডক্টর থোয়াকম্ নামে এক পাদরীর চরিত্র আছে। পাদরীসাহেবের একটি কথা হয়তো অনেকেরই মনে পড়বে। তিনি বলেছিলেন : "আমি যখন 'ধর্ম' বাক্যটি উচ্চারণ করি, তখন তার অর্থ শুধু হল খ্রীষ্টধর্ম, আর কেবল খ্রীষ্টধর্ম কেন, 'প্রোটেস্টান্ট' ধর্ম ; তাই বা শুধু কেন, তখন আমি বলি 'চার্চ অফ ইংলণ্ড'-এর কথা।"

যদি এই পাদরীসাহেবের কথা স্মরণ করিয়ে আমাদের নিয়ে কেউ ব্যঙ্গ করতে চান, তাতে একটুও বিচলিত না হয়ে বলতে পারি যে আমরা নিজেদের শুধু সোশালিস্ট বলি না, আমরা হলাম কমিউনিস্ট ; আর শুধু কমিউনিস্ট বললে হল না, আমরা মার্কস্-লেনিনবাদের অনুরাগী ; আর কেবল তাই নয়, আমরা ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। একথা বলতে কোনো সংকোচ অনুভব করছি না, অস্বস্তি বোধ হচ্ছে না, যদিও জানি যে কমিউনিস্ট বলে কটুকাটব্য না শুনেও উপায় নেই।

জওয়াহরলাল নেহরুর মতো ব্যক্তি নিজেকে প্রগতিশীল মনে করতে ভালোবাসেন। তাই ধর্মে অবিশ্বাসী বলে কমিউনিস্টদের কুৎসা করতে তাঁর কিছুটা বাধে। অন্যভাবে অপবাদের চেষ্টা তাই তাঁকে করতে হয় এবং তাঁর প্রধান বক্তব্য হল যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে দেশের কোনো সংযোগ নেই, বাইরে থেকে ধার করে আনা চিন্তা নিয়ে তাদের কারবার, দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে তারা অবহিত নয়। শ্রেণীচিন্তার কবলে পড়ে সামগ্রিকভাবে সমাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ, সুস্থ ধারণা গঠনে তারা অসমর্থ, প্রকৃত দেশপ্রেম তাদের নেই।

কমিউনিস্টরা তাদের নিজের দেশকে ভালোবাসে কি না বাসে, এ-প্রশ্নের জবাব দেবে তাদের দেশবাসী। 'আমরা দেশভক্ত, আমরা দেশভক্ত' বলে চেঁচিয়ে বেড়ানো শুধু যে সুরুচিবিগর্হিত তা নয়, অপমানকরও বটে ; নিজের দেশকে ভালোবাসি বলে জবানদিহি দিতে গেলে একটু যেন নীচতা স্বীকার করতে হয়। যে জিনিস স্বতঃসিদ্ধ তা নিয়ে বাগাড়ম্বর শুধু অসার নয়, একটু অসৎ মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। অনুভূতি যেখানে গভীর, সেখানে বাক্‌স্ফোট হয় একান্ত সংযত। মাঝে মাঝে এমন সময় আসে যখন স্বদেশের প্রতি মমতা যেন হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীকে মোচড় দিয়ে ওঠে। কিন্তু অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য স্বদেশভক্তির বিজ্ঞাপন দেওয়াকে ক্ষুদ্রতারই পরিচায়ক বলা নিশ্চয়ই সঙ্গত।

মানুষ যেভাবে গড়ে উঠেছে, তাতে দেশের মাটির মায়া তার এক স্বভাবজ অনুভূতি। সপ্তদশ শতাব্দীর এক ইংরাজ লেখক বলেছিলেন : "ইংলণ্ডের প্রতি ঘাসের ডগাটিকে আমি ভালোবাসি।" এমন কথার প্রতিধ্বনি নিজের দেশ সম্বন্ধে আমাদেরও মনে ওঠে। সুপ্রাচীন আমাদের এই দেশ তার সন্তানদের কাছে যতটা ভালোবাসা পাওয়া উচিত ছিল, তা হয়তো পায় নি ; এর জন্য দায়ী আমাদের সমাজ-জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি যা মায়াবাদের অনুকূল হয়েছে, সংসার-প্রপঞ্চের চিন্তায় আমাদের মনকে বৈরাগ্যের পথে উন্মুখ করে রেখেছে। কিন্তু, আবার আমাদেরই দেশে রামায়ণের মহাকবির মুখ থেকে শুনেছি : "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" দেশভক্তি আমাদের বিদেশ থেকে ধার করে আনতে হয় নি। সাম্যবাদেরও তেমনই উদ্ভব হয়েছে সর্বদেশে, সেখানকার প্রকৃত পরিবেশের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ; দেশভক্তিরই মতো কমিউনিজম্‌কে আমাদের বাইরে থেকে যোগাড় করে আনতে হয় নি।

দিনদশেক বাকি। কথায় কথায় জানা গেল নার্সটি থাকে শিয়ালদা স্টেশনের কাছে, আমি নিজে যে কেন্দ্র থেকে লোকসভার নির্বাচনপ্রার্থী সেখানকার ভোটার। আমাকে কোনোকালে জানত না, আমার কংগ্রেসী প্রতিদ্বন্দ্বীকেও কখনও দেখে নি, শুধু গোঁড়া ক্যাথলিক হিসাবে পাদরীসাহেবের হুকুম তাকে মানতেই হবে, কমিউনিস্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেসপ্রার্থীকে তার ভোট দিতেই হবে। এতে সে খুশি নয়, যে রোগীর সেবা করছে তার বিরুদ্ধে ভোট দিতে মন সরছে না, কিন্তু আমি যে কমিউনিস্ট! কেমন করে যে আমি কমিউনিস্ট হতে পারলাম, সে ভেবে উঠতে পারল না—কমিউনিস্ট বলতে সে বোঝে নরপিশাচ-জাতীয় জীব, যা আমাকে ঠাওরাতে তার সংকোচ ঘটছিল। হঠাৎ একদিন কি ভেবে গির্জার কতকগুলো কাগজ আমাকে দিল—তাতে দৈববলে যীশু-জননী মেরীর গর্ভাধান প্রভৃতি ক্যাথলিক ধর্মের অকাট্য সত্যে বিশ্বাস না থাকলে নরকবাস অনিবার্য, ইত্যাদি বহু সুসমাচার দেখলাম। পাপীর উদ্ধার সম্বন্ধে কিছু আশা হয়তো ছিল, কিন্তু সে যাই হোক, কমিউনিস্ট বলে আমি ঘোর পাপী সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ তার ছিল না।

কমিউনিস্ট হলে যদি কারও কাছে পাপী বলে গণ্য হতে হয় তো সে পাপ সম্বন্ধে আমাদের অনুশোচনা নেই, প্রায়শ্চিত্তের কোনো প্রবৃত্তি নেই। বহু জনের যে লাঞ্ছনা যুগ যুগ ধরে ইতিহাসকে কলুষিত করে রেখেছে, তাকে নির্মূল করার প্রযত্নে প্রবৃত্ত হতে গেলে যদি পুণ্যলাভ না ঘটে তো দুঃখ নেই।

ফীল্ডিং-এর সুবিখ্যাত "টম্ জোন্স্" উপন্যাসে ডক্টর থোয়াকম্ নামে এক পাদরীর চরিত্র আছে। পাদরীসাহেবের একটি কথা হয়তো অনেকেরই মনে পড়বে। তিনি বলেছিলেন: "আমি যখন 'ধর্ম' বাক্যটি উচ্চারণ করি তখন তার অর্থ শুধু হল খ্রীষ্টধর্ম, আর কেবল খ্রীষ্টধর্ম কেন, 'প্রোটেস্টান্ট' ধর্ম; তাই বা শুধু কেন, তখন আমি বলি 'চার্চ অফ ইংলণ্ড'-এর কথা।"

যদি এই পাদরীসাহেবের কথা স্মরণ করিয়ে আমাদের নিয়ে কেউ রহস্য করতে চান, তাতে একটুও বিচলিত না হয়ে বলতে পারি যে আমরা নিজেদের শুধু সোশালিস্ট বলি না, আমরা হলাম কমিউনিস্ট; আর শুধু কমিউনিস্ট বললে হল না, আমরা মার্কস্-লেনিনবাদের অনুরাগী; আর কেবল তাই নয়, আমরা ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। একথা বলতে কোনো সংকোচ অনুভব করছি না, অস্বস্তি বোধ হচ্ছে না, যদিও জানি যে কমিউনিস্ট বলে কটুকাটব্য না শুনেও উপায় নেই।

জওয়াহরলাল নেহরুর মতো ব্যক্তি নিজেকে প্রগতিশীল মনে করতে ভালোবাসেন। তাই ধর্মে অবিশ্বাসী বলে কমিউনিস্টদের কুৎসা করতে তাঁর কিছুটা বাধে। অন্যভাবে অপবাদের চেষ্টা তাই তাঁকে করতে হয় এবং তাঁর প্রধান বক্তব্য হল যে কমিউনিস্টদের সঙ্গে দেশের কোনো সংযোগ নেই, বাইরে থেকে ধার করে আনা চিন্তা নিয়ে তাদের কারবার, দেশের স্বার্থ সম্বন্ধে তারা অবহিত নয়। শ্রেণীচিন্তার কবলে পড়ে সামগ্রিকভাবে সমাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ, সুস্থ ধারণা গঠনে তারা অসমর্থ, প্রকৃত দেশপ্রেম তাদের নেই।

কমিউনিস্টরা তাদের নিজের দেশকে ভালোবাসে কি না বাসে, এ-প্রশ্নের জবাব দেবে তাদের দেশবাসী। 'আমরা দেশভক্ত, আমরা দেশভক্ত' বলে চেঁচিয়ে বেড়ানো শুধু যে সুরুচিবিগর্হিত তা নয়, অপমানকরও বটে; নিজের দেশকে ভালোবাসি বলে জবানদিহি দিতে গেলে একটু যেন নীচতা স্বীকার করতে হয়। যে জিনিস স্বতঃসিদ্ধ তা নিয়ে বাগাড়ম্বর শুধু অসার নয়, একটু অসৎ মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। অনুভূতি যেখানে গভীর, সেখানে বাক্স্ফোট হয় একান্ত সংযত। মাঝে মাঝে এমন সময় আসে যখন স্বদেশের প্রতি মমতা যেন হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীকে মোচড় দিয়ে ওঠে। কিন্তু অভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য স্বদেশভক্তির বিজ্ঞাপন দেওয়াকে ক্ষুদ্রতারই পরিচায়ক বলা নিশ্চয়ই সঙ্গত।

মানুষ যেভাবে গড়ে উঠেছে, তাতে দেশের মাটির মায়া তার এক স্বভাবজ অনুভূতি। সপ্তদশ শতাব্দীর এক ইংরাজ লেখক বলেছিলেন: "ইংলণ্ডের প্রতি ঘাসের ডগাটিকে আমি ভালোবাসি।" এমন কথার প্রতিধ্বনি নিজের দেশ সম্বন্ধে আমাদেরও মনে ওঠে। সুপ্রাচীন আমাদের এই দেশ তার সন্তানদের কাছে যতটা ভালোবাসা পাওয়া উচিত ছিল, তা হয়তো পায় নি; এর জন্য দায়ী আমাদের সমাজ-জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি যা মায়াবাদের অনুকূল হয়েছে, সংসার-প্রপঞ্চের চিন্তায় আমাদের মনকে বৈরাগ্যের পথে উন্মুখ করে রেখেছে। কিন্তু, আবার আমাদেরই দেশে রামায়ণের মহাকবির মুখ থেকে শুনেছি: "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" দেশভক্তি আমাদের বিদেশ থেকে ধার করে আনতে হয় নি। সাম্যবাদেরও তেমনই উদ্ভব হয়েছে সর্বদেশে, সেখানকার প্রকৃত পরিবেশের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ; দেশভক্তিরই মতো কমিউনিজম্‌কে আমাদের বাইরে থেকে যোগাড় করে আনতে হয় নি।

সঙ্গে সঙ্গে বলা দরকার যে নিজের দেশকে এক অশরীরী মায়ামূর্তি কল্পনা করে অভিভূতির সন্ধানকে আমরা দেশভক্তি বলে মানতে পারি না। চিন্ময়ী মাতারূপে স্বদেশের আবাহন অশ্রদ্ধেয় অবশ্য নয়; কিন্তু যখনই তা দেশবাসী রক্তমাংসের মানুষের সুখ-দুঃখ, সাধ-আহ্লাদ, সুযোগ-অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এনে দেয়, তখন তা নিশ্চয়ই নিন্দনীয়। ভারত-মাতার সন্তান-সন্ততির দুর্গতি দূর হল না, অথচ সমারোহে মাতৃপূজার অভিনয়-অনুষ্ঠান চলল, এ ক্রমেই অসহনীয় মনে হওয়া অনিবার্য। দেশবাসীর সেবা এবং সমাজে সুখী ও স্বাধীন জীবন যাপনের অধিকারে সকলকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রযত্নে লিপ্ত হয়ে থাকাই যে প্রকৃত দেশভক্তি, এবং কাজে আর কথায় মুক্তকণ্ঠে ও একাগ্রভাবে প্রকাশ করে বলে যে কমিউনিস্টদের প্রবল অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়, সাধারণ মানুষ তা ক্রমেই স্পষ্টভাবে বুঝছে বলেই এখনও নেহরুর মতো সজ্জনকেও অপপ্রচারে অবতীর্ণ হতে হচ্ছে।

আক্রমণ এবং অপবাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু কমিউনিস্টদের মনে অন্তত এই মোহ নেই যে তারা সর্বদা হল শুদ্ধ এবং অপাপবিদ্ধ। যে সমাজে আমরা বাস করি, যে দেশে পরম্পরা আমাদের অস্থিমজ্জায়, সেখানকার বাস্তব পরিস্থিতির প্রভাব এড়ানো কারও পক্ষে সম্ভব নয়; আমাদের স্বদেশবাসীরা যেমন দোষেগুণে গড়া, আমরা তার ব্যতিক্রম হতে পারি না। চিন্তায় ও কর্মে সার্থকতা অর্জনের সচেতন প্রচেষ্টা মার্কস্‌বাদীর কর্তব্য; সমাজের চরিত্র ও বিকাশ সম্বন্ধে মার্কস্‌বাদের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে মনশ্চক্ষু উন্মীলিত না করতে পারলে সত্য বস্তু অজ্ঞাত থেকে যায়। কিন্তু যে নিষ্ঠা ও অবিরাম প্রয়াস বিনা প্রকৃত মার্কস্‌বাদী হওয়া সম্ভব নয়, তা আমাদের অনেকেরই সাধ্যাতীত। নানাবিধ কারণে আমাদের মধ্যে দুর্বলতা ও দোষ যদি দেখা যায় তো একেবারে বিস্মিত হওয়া চলে না। কিন্তু শুধু দোষের কথা ভাবলে ভুল হবে। নিজেদের দোষ, অভিজ্ঞতা এবং কাজের মধ্য দিয়েই আমরা সংশোধন করে নেব, যে জনতার মধ্যে আমাদের সতত বিচরণ ও ব্যস্ততা, তারই মধ্যে আমাদের রক্ষাকবচ।

কমিউনিজমের বিরুদ্ধে মস্ত বড় এক অভিযোগ হল এই যে কমিউনিস্ট সমাজে ব্যক্তিসত্তার সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, তার মূল্য স্বীকৃত নয়। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে এই কথা বলে থাকে ধনতন্ত্রের বহুরূপী সমর্থক ও বহুরূপী

ধনতন্ত্র মনুষ্যজাতির বহুলাংশকেই জীবনে সামান্য স্বস্তি থেকেও বঞ্চিত করেছে, সংস্কৃতির সকল যথার্থ সুযোগ কেড়ে রেখেছে। অধিকাংশ মানুষ হল মেহনতী, মেহনতের বিনিময়ে কোনোক্রমে গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় নিয়েই তাকে যুগ যুগ ধরে দুশ্চিন্তাজর্জর অবস্থায় থাকতে হয়েছে। বিশেষত বুর্জোয়া ব্যবস্থায় মানুষের যে লাঞ্ছনা ঘটে থাকে তার এক চমৎকার বর্ণনা আছে কার্ল মার্কসের "পুঁজি ও মজুরি" রচনায়:

"মজুর কাজ করে শুধু বেঁচে থাকার জন্য। যখন সে মেহনত করে, তখন তার মনে হয় না সে বেঁচে রয়েছে, বরঞ্চ মনে হয় জীবনের খানিকটা অংশ তাকে বিসর্জন দিতে হচ্ছে। তার মেহনত যেন এমন এক জিনিস যা সে অপর একজনকে নীলামে বিক্রয় করে দিয়েছে। তাই তার খাটুনির লক্ষ্য সেই খাটুনির ফলে যা উৎপন্ন হচ্ছে তা নয়। যে রেশম সে বুন্‌ছে, খনিগর্ভে ঢুকে যে সোনার তাল সে তুলে আনছে, যে অট্টালিকা সে নির্মাণ করছে, তা সে উৎপাদন করছে বটে, কিন্তু নিজের জন্য নয়। নিজের জন্য উৎপাদন করছে তার মজুরি; আর তার কাছে রেশম, সোনা আর অট্টালিকা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে বাঁচার পক্ষে একান্ত আবশ্যক কতকগুলি জিনিসে, হয়তো একটা সুতীর জামায়, তামার কয়েকটা পয়সায় আর এঁদোপড়া একটা বাসায়। তার জীবন আরম্ভ হয় যখন তার মেহনত শেষ হয়েছে—খাবার টেবিলে বা শুঁড়িখানায় বা বিছানায়। গুটিপোকা যখন রেশম কাটতে থাকে তখন তার উদ্দেশ্য যদি হত শুধু গুটিপোকা হিসাবেই নিজের আয়ু বাড়িয়ে যাওয়া তাহলে আমরা মজুরের চমৎকার দৃষ্টান্ত ঐ গুটিপোকাতে দেখতে পেতাম।"

ধনতন্ত্রের চরম বিকাশ হয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। সেদেশে ভালো লোক নিশ্চয়ই অনেক আছেন; সেখানকার অধিবাসীদের নিশ্চয়ই নানা গুণ আছে। কিন্তু সংস্কৃতির দিক থেকে বিচার করলে সেখানকার নিঃস্বতা লক্ষ্য করার মতো বস্তু। আবার বলি শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি ব্যাপারে সেখানে কোনো কাজ হয় নি বা হচ্ছে না বলা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু মোটের উপর দেখতে গেলে সেখানে স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন অন্য কোনো সামাজিক উদ্দেশ্যের অভাবে মানুষের জীবনযাত্রার মান অত্যুচ্চ হয়েও যেন খর্ব। সমৃদ্ধ অস্ট্রেলিয়াতে দেখেছি দেশের প্রতি চারজনের গড়ে একখানা মোটর গাড়ি আছে, কিন্তু কোথায় যেন প্রচণ্ড ফাঁকি থেকে গেছে জীবনে—তাই দিনের পর দিন খবরের কাগজে সবচেয়ে বেশি জায়গা নিয়ে প্রকাশ হয় খুন আর

জুয়াচুরি আর অতি তুচ্ছ অথচ চমকপ্রদ ঘটনার কথা। অস্ট্রেলিয়াতে সেখানকার পার্লামেন্টের এক সদস্যের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমরা চমৎকৃত স্থির করলাম যে "nothing fails like succes"—অস্ট্রেলিয়া অর্থনীতি ব্যাপারে এমনই সাফল্য লাভ করেছে যে তার জীবন ব্যর্থ হয়ে পড়েছে। যাই হোক, ১৯৫২ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে Senator Kefanver-এর নেতৃত্বে এক কমিশন অনুসন্ধান করে জানায় যে সেদেশে জুয়ার আড্ডা, বেশ্যালয়, মাদকদ্রব্য চোরাই করে আনার ব্যবসা আর সশস্ত্র ডাকাতি থেকে বাৎসরিক আয় হল ১৭০০ কোটি ডলার (প্রায় ৮৫০০ কোটি টাকা) যা ছিল রাষ্ট্রের সমগ্র রাজস্বের একচতুর্থাংশ! এই খবরটি সম্বন্ধে ফরাসী কমিউনিস্ট নেতা গারোদি মন্তব্য করেছেন: "এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু তো নেই। জুয়ার গোপন আড্ডা আর প্রকাশ্য জুয়ার স্টক্ এক্সচেঞ্জের মধ্যে মূলগত কোনো পার্থক্য আছে কি?"

অস্ট্রেলিয়া বা আমেরিকার কথা বলে শুধু তাদের প্রতি কটাক্ষ করার উদ্দেশ্য নিয়ে এটা লেখা হচ্ছে না। বহুদিন আগে ইংরাজ অধ্যাপক টনি "লোভসর্বস্ব সমাজের ব্যাধি" সম্বন্ধে সবাইকে সাবধান করেছিলেন। এই ব্যাধি ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানী, ইতালীর মতো সভ্যতায় অগ্রসর দেশগুলিকেও আক্রমণ করতে ছাড়ে নি। আধুনিক ইতিহাসে মুখ্য ব্যক্তি হল বণিক, তার আবির্ভাবের কাহিনী যে কত কলঙ্কিত তা ভুললে চলবে না। আর তার তিরোভাব আজ যখন আসন্ন, তখনও যেন সে মরণ কামড় দেওয়ার জন্য উদ্যত, যুদ্ধের বিভীষিকা তাই সমগ্র মানবজাতিকে আজও আতঙ্কিত করে রেখেছে। কার্ল্ মার্কস্ বলেছিলেন: "ওজিয়ে-র মতে টাকা যখন পৃথিবীতে আসে, তখন তার গণ্ডে ছিল রক্তাক্ত জন্মচিহ্ন। কিন্তু মূলধনের যখন আবির্ভাব হল, তখন তার প্রতি রোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরতে থাকে।"

মনে হতে পারে যে এ হল পুরনো কথা, আজকের দুনিয়ায় অচল, কারণ পশ্চাৎপদ দেশগুলোকে সাহায্য করার জন্য আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের আগ্রহের নাকি অন্ত নেই। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি তা আমরা আমাদের দেশের দারিদ্র্য থেকে জানতে পারি। আর দেখি ইউনাইটেড নেশন্‌স্‌-এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের এক সাম্প্রতিক রিপোর্টে যে ১৯৩৯ সালে সারা দুনিয়াতে দশজনের মধ্যে পাঁচজন পরিপূর্ণভাবে ক্ষুধার নিবৃত্তি করতে পারত না কিন্তু পনেরো বৎসর পরে, উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেলেও

দশজনের মধ্যে ছয়জনের অবস্থা এমন যে অর্ধভোজনের বেশি আর কিছু তারা আশা করতে পারে না।

আফ্রিকাতে আর বেশি দিন কালা আদমীকে স্বাধীনতা না দিয়ে যে চলবে না, তার লক্ষণ খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আজ সেখানে নতুন যে সব দেশ স্বাধীন হচ্ছে, তাদের অনেকের নামই ছিল অজানা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সাম্রাজ্যবাদের মহানুভবতা এর কারণ নয়; দমন-নীতির দণ্ড নিয়ে সেখানে টিকে থাকা আর সম্ভব থাকছে না বলেই তাদের পিছুহটা। আবার কঙ্গোর মতো যেখানে বর্তমানে গোলমাল চলছে, যেখানে সাদা চামড়া দেখলেই মানুষের মন জলে উঠছে, সেখানকার সম্বন্ধে মুরুব্বি চালে সাম্রাজ্যবাদীরা বলতে আরম্ভ করেছে যে কঙ্গোর লোক উপযুক্ত হওয়ার আগেই স্বাধীনতা পেয়েছে। আর সেজন্য তাদের ভুগতে হবেই। এ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা এখানে দরকার নেই, কিন্তু শুধু মনে রাখা দরকার যে পাশ্চাত্যের স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকে পশ্চাৎপদ দেশের জনসাধারণ সম্বন্ধে নাকতোলা ভাব খুবই সহজ বটে, কিন্তু তার কোনো দাম নেই। পশ্চাৎপদ দেশের অবস্থা এবং অগ্রসর দেশের মনোভাব যে কি রকম জটিলতার সৃষ্টি করে, তার একটু আন্দাজ পাওয়া যাবে তুর্কী লেখক Arslan Humbaraci-র লেখা "Middle East Indictment" (1958) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত একটি তথ্য থেকে। ১৯১৬ সাল পর্যন্ত ইরানের রাজধানী তেহরান শহরে পানীয় জল পরিশ্রুত হয়ে পাইপ দিয়ে যেত শুধু শাহ-এর প্রাসাদে; শহরের বাকি সকলকে জল নিতে হত রাস্তার পাশে খোলা নর্দমা থেকে আর ব্রিটিশ রাজদূতাবাসে যে পরিষ্কার টাটকা জলের ট্যাঙ্ক ছিল, সেই জল কিছু পরিমাণে বিক্রি হত!

গরিব যেখানেই মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, সেখানেই কমিউনিজমের ভূত দেখছে আধুনিক ধনতান্ত্রিক দেশগুলির কর্তৃপক্ষীয়েরা। কিউবা হোক বা কঙ্গো হোক, তাদের ভয় যে কমিউনিজমের রাস্তায় এই সব দেশ যেতে বাধ্য হবে। আজ বা কাল না হলেও পরশু যাবে। তাই আতঙ্কের তাদের অন্ত নেই; আর ঠিক সেইজন্য যুদ্ধের আশঙ্কাও কাটছে না, আণবিক যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক ও প্রচণ্ড বীভৎসতার কথা জেনেও শান্তির নামে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সোশালিস্ট দেশের বিনাশ সাধনের উদ্যোগ আয়োজনে ক্ষান্ত হবার সাহস পায় না। তারা ভুলে যায় যে এশিয়া আর আফ্রিকার মানুষ জীবনে প্রাথমিক স্বাচ্ছন্দ্যের উপযোগী জিনিস পাওয়ার

প্রতীক্ষায় একশো বৎসর ধৈর্য ধরে থাকার মতো মনোবৃত্তি আজ রাখে না। আর ভুলে যায় যে কোটি কোটি মানুষের দুর্গতি পৃথিবীতে এমন সংকট সৃষ্টি করেছে যে তার সুস্থ সমাধান ঘটাতে না পারলে বিপর্যয় অনিবার্য। এসব কথা যারা ভুলে থাকে, তারাই ধনিক সমাজে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির স্বরচিত অবসর ও একান্ত স্বকীয়তার গুণগান করে সমসুযোগের সমাজকে বিদায় দেয়, কমিউনিজমকে ব্যক্তিস্বাধীনতার যম বলে ভয় দেখিয়ে বেড়ায়।

১৮৪৮ সালে লেখা কমিউনিস্ট ইশ্‌তেহারে আছে: "বিভিন্ন শ্রেণী এবং তাদের পরস্পর-বৈষম্য-সমেত পুরনো বুর্জোয়া-সমাজের স্থানে নূতন এক সংঘের পত্তন আমরা করব, যেখানে সকলের স্বাধীন বিকাশের অঙ্গীকার হল প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের অবারিত বিকাশ।" প্রকৃত মানবিকতার বাস্তব সামাজিক ভিত্তি সোশালিজম বিনা সম্ভব নয়; স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ধনতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকলে প্রকৃত মানবিকতারই শত্রুতা করা হয়।

১৮২৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এক কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এক ডাক্তার-পুঙ্গব বলতে ইতস্তত বোধ করেন নি যে কলের মজুরকে একাদিক্রমে একুশ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে খাটানোর দরুণ তার স্বাস্থ্যভঙ্গ যে হবে এমন কোনো কথা নেই। ১৯৩৩ সালে ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের মধ্যে একটা বিতর্ক চলেছিল; বিষয় হল বেকার শ্রমিকের পক্ষে প্রাণধারণের জন্য প্রতি সপ্তাহে খাওয়া বাবদ নিম্নতম খরচ কত পড়ে। সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ বলে, অন্তত পাঁচ শিলিং দেড় পেনি। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন টাকা মাথা পিছু চাই, আর চিকিৎসক-সংঘের মতে দরকার পড়ে আরও নয় পেনি বা প্রায় নয় আনা। বেকার ভাতা তখন ইংলণ্ডে যা মিলত, তাতে কেউ মাথাপিছু তিন শিলিং ছ-পেনির বেশি খরচ করতে পারত না। যাদের কাজ ছিল, তারাও যে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য কেনার সঙ্গতি রাখত, তা নয়। আমাদের দেশে আমরা খাদ্যবস্তুর প্রয়োজন সম্বন্ধে অ্যাকরয়েডের হিসাব এবং সরকারী হিসাবে তফাতের কথা আলোচিত হয়ে থাকে। ছেলেমেয়েদের মুখে তুলে দেবার মতো খাদ্য কেনার সঙ্গতি নেই বলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা যখন মরিয়া হয়ে ধর্মঘট করে, তখন তারা পায় প্রচুর উপদেশ আর তার চেয়ে ঢের বেশি প্রচুর শাস্তি। শোষণ যে সমাজব্যবস্থার মূল কথা, সেখানে এর বেশি কিছু আশা করা যায় না।

কোম্পানীর আমলে বাংলাদেশে স্বদেশী-বিদেশী শোষণের মারাত্মক ত্র্যহস্পর্শের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তার বর্ণনা আছে রামপ্রসাদের রচনায়:

কারে দিলে ধনজন মা, হস্তী-অশ্ব-রথচয়,
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেউ নয়?
কেউ থাকে অট্টালিকায়, মনে করি তেমনি হই,
মাগো, আমি কি তোর পাকা ক্ষেতে
দিয়াছিলাম মই?

সরল কবি তার পরের পদেই সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিলেন:

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, আমায় কপাল বুঝি অমনি অই।
ওমা, আমার দশা দেখে বুঝি শ্যামা হলে পাষাণময়ী।

ইতিহাসের যে যুগ আজ আরম্ভ হয়ে গেছে, সেযুগে অতীতের এই গ্লানি ও যন্ত্রণার বোঝা বহন করে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। পাষাণে যখন প্রাণসঞ্চার হয়, তখন অসাধ্য সাধন ঘটে। নূতন, শ্রেণীহীন সমাজে মেহনতী মানুষ তেমনই অসাধ্যসাধন করে চলেছে। সোভিয়েত দেশে গিয়ে ত্রিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন পৃথিবীর "সব চেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞ" আর বলেছিলেন: "মানবসমাজে এরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তাদের বুদ্ধি স্ববশ, তাদের হাত হাতিয়ার স্ববশ।" তারপর দেশে দেশে রূপান্তর ঘটেছে—স্বর্গরাজ্য অবশ্য আসে নি, হয়তো তা আমাদের কাম্যও নয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের অপরিসীম ও অপরাজেয় শক্তির পরিচয় আজ সর্ব দেশেই মিলছে।

কমিউনিজমের কুৎসা চলে চলুক, সমসুযোগের সমাজ সর্বত্র স্থাপিত একদিন হবে-ই। ভুল-ভ্রান্তি থেকে পরিপূর্ণ নিস্তার সম্ভব নয়। তাই ভুল-ভ্রান্তিতে অতিরিক্ত ভীতি বোধ করা হল মস্ত ভুল। আর বিপক্ষীয়ের কটূকাটব্যে বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নেই; ইতিহাস তাদের বিপক্ষে রায় দিয়েছে, আর তা অকাট্য বলেই তাদের উষ্মা এত বেশি। কাজের ক্ষেত্রে কমিউনিজমের প্রয়োগে দুর্বলতা ও দোষ দেখা দিয়ে থাকলেও সব দেশের সাধারণ মানুষ বুঝেছে যে ধনতন্ত্রের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে না এলে তার উপায় নেই। কমিউনিজম্ শুধু যে মানবসমাজের ভবিষ্যৎ সূচনা করছে তা নয়; সঙ্গে সঙ্গে তার তত্ত্ব, তার আদর্শ এবং ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি সত্ত্বেও তার কর্ম যেন সকলের কাছে প্রমাণ করতে পারে যে মানুষের বুদ্ধি, বিবেক ও মর্যাদার প্রতীক হল সাম্যবাদের দিকে সমাজের বিবর্তন প্রচেষ্টা।

কথা কও

প্রদ্যোৎ গুহ



মা! তুই আমার দিকে অমন করে তাকাস নে। তোর ঐ মৃতচোখের দু আমাকে বিদ্ধ করে। আমি নড়তে পারি না, পাশ ফিরতে পারি না, পালাতে পারি না। তুই যখন পেছন ফিরে থাকিস তখনও তোর চো দুটো আমাকে দেখে। আমার গা ছমছম করে। মাথার মধ্যে দপদপ করে। আমি চোখ বুজলেও তোকে দেখি। তোর প্রেত চোখ দুটো জলজল করে। কিন্তু আমি নড়তে পারি না, পাশ ফিরতে পারি না, পালাতে পারি না।

মা, তোর চোখে আগুন নেই। অভিযোগ নেই। প্রাণ নেই। গা ছমছম করে। চোখ বুজলেও তোর মুখ। তোর চোখ দুটো আমায় দেখে। আমি ঘুমোতে পারি না। ঘুমের দরজায় তোর চোখের পাহা জেগে থাকতে পারি না। চৈতন্য তোর দুই চোখ। মাথার মধ্যে দপ করে। আমি পালাতে চাই। কিন্তু পথে তোর দুই চোখ।

দোহাই, তোর চোখের পাহারা সরিয়ে নে। আমাকে মুক্তি দে। রাতের কথা তোর মনে নেই? তোকে বুকে আগলে বনবাদাড়ে মাইল পথ ভেঙে ইষ্টিমারে এসে উঠেছিলাম। তখন কী জানি— এক দৈত্যপুরী!

বালিসের নিচে টাকাগুলো জলছে। আমার পিঠে আঁচ লাগছে। মাংসের গন্ধ। দম আটকে আসে। দোহাই তোর, টাকাগুলো নে। আমাকে মুক্তি দে।

রাত এখন কটা? তুই কখন এলি টের পাই নি তো। আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? নাকি এখনও ঘুমিয়ে? নাকি তুই আর তুই নেই? তুই তোর ছায়া শরীর? কী নিঃশব্দ তোর চলাফেরা। কী শান্ত তোর দৃষ্টি! গা ছমছম করে।

দোহাই তোর, অমন করে তাকাস নে। তার চেয়ে তুই কিছু বল। সাংঘাতিক কোনো কথা।

কী দস্যি মেয়ে ছিলি তুই। শাড়ির আঁচল কোমরে গুঁজে তরতর করে গাছে উঠে যেতি। পাখির বাসা পেড়ে আনতি। সারাদিন আমি ইস্কুলে থাকতাম আর তুই দস্যিপনা করে বেড়াতি। পাড়া-পড়শীর অভিযোগে কান পাতা যেত না। মনে আছে, ঝড়ের মধ্যে আম কুড়োতে গিয়ে একবার গাছ চাপা পড়েছিলি? আয়নার সামনে দাঁড়ালে দেখতে পাবি—কপালের সেই কাটা দাগটা হয়তো এখনও মিলোয় নি। অথচ তোকে কিছু বলার উপায় ছিল না। তোর মা ছিল না। পাখির ছানার মতো বুকে করে তোকে মানুষ করেছি। একটা কথা বললে পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসতি। সারাদিন তোর কান্না থামত না। সারাদিন পর আমি যখন বাড়ি ফিরতাম তোর মুখে কথার বান ডাকত। সেই তুই এমন শান্ত হয়ে গেলি কি করে? এমন নিশ্চুপ? দোহাই তোর, কিছু বল।

মা, চল আমরা পালাই। রাত্রের অন্ধকারে এই দৈত্যপুরী থেকে পালাই। তুই ভাবিস নে, আমি পারব। আমাকে একটু পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দে। আমি ঠিক পারব। সেই রাতের কথা তোর মনে নেই? বন-বাদাড়ে তিন মাইল পথ ভেঙে এসে আমরা ইষ্টিমারে উঠেছিলাম। জল্লাদরা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধেছে। আমার মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছে। আমি নড়তে পারি না। দেহটা পেরেক দিয়ে এঁটে দিয়েছে তক্তাপোশের সঙ্গে। তবু আমি পারব। তুই ভাবিস নে আমি পারব। আমাকে শুধু পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দে। আমি পারব।

কিন্তু নাছোড় গোয়েন্দার মতো স্মৃতি আমাকে অনুসরণ করে। আমি দাঁড়ালে দাঁড়ায়। ফিরে দেখলে ফিরে দেখে। দৌড়ালে দৌড়ায়। আমার স্মৃতি যেন আমার ছায়া। কখনও সে চুপসে এইটুকু। কখনও সে দৈত্যের মতো বড় হয়ে আমাকে ভয় দেখায়। কিন্তু আমি পালাতে পারি না। ভারী একটা শেকল দিয়ে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধেছে। পেরেক দিয়ে এটে দিয়েছে তক্তপোশের সঙ্গে।

তার চেয়ে তুই পালা। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছি। এই অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তুই পালা। তুই আমার স্বপ্ন ছিলি। তোকে নিয়ে আমার কত স্বপ্ন ছিল। তোর ঘর হবে। বর হবে। কোল-জোড়া খোকা হবে। গোলা ভরা ধান। বাটাভরা পান। তুই পালা। আমার স্বপ্নগুলো আঁচল দিয়ে ঢেকে নিয়ে তুই পালা। এই অন্ধকারে গা ঢেকে পালিয়ে যা দৈত্যপুরী থেকে। আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছি। কেউ টের পাবে না। তুই পালা। নদী ভাগ হয়ে তোকে পথ করে দেবে। বাসুকী ফণা মেলে তোকে বাঁচাবে। তুই পালা।

তুই বলেছিলি, চাকরি পেয়েছিস। আমি বিশ্বাস করেছিলাম। তুই টাকা এনে দিয়েছিলি। হাত পেতে নিয়েছিলাম। আমার হাত দুটো তুই কেটে ফেল। আমার হৃৎপিণ্ডটা উপড়ে নে। তবু, আমার দিকে তুই অমন করে তাকাস নে। তোর ঐ মৃত চোখের দৃষ্টি আমাকে বিদ্ধ করে। তোর চোখে আগুন নেই। জ্বালা নেই। তবু গা ছমছম করে।

আমি না জেগে আছি না ঘুমিয়ে? না ঘুমিয়ে না জেগে।

ওরা তোকে জাপটে ধরেছে। মস্ত একটা কাঠের গুঁড়ির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। পায়ের নিচে জেলেছে আগুনের কুণ্ড। নরমাংসভোজীরা তোকে ঘিরে আদিম বন্যনৃত্যে মেতেছে। তুই অসহায় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে

কিন্তু আমি নড়তে পারি না। পাশ ফিরতে পারি না। জল্লাদরা আমাকে পেরেক দিয়ে এঁটে দিয়েছে তক্তপোশের সঙ্গে। চিৎকার করতে পারি না। আমার কথা কেড়ে নিয়েছে। জঙ্গল থেকে তোকে নিয়ে আমি পালাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সারা দুনিয়াটাই জঙ্গল হয়ে গেছে। আর নরমাংসভোজীর ভিড়। ওরা তোকে ঘিরে আদিম বন্য নৃত্যে মেতেছে।

অসহ্য! আমার চোখ দুটো তুই অন্ধ করে দে। আমার চৈতন্যকে দে ঘন অন্ধকার দিয়ে।

তুই আমাকে কিছু বলিস নি। কিন্তু আমি জানি। আমি জানি— তা টের পেয়েছিস। আমি জানি তা তোকে বলি নি। তুই যে পেয়েছিস তা তুই আমাকে বলিস নি। তবু দুজন দুজনের কাছে ধরা পড়ে গেছি। ধরা পড়ে গেছি—তবু ধরা দেই নি। তবু তোর চোখ দুটো গেল আর সেই প্রেতচোখ আমায় অনুসরণ করতে থাকল। আমি

লুকোই। পর্বতের আড়াল খুঁজি। পর্বত সরে দাঁড়ায়। অন্ধকারে লুকোতে যাই। অন্ধকার আলো হয়ে ওঠে।

দোহাই তোর, আমার দিকে অমন করে তাকাস নে। আমি তোকে বুকে আগলে তিন মাইল পথ ভেঙে এসে ইষ্টিমারে উঠেছিলাম। হায়নারা শেয়ালেরা ঘুরঘুর করত। আমি তোকে আড়াল করে রেখেছি। আলেয়ারা এসে হাতছানি দিত। আমি চোখ বন্ধ করে থেকেছি। তারপর ওরা আমাকে চারদিক থেকে জাপটে ধরল। ভারী একটা শেকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধল। পেরেক ঠুকে ঠুকে দেহটাকে আটকে দিল তক্তপোশের সঙ্গে। এখন আমি নড়তে পারি না, পাশ ফিরতে পারি না, চিৎকার করতে পারি না। আমি বেঁচে আছি তবু মৃত। মৃত তবু বেঁচে আছি। ওরা তোর কাছে আমার মুক্তিপণ আদায় করল আমার স্বপ্ন। কিন্তু মুক্তি দিল না। আমার স্বপ্ন কেড়ে নিয়ে আমাকে বন্দী করল। এখন ওরা তোর চারপাশে আদিম বন্য নৃত্যে মেতেছে। আর আমি বন্দী।

মা, তুই আমার দিকে অমন করে তাকাস নে। তোর ঐ মৃত চোখের দৃষ্টি আমাকে বিদ্ধ করে। তোর চোখের মধ্য দিয়ে তোর মা আমার দিকে তাকায়। তোর চোখে অভিযোগ নেই। অথচ আমি কাঠগড়ায়।

তোর মা কোনো কথা বলে নি। শুধু তাকিয়ে ছিল কী করুণ চোখে। কথা বলার শক্তি ছিল না। প্রয়োজনও ছিল না। কেননা, তার চোখের ভাষা আমি জানতাম। বুঝতে পেরেছিলাম। আমি কোনো কথা বলতে পারি নি। কিন্তু আমার চোখ কথা বলেছিল। সে ভাষা তোর মা জানত। বুঝতে পেরেছিল। তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলেছিল একবার। তারপর নিভে গিয়েছিল। কিন্তু তার মুখে ফুটে উঠেছিল কী পরম নিশ্চিন্তি। তুই তখন কতটুকু! তোর চোখের মধ্যে দিয়ে সেই চোখ আমার দিকে তাকায়। তোর চোখে অভিযোগ নেই। অথচ আমি কাঠগড়ায়।

কিন্তু আমি তোকে পাখির ছানার মতো বুকে করে মানুষ করেছিলাম। জঙ্গল থেকে তোকে নিয়ে পালাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সারা দুনিয়াটাই জঙ্গল হয়ে গেল।

তুই বলেছিলি চাকরি পেয়েছিস। আমি বিশ্বাস করেছিলাম। তুই টাকা এনে দিয়েছিলি। হাত পেতে নিয়েছিলাম। কিন্তু বালিশের নিচে

টাকাগুলি জলছিল। আমার পিঠে আঁচ লাগছিল। তখন বুঝি নি। আসলে বুঝতে চাই নি। আমি বিশ্বাস করতে চেয়েছিলাম।

তুই কিছু বলিস নি। তোর চোখ দিয়ে জল পড়ে নি। বিদ্যুৎ চমকায় নি। আমি বুঝতে চাই নি। বিশ্বাস করতে চেয়েছি। বিশ্বাস করতে পারি নি। বিশ্বাস করতে পারি নি তা তোকে বুঝতে দিতে চাই নি। তুই বুঝতে চাস নি কিন্তু বুঝতে পেরেছিস। বুঝতে পেরেছিস তবু বুঝতে দিতে চাস নি। আমি বুঝতে পেরেছি তবু টাকা নিয়েছি তবু হাত কাঁপে নি। তাই তুই পাথর হয়ে গেলি। এখন তোর পাথুরে চোখ দুটো আমাকে অনুসরণ করে। আমি ঘুমোতে পারি না। ঘুমের দরজায় তোর চোখ। আমি জেগে থাকতে পারি না। চৈতন্য তোর চোখ।

মা, তুই অমন করে তাকাস নে। তোর চোখের মধ্যে দিয়ে তোর মা আমাকে দেখে। কিন্তু আমি তোকে পাখির ছানার মতো বুকে করে মানুষ করেছিলাম। তোকে নিয়ে জঙ্গল থেকে পালাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সারা দুনিয়াটাই জঙ্গল হয়ে গেল। তোর পায়ের নিচে ওরা আগুনের কুণ্ড জালল। নরমাংসভোজীরা মেতে উঠল আদিম বন্য নৃত্যে। কিন্তু আমাকে ওরা শেকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেধেছে। পেরেক দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেহটাকে আটকে দিয়েছে তক্তাপোশের সঙ্গে। আমি নড়তে পারি না। পাশ ফিরতে পারি না। লড়তে পারি না। অথচ তোর প্রেত চোখ দুটো আমাকে বিদ্ধ করে। আমার ছায়া দৈত্যের মতো বড় হয়ে আমাকে ভয় দেখায়। আমি পর্বতের আড়াল খুঁজি। পর্বত সরে দাঁড়ায়। আমি অন্ধকারে লুকোতে যাই। অন্ধকার আলো হয়ে ওঠে। অসহ্য!

দোহাই তোর, আমার দিকে অমন করে তাকাস নে। তোর প্রেত দৃষ্টি আমাকে বিদ্ধ করে। অসহ্য! তোর চোখের মধ্য দিয়ে তোর মা আমার দিকে তাকায়। অসহ্য। টাকাগুলো সব দাউ দাউ করে জলছে। অমন করে তুই তাকাস নে। তার চেয়ে কিছু বল। সাংঘাতিক কোনো কথা।

অহল্যা মা আমার, জেগে ওঠ। কিছু বল। ক্রোধের আগুনে জালিয়ে দে তোর দুই চোখ। কিছু বল। রাগে রি রি করে জলে উঠুক এ-অরণ্য। কিছু বল। নরমাংসভোজীরা পুড়ে ছারখার হোক। কিছু বল। সাংঘাতিক কোনো কথা।

মা, তোর চোখের পাহারা সরিয়ে নে। আমাকে মুক্তি দে। কিছু বল। আমাকে মুক্তি দে।

চোখ-বোজা অন্ধকার।

অন্ধকার মা হয়ে গেছে।

মা-মা গন্ধ। শুকনো বুকের তলায় মুখ ডুবিয়ে পড়ে আছে অচিন্ত্য। কোলেচড়া বয়সে মায়ের বুকে মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাকত। রাতের ভাত থেকে এক মুঠো লুকিয়ে জল ঢেলে রাখত মা। মোরগ-ডাকা ভোরে ভাতগুলো খাওয়া মেলত। দিনের আলোয় কি রাতের তারার হদিস মেলে? ঢাকনা



খুলতেই তারাগুলো জোনাকি হয়ে যেত। শূন্য বাটিটার দিকে তাকিয়ে আকাশ হয়ে যেত মা। বর্ষার আকাশ। গোষ্পদের জলে মুখের ছায়া দেখত। ঘোলা জলে নোনা জল মিশত। জলে জল মিশলে কি দাগ থাকে? লোভী ছিল বড়দা। জ্যাঠামশাইয়ের বড়ো ছেলে বড়দা। লোভ না খিধে? খিধে সইতে পারত না বড়দা। খিধে বেড়াল হয়ে রাতের অন্ধকারে ছোঁক-ছোঁক করত। বে-ওয়ারিশ বেড়াল। নেশাভাঙ করলে কি খিধে বেশি পায়। গাঁজা খেলে? খিধে জন্তু। জন্তুর কি জ্ঞান থাকে? জ্ঞান থাকে। জন্তু কি বুঝ মানে? খিধেয় ককাতে ককাতে কচি দিনটা

আকাশের কোলে নেতিয়ে পড়ত। ভাতের কান্না ভুলে মায়ের বুকের কান্নার গন্ধ শুকত। গন্ধ নিশ্বাস হয়ে ঘূর্ণি তুলত। সন্নেসী-খুড়োর খুপরি ঘরের পেছনে নিত্যি ঢেলে-দেয়া বাসী ফুলপাতার নিশ্বাস। শুঁকতে শুঁকতে ঝিম ধরত। দম আটকে আসত। হেঁচকি উঠত। মায়ের কাঠি কাঠি আঙুলগুলো হোঁচট খেতে খেতে ওর গায়ে মাথায় কপাল কুটত। আঙুলের ডগা গলে হাড়-পাঁজরার খাঁচে খাঁচে অভিযোগ জমাট বাঁধত। তারপর নিশ্বাস হয়ে উড়ে যেত।

বড়ো হবার পরেও রাত্রে পাশে শুয়ে বুকে-পেটে হাত বুলাত মা। মায়ের হাতের তলায় ভরাপেটেও ঢলা পাতা। কাঠি কাঠি আঙুলগুলো পেটের উপর পাক খেয়ে খেয়ে পাঁজরা ছুঁয়ে কণ্ঠার দিকে এগিয়ে চলত। মায়ের অভ্যেস। অভ্যেস না স্বভাব? অভ্যেস জমে জমেই কি স্বভাব হয়ে ওঠে। আঙুলের ডগাগুলো কণ্ঠার খাঁচে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। কাতরে উঠত। হাড়কাঁটা যে সব বেরিয়ে পড়েছে!—কানের উপর দীর্ঘশ্বাস ফিসফিসিয়ে উঠত।

মা অন্ধকার হয়ে গেছে।

অমন করে মুখ নিচু করে বসে আছে কেন? খাও। মা কি কারো চিরকাল থাকে? ঢঙ!

অর্জুন পণ্ডিতের তেল খাওয়ানো 'রক্ত-রঙিনী' আচমকা পিঠের উপর আছড়ে পড়ে। পিঠে না বুকে? হৃৎপিণ্ডের ওপর। 'রক্ত-রঙিনীর' ধার মরে গেছে। ভোঁতা। মুখ তুলে তাকায় অচিন্ত্য। বৌদি? না বৌঠান? বধুঠাকুরানী। গর্তের ভিতরে দুটো জলন্ত ভাঁটা ঘুরছে, বনবন করে। মা নেই, কিন্তু আমি তো এসে তিন বছরেরটি কোলে তুলে নিয়েছিলাম। ভাঁটা দুটো ঘুরতে ঘুরতে দাদার মুখের উপর আছড়ে পড়ে। কানা ভিখারী ফুটো কলাইয়ের বাটির ভিতরের কটা নয়া আর ফুটো পয়সায় টাকার ঝনঝনানি। সীতার চোখ দাঁতে দাঁত ঘসে। মুখটা লেজ-ঝাপটা অথৈ জলে তলিয়ে যায়। খাওয়া ছেড়ে মুখ তুলে তাকায় দাদা। কড়া থেকে মাছের মুড়ো থালায় পড়ে যে-চোখে তাকায়। বৌঠানের মুখের ওপর থেকে চোখ দুটো পিছলে এসে পড়ে অচিন্ত্যের থালায়। পড়েই ছিটকে যায়। নিজের থালার ওপর এসে স্থির হয়ে থাকে। দুটো পাতার দু-ফোঁটা সঙ্কোচ টলটল করে। কাঁপে। মাছির পাখা। দাদার মুখটা

যেন অচেনা লাগে। চেনা-চেনা অচেনা। বহু দিন না দেখলে যেমন চেনা-চেনা অচেনা হয়ে যায়। কত দিন দেখে নি? রোজই তো দেখে। রোজই কি দেখে? কত কাল দেখে নি? অনেক দিন না দেখলে দেখার ওপর কি মরচে পড়ে? দৃষ্টির ওপর? দৃষ্টির না স্মৃতির? হয়তো স্মৃতির। স্মৃতির গায়ে মরচে পড়ে, ভোঁতা হয়ে যায়। অনেক দিনের অনেক চেনাও চেনা-চেনা লাগে।

ভাত ভাঙতেই একটা গন্ধ এসে নাকে লাগে। চেনা-চেনা গন্ধ। গন্ধটা হাতে জড়িয়ে যায়। হাত চেপে ধরে। আঙুলগুলো ছটফট করে, চঞ্চল হয়ে ওঠে, নড়ে না। বোবা-ধরা আঙুল। নড়ে না। নড়তে চায়, নড়তে যায়, পারে না। গন্ধটা পাক খেয়ে খেয়ে জড়িয়ে ধরে। মায়ের বুকের কান্নার গন্ধ? দম আটকে আসে। গন্ধটা তীব্র হয়ে ওঠে। থাবা মেলে। গলা টিপে ধরে। কোথা থেকে আসছে গন্ধটা? ভাতের থালা থেকে না দাদার ঘোলা-ঘোলা চোখের দৃষ্টি থেকে? মায়ের বুকের কান্নার গন্ধ না উপোসের গন্ধ? উপোস আর লাঞ্ছনার গন্ধ? সারাদিন উপোসের পরে পাশের বাড়ির হাঁড়ি থেকে দু-মুঠো চেয়ে-আনা ভাতের লাঞ্ছনার গন্ধ? গন্ধ না খরিশের পাক? অসাড় করে ফেলে। তারপর সরে যায়। সীতার ছেঁড়া কাপড়ের সেলাইয়ের ফোঁড় বেয়ে বৌঠানের ভাঙ্গপড়া কপালের খাঁচ উপচে শিসওঠা হ্যারিকেনটার ফাটা চিমনির গায়ে কালো হয়ে জমাট বাঁধে। আলোর গলা টিপে ধরে। দব্ দব্ করে বার কয়েক খাবি খেয়ে আলোটা মরে যায়।

অন্ধকার।

অন্ধকার সমুদ্র হয়ে গেছে।

ঢেউয়ের মাথায় ছায়া-ছায়া আলো। বাতি-নেভানো ঘরে মায়ের চোখের কোনায় ফুটে-ওঠা জলে যে-আলো ছায়া মেলত। মা সমুদ্র হয়ে গেছে। ঢেউ। ঢেউ ফুলে ফুলে ওঠে। গুমরে ওঠে। আছড়ে ভেঙে পড়ে। গুঁড়িয়ে যায়। দু-হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরে অচিন্ত্য। ঢেউ কি ধরা যায়? ধরা যায়? সমুদ্র? হাতের বাঁধন মূর্ছা যায়, এলিয়ে পড়ে। এলিয়ে পড়া হাতের বাঁধনে খিলখিল করে হেসে ওঠে স্মিতা। স্মিতার হাসি ঢেউয়ের মাথায় আলোর ফুল হয়ে ফুটে ওঠে। ঢেউ ভাসতে ভাসতে দূরে সরে যায়, মিলিয়ে

যায়। মুঠো খুলে হাতের দিকে তাকায়। অচিন্ত্যের হাতের মুঠোয় করকরে একখানা পাঁচ টাকার নোট! হঠাৎ দমকা হাওয়ায় নোটটা উড়ে যায়। উড়তে উড়তে বড়ো হয়। বড়ো হতে হতে আকাশ-জোড়া হয়ে ওঠে। তারপর নেমে আসে সমুদ্রের বুকে। ঢেউ তলিয়ে যায়, চাপা পড়ে। আলোর ফুল?

আর দুখানা ভাতের-ইলিশ এনে দাও না ওকে। ভালোবাসে। তোমার যদি কিছু খেয়াল থাকে! না না পেটির মাছই দাও। অফিস যাবার সময়ে কি আর মানুষ কাঁটা বেছে খেতে পারে?—দাদার গলায় উদ্বেগের কাঁটা খচখচ করে।

হাঁ, হাঁ, খুব খেয়াল আছে মশাই, তোমাকে আর বকবক করতে হবে না। আমিও এসে সেই তিন বছরেরটি কোলে তুলে নিয়েছিলাম সে-কথা ভুলে যাও কেন? আজ না হয় তোমার ভাই একজন হয়ে উঠেছে।—বৌঠান বৌদি হয়ে ওঠে—একি এই বাসী জামাটাই আবার গায়ে ঢুকিয়ে অফিস বেরোচ্ছ? দুটি ভাই চিরকালই একরকম রয়ে গেলে! আর তোরই-বা কি আক্কেল সীতা! তুই-ও তো একটু দেখেশুনে গোছগাছ করে রাখতে পারিস! না হয় আজ বাদে কাল চলেই যাবি, তা বলে এখন থেকেই অমন পরপর ভাবতে শুরু করেছিস কেন?

ভালো হবে না কিন্তু বৌঠান! ও দাদা, মানা কর বলে দিচ্ছি!

সীতার মুখের দিকে তাকায় অচিন্ত্য। দু চোখের ঘন বনে সোনার হরিণ ধরা পড়ে। ছোটে। ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়ায়।

তাহলে আসচে অগ্রহায়ণেই দিন করতে লিখে দি, কি বলিস?

তা দাও।

আর সুমিতার বাবাকেও অমনি লিখে দাও দেখা করতে। ভদ্রলোককে আর কতকাল ঘুরোবে? তা বলে আবার একই দিনে যেন তারিখ ফেলো না। কি বল ঠাকুরপো?

না, সীতার বনবাসের পরেই তো লক্ষণ-বর্জন! রামায়ণে ঐ কথাই লেখে। কিন্তু হুঁসিয়ার বৌঠান, খুব তো নাচছ শেষ পর্যন্ত লক্ষণ-বর্জনের পালাই না শুরু হয়!

থাক থাক, তোমাকে আর অত হুঁসিয়ারি দিতে হবে না। এখন অফিস যাচ্ছ যাও, কিন্তু গাড়িটা আজ রেখে যেও, লক্ষ্মী ঠাকুরপো!

না, না, সে-কি! ও এখন একটা অফিসার মানুষ, যা-তাই একটা ভাড়া গাড়িতে করে অফিস গেলে কি সম্মান থাকে? তোমরা বরং কোথায় যাবে একটা ট্যাকসি-ফ্যাকসি নিয়ে যেও।

ঘাম দিয়ে জর ছাড়ে অচিন্ত্যের। জোর বাঁচিয়ে দিয়েছে দাদা। সুমিতাকে নিয়ে ছুটির পরে একটা লম্বা পাড়ি জমাবার কথা হয়ে আছে আগে থেকেই।

সে-ই ভালো, তোমরা বরং একটা ট্যাকসি নিয়েই যেও।—মুখ মুছে রুমালটা পকেটে রেখে পার্স খুলে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দেয় বৌঠানের হাতে। তারপর ঘড়িটার দিকে তাকিয়েই তরতর করে নেমে যায়।

না কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছে না গাড়িটা। সেলফটা বিগড়ে গেল নাকি? ইস্, অনেক দেরি হয়ে গেল! নির্ঘাত লেট হতে হবে। মরিয়া হয়ে উঠে আবার চেষ্টা করতেই একটা অদ্ভুত আওয়াজ করে গাড়িটা কেঁপে ওঠে। চমকে ওঠে অচিন্ত্য।

ইস্, কত বেলা হয়ে গেছে!—চোখ কচলে বেলার দিকে তাকায়। এখন কেচে দিলে কি আর শুকোবে?—পেরেকে ঝোলানো জামাটার দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু আজই তো দরখাস্ত দেবার লাস্ট ডেট! আহ্, যদি লেগে যায় চাকরিটা!

হুঁ, বুড়ো মানুষের ঘাড়ে বসে দু-বেলা গিলতে পারলে ন-টার আগে কি আর কারোর ঘুম ভাঙে?—বিগড়ে যাওয়া ইঞ্জিনটা কড়কড় করে ওঠে? ইঞ্জিন না বৌঠানের গলা। কান পেতে খানিকক্ষণ শোনে। সেলফ স্টার্ট। স্টার্ট নিয়েছে, সহজে কি থামে? মরুক গে! ও তো গা-সওয়া হয়ে গেছে। জামার পকেটে হাত দেয় অচিন্ত্য। পরক্ষণেই হাতটা পাথর হয়ে পকেটের ভিতরে ঝুলে থাকে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাথর হয়ে যায়।

পাথরে ভূমিকম্প জাগে।

সীতা!—কাঁপতে কাঁপতে চিড়খেয়ে ফেটে পড়ে পাথরটা। সীতার চোখের ঘন বনে সোনার হরিণ পথ হারায়। পথ হারিয়ে থমকে দাঁড়ায়, কান খাড়া করে।

আমার টাকা ?

টাকা !

দরখাস্ত জমা দেবার শেষ দিন। আজ। সুমিতার ধরা ভু-আঙুলের ফাঁকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল নতুন নোটটা। নোটটা না ওর বুকের ভিতরের হৃৎপিণ্ডটা ? না ওর লজ্জা থরথর করে কেঁপে উঠেছিল সুমিতার চোখের পাতায় ? ওর পৌরুষ ?

নোটটা ?

হাওয়া কি মরে গেছে ? আলো ? মাছের মুড়োর ঘোলা-ঘোলা চোখে কি ভাষা থাকে ? জল ? সীতার চোখে ?

একটা তীর এসে বিঁধে যায়। সীতার চোখের ঘন বনে মুখ থুবড়ে পড়ে সোনার হরিণ। ফলার মুখের ভু-কশ বেয়ে ছুঁফোটা তাজা রক্ত গড়িয়ে নেমে আসে। স্রোত জাগে। ঢেউ।

ঢেউয়ের মাথায় আলো ফোটে ? বাতি-নেভানো ঘরে মায়ের চোখের কোনে ফুটে-ওঠা জলে যে-আলো ছায়া মেলত ?

দ্বিজ

অমল দাশগুপ্ত

জয়াদির কথা মনে পড়েছিল অনেক পরে, সারাদিনের শেষে বিকেল গড়িয়ে যখন সন্ধ্যে হচ্ছে। ভোরবেলা বাড়ি থেকে রওনা হবার সময়ে মনে মনে এই হিসেব



ছিল যে সকাল নটার মধ্যেই পৌঁছে যাবে। পৌঁছেছিলও তাই। কিন্তু যে-হিসেবটুকু মনে মনে ছিল না তা এই যে সকাল নটার মধ্যে পৌঁছনো সত্ত্বেও হয়তো দেখবে আগের দিন রাত থেকেই মস্ত লম্বা লাইন হয়ে রয়েছে। হয়েছিলও তাই। তারপরে সারাদিনে অনেক ঠেলাঠেলি করতে হয়েছে, সামনের পেছনের মানুষের সঙ্গে অনেক ঝগড়া—শেষ পর্যন্ত শুধু নিজের নামটুকুকে চাকুরিপ্রার্থী হিসেবে নথিভুক্ত করে যখন বেরিয়ে আসছিল তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হতে আর বিশেষ বাকি নেই। আর তখনই জয়াদির কথা মনে পড়েছিল।

অথচ সকাল থেকে যত কিছু ঘটেছে যত কিছু ভেবেছে তার মধ্যে অনেকবারই জয়াদি এসে তার মনের মধ্যে দাঁড়াতে পারত। আর সেই জয়াদিকেই কিনা মনে পড়ল যখন সারাদিনের সমস্ত ঘটনা ঘটে গিয়েছে, সারাদিনের সমস্ত ভাবনা ভাবা হয়ে গিয়েছে।

রওনা হবার সময়ে যেন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছে এমনিভাবে বলেছিল, মা আটআনা পয়সা দিতে পারবে ?

মা বোধহয় জানত যে শেষ মুহূর্তে এমনি একটা অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। প্রায় একটা তৈরী জবাব বেরিয়ে এসেছিল মার মুখ থেকে : আমার কাছে তো পয়সা নেই বিশু। আগে বলতে হয়! তোর বাবা তো এখনো ঘুম থেকে ওঠে নি। ডেকে তুলব ?

বিশুরও যেন আগে থেকেই জানা ছিল কোন্ কথার পরে কোন্ কথা বলতে হবে। সে বলেছিল, থাক মা, দরকার নেই।

মা বলেছিল, ট্রেনভাড়া আছে তো তোর কাছে? বিনা-টিকিটে যাসনে যেন।

বিশু বলেছিল, তুমি কিচ্ছু ভেবো না মা, আমি ব্যবস্থা করে নেব।

তারপর একক্রোশ মেঠো রাস্তা পেরিয়ে স্টেশনে আসতে আসতে বিশু ভেবেছিল, বাবা বোধহয় আজ ইচ্ছে করেই এখনো ঘুম থেকে ওঠেন নি। এখন যদি সে ফিরে গিয়ে বাবাকে ঘুম থেকে তুলে বলে, বাবা, আটআনা পয়সা দেবে? তাহলে বাবার মুখের চেহারাটা নিশ্চয়ই দেখার মতো হবে। তিনি হয়তো ভুলেই যাবেন যে ঘুম থেকে উঠে তিনি যে দুর্গাঠাকুরের ছবির দিকে তাকিয়ে প্রণাম করেন তা এখনো করা হয় নি। তারপরে হয়তো বলে বসবেন যে ট্রেনভাড়ার অভাবে কলকাতায় যাওয়া বন্ধ হয়েছে এমন লোক কেউ আছে কিনা বিশু দেখাক। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হয়ে বাবা নিশ্চয় ছেলেকে সরাসরি বিনা-টিকিটে যাওয়ার কথা বলতে পারবেন না।

অবশ্য, বিনা-টিকিটে বিশু যে কখনো যাতায়াত করে নি তা নয়। কিন্তু সেজন্যে আলাদা উপলক্ষ চাই। এই তো, কিছুদিন আগেও সরকারি কর্মচারীদের কাজে ফিরিয়ে নেবার দাবিতে যে মিছিল বেরিয়েছিল তাতে যোগ দেবার জন্যে সেও দলে পড়ে এসেছিল বিনা-টিকিটে। স্টেশনে নেমে অন্যদের দেখাদেখি সেও বুক ফুলিয়ে লোহার গেট পেরিয়েই বাইরে এসেছিল। তাদের টিকিট নেই জানা সত্ত্বেও কেউ তাদের কাছে টিকিট চায় নি।

বিশেষ করে আজকের দিনে বিনা-টিকিটে বিশু আসতে চায় নি। স্টেশনে নেমে বুকটা ঢিপঢিপ করছিল। উল্টো দিক দিয়ে অনেক ঘুরে স্টেশনের বাইরে এসেও বুকের ঢিপঢিপুনি কমে নি। তারপরে চাকুরিপ্রার্থীদের নাম নথিভুক্ত করার এই আপিসে এসে লাইনের চেহারা দেখে বুকের ঐ ঢিপঢিপুনিটাই যেন দ্বিগুণ বেড়ে গিয়েছিল। সারাদিন সে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি করেছে, ঝগড়া করেছে, আবার মাঝে মাঝে 'দাদা, আমার জায়গাটা রইল, আমি এক্ষুনি আসছি' বলে এমনভাবে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ফিরে এসেছে যেন সে নাভিশ্বাস-ওঠা রুগীর জন্যে ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিল।

তারপর সারাদিনের পর লাইন থেকে ছাড়া পেয়েও বুকের ঐ ঢিপঢিপুনিটা কমে নি। আবার বিনা-টিকিটে ফিরতে হবে ভেবে নয়,

বিনা-টিকিটে ফিরে যাওয়াটা সহজ ব্যাপার। সারাদিন কিছু খায় নি বলে নয়, কারণ সারাদিন না-খেয়ে কাটানোর অভ্যেস তার আছে। বোধহয় এই কারণে যে যদিও সে খুব বড়ো রকমের ভরসা নিয়ে আসে নি কিন্তু এখানে আসার পরে লাইনের চেহারা ও লোকজনের কথাবার্তা শুনে বুঝেছে যে চাকুরিপ্রার্থী হিসেবে হাজারবার নাম নথিভুক্ত করালেও কোনো ফললাভের আশা নেই। যেমন স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দেবার পরেই সে বুঝতে পেরেছিল যে সে পাশ করতে পারবে না। তবুও মনের কোণে একটুখানি আশা জীইয়ে রেখেছিল যে হয়তো কোনোক্রমে বেরিয়েও যেতে পারে। তারপর যেদিন সত্যি সত্যিই দেখেছিল যে তালিকায় তার নাম নেই সেদিনও বুকের ভেতরটা ঠিক এমনি ঢিপঢিপ করেছিল। তারপরের তিনটে বছর যখনই কারও কাছ থেকে কিছু সন্ধান পেয়েছে আর সন্ধান পাবার পরে বিশেষ কারও সঙ্গে দেখা করে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে যে কিছু হবার সম্ভাবনা নেই—তখনো বুকের ভেতরটা ঠিক এমনিভাবে ঢিপঢিপ করেছে। আজকাল অনেক সময়ে রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরতেও বুক ঢিপঢিপ করে। হয়তো মনের মধ্যে একটা আশঙ্কা থাকে যে বাড়ি ফিরেই টের পাবে বাবা-মার মধ্যে আবার প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছে, ছোট ভাইটা আবার বাবা বা মার হাতে প্রচণ্ড ঠেঙানি খেয়েছে, ছোট বোনটার সেই বিকেলবেলার ঘুষঘুষে জ্বরটা আবার চাগাড় দিয়ে উঠেছে বা এমনি আরো হাজারটা ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু বাড়ি ফিরেও যখন বুঝতে পারে যে তেমন কিছুই ঘটে নি তখনো বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করে। অথচ এমনিতে বিশ বছরের জোয়ান চেহারাটা দেখে ভাবা যায় না যে এমন মজবুত কাঠামোর মধ্যেকার হৃৎপিণ্ডটা এত ভীতু। এত সামান্য কারণেই বা বিনা কারণেই এমন চ্যাটালো বুকটা এমন ঢিপঢিপ করে।

বাইরে বেরিয়ে বিশুর ইচ্ছে হয়েছিল কোথাও গিয়ে একটু হাত-পা ছড়িয়ে শোয়। আর, আর, কোথাও গিয়ে একটু কিছু খায়। কিন্তু কলকাতা শহরটা বড়ো চাপা আর বড়ো ঘিঞ্জি। এখনকার মানুষগুলো কারও দিকে ফিরে তাকায় না। এখানকার হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিলেও বুকের ভেতরটা কেমন ফাঁকা-ফাঁকা থেকে যায়। এমনি ধরনের একটা অনুভূতি যখন বিশুর মনে আবছাভাবে জেগে উঠতে চাইছিল, ঠিক তখন, তখনই, বিশুর মনে পড়ল জয়াদির কথা। সঙ্গে সঙ্গে ছোটন ও দীপুর কথা,

মাস্টারমশাইয়ের কথা। লেকের ধারে যে কলোনিতে জয়াদিরা নতুন বাসা করেছে তা বিশু খুঁজে বার করতে পারবে। অনেকদিন দেখা হয় নি জয়াদির সঙ্গে। আচমকা হাজির হলে জয়াদি নিশ্চয়ই খুশি হবে। একমাত্র জয়াদির কাছে গিয়েই সে সরাসরি বলতে পারবে, জয়াদি কিছু খেতে দাও, ভীষণ খিদে পেয়েছে। জয়াদি হয়তো সঙ্গে সঙ্গে ময়দা মাখতে বসবে আর তখন বিশু বলবে, না, জয়াদি, ভাত খাব। জয়াদি তখন নিজেদের জন্যে রান্না করা সমস্ত ভাত বেড়ে দেবে বিশুর সামনে। বিশু লজ্জা পেয়ে বলবে, তোমাদের জন্যে রাখলে না জয়াদি? জয়াদি বলবে, তুই খা না, আমি আবার রান্না করে নেব। ছোটন বলবে, মা, মা, ছাখ, বিশুদা মাছের কাঁটাটা সুদ্ধ চিবিয়ে খাচ্ছে। দীপু বলবে, আচ্ছা বিশুদা, তুমি মাংসের হাড় চিবিয়ে খেতে পার? বিশু বলবে, হ্যাঁ পারি।

সত্যি সত্যিই খেয়েছিল। মাস্টারমশাই সবে নতুন বদলি হয়ে এসেছেন। ছোটন আর দীপু বাড়ির পাশের পুকুরের ধারে খেলা করছিল। প্রথমে পা ফস্কে দীপু, আর তারপরে দীপুকে তুলতে গিয়ে ছোটন পুকুরের জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে। আর ঠিক সেই সময়ে বিশু ডাকঘরের দিকে যাবার বড়োরাস্তার ঘুরপথটাকে সংক্ষেপ করার জন্যে নালা ডিঙিয়ে পুকুরের ধারে এসে উঠেছিল। দুজনকে জল থেকে তুলে যখন বাড়ির মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় জয়াদি তখন রান্না নিয়ে ব্যস্ত। ঘটনাটা জানাজানি হবার পরের সোরগোল কাটবার পরে সেই দুপুরে জয়াদি তাকে শুধু মুখে ফিরতে দেয় নি। নিজের হাতে ভাত বেড়ে তাকে খাইয়েছিল। অবশ্য সেই প্রথম দিন বিশু জানতে পারে নি যে চারজনের জন্যে রান্না করা সমস্ত ভাত সে একাই খেয়ে উঠেছে আর হাড়সুদ্ধু মাংস চিবিয়ে খাওয়াটাও যে কারও কারও কাছে তাকিয়ে দেখার মতো ব্যাপার হতে পারে তাও সে জানত না। তারপরে জয়াদিরা মাত্র এক বছর ছিল। সেই এক বছরে বিশু আরো অনেক বার নিমন্ত্রণে বা বিনা-নিমন্ত্রণে জয়াদির হাতের রান্না খেয়েছে। শেষকালে একদিন মাস্টারমশাইকে চাকরির জন্যে ধরেছিল। মাস্টারমশাই হেসে বলেছিলেন, বিশু, তোমার জয়াদির রান্নার ঘটা দেখে তুমি হয়তো ভাবছ আমি চাকরি করি। আসলে তা নয়। বনদেশে শেয়ালরাজা হয়ে বসে আছি কিনা—তাই তোমার একটা ভুল ধারণা হয়েছে। আর বিশুর খাওয়াদাওয়া দেখতে জয়াদি মাঝে মাঝে বলত, বিশু, তোর বিয়ে হবার পরে

বউকে আমার কাছে কিছুদিন রেখে যাস, আমি রান্না শিখিয়ে দেব। বিশু মুখ নিচু করে থাকত, লজ্জায় মুখ ফুটে জয়াদিকে কোনো দিন বলতে পারে নি যে, জয়াদি, তার চেয়ে তুমি আমার এমন একটা ব্যবস্থা করে দাও যাতে আমার বউ হয়ে যে আসবে তাকে যেন দু-বেলা হাঁড়ি চড়বে কিনা এই দুশ্চিন্তা করতে না হয়। জয়াদির মুখের দিকে তাকিয়ে বিশুর মনে হত, জয়াদির কাছে কোনো রকম দুঃখকষ্টের কথা বলা চলে না।

বছরখানেক পরেই মাস্টারমশাই আবার বদলি হয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে আর জয়াদির সঙ্গে দেখা হয় নি। এমন কি জয়াদি মন থেকেও মুছে গিয়েছিল। অনেক দিন পরে সারাদিনের উৎকণ্ঠা ক্লান্তি আর খিদে আর এই বুকচাপা শহরটা জয়াদিকে আবার মনে পড়িয়ে দিয়েছে। আর সারাদিনের শেষে যখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হচ্ছে তখনই কিনা মনে পড়ল জয়াদিকে।

আর বিশু যতই জয়াদির কথা ভাবতে লাগল ততই যেন তার পা থেকে ক্লান্তি ঝরে গেল। তারপরে ময়দানের খোলা হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নেবার পরে সে নিজেকে এই ধিক্কারটুকুও দিতে পারল যে জয়াদিকে এতদিন তার মনে পড়ে নি কেন। তারপরে মস্ত পুকুরটার পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সে ভাবল, ছোটন আর দীপু নিশ্চয়ই এতদিনে মস্ত বড়ো হয়ে গিয়েছে। তারপরে রেলিংঘেরা কালো মূর্তিটা দেখে সে ভাবল, মাস্টারমশাইকে আজ আরেকবার চাকরির কথা বলবে, এখন তো আর তিনি বনদেশের শেয়ালরাজা নন। তারপরেও সে আরো অনেক কিছু দেখল আর অনেক কিছু ভাবল। শেষ পর্যন্ত তার মনে হতে লাগল যেখানে যা কিছু দেখছে সবাই জয়াদির কথা বা ছোটন ও দীপুর কথা বা মাস্টারমশাইয়ের কথা বলছে। বিশু জানত না যে যারা মন জুড়ে বসে তারা বাইরে থেকেও নানাভাবে ইশারা জানায়। আর এই কথাটা জানত না বলেই বিশু ভাবল, কলকাতার এই রাস্তাটা খুবই সুন্দর। বিশেষ করে এই রাস্তাটাই।

আর এই সুন্দর রাস্তাটাই শেষ পর্যন্ত তাকে জয়াদির বাড়িতে পৌঁছে দিল।

জয়াদি প্রথমে চিনতে পারে নি। দরজা খুলে দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কাকে চান? ঘরের আলো বিশুর মুখের ওপরে এসে পড়েছিল, তবুও জয়াদি চিনতে পারে নি।

বিশু বলল, জয়াদি, আমি। বিশু।

বিশু ভেবেছিল জয়াদি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে, অনুযোগের সুরে বলবে, এতদিন পরে তোর জয়াদিকে মনে পড়ল বিশু! কিন্তু তেমন কিছুই ঘটল না। জয়াদি এমন স্বরে কথা বলল যেন জয়াদি জানত বিশু ঠিক আজই আসবে। জয়াদি বলল, ভেতরে এসো।

বিশুর মনে হল, জয়াদি নয়, অন্য কেউ কথা বলছে। জয়াদি হলে তাকে বলত, ভেতরে আয় বিশু। বিশুর বুকের ভেতরটা আবার এই ভেবে ঢিপ্‌ঢিপ করতে লাগল যে হয়তো ভেতরে গিয়ে দেখবে, সত্যি সত্যিই জয়াদি নয়, অন্য কেউ।

ভেতরে এসে জয়াদি যখন আলোর নিচে দাঁড়াল তখনো বিশু তার চেনা জয়াদির সঙ্গে এই জয়াদিকে মিলিয়ে দেখতে চাইছে। শুধু চেহারার দিক থেকে জয়াদি নয়, চোখের চাউনির সেই জয়াদি, মুখের রেখার সেই জয়াদি, জয়াদি-ধরনের সেই জয়াদি।

জয়াদি বলল, তুমি অনেক বদলে গিয়েছ বিশু।

এবার বিশুও বলতে পারল, তুমিও অনেক বদলে গিয়েছ জয়াদি।

জয়াদি বলল, তাই বুঝি।

জয়াদি যদি বলত, বুড়ী হয়ে গেছি, না রে! তাহলে জয়াদিকে নিশ্চয়ই এখন যতটা বুড়ী-বুড়ী দেখাচ্ছে তা দেখাত না।

জয়াদি বলল, তোমার খবর কি বিশু, ভালো?

বিশু বলল, হ্যাঁ।

কী করছ আজকাল?

চাকরি খুঁজছি জয়াদি।

লেখাপড়া আর করলে না বুঝি?

না, ও আমার ধাতে পোষাল না।

জয়াদি আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বিশু তাকে থামিয়ে জোর গলায় হেসে উঠে বলল, জয়াদি তুমি যে আজকাল উকিল হয়েছ তা জানলে তোমার কাছে আসতাম না। এ যে রীতিমতো জেরা শুরু করলে দেখছি। আগে কিছু খেতে দাও। ছোটন আর দীপুকে দেখছি না যে?

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলতে পারবে বিশু নিজেও ভাবতে পারে নি। কিন্তু বলার পরেও যখন দেখল জয়াদির মুখে পাল্‌টা হাসি ফুটে উঠল না আর

শুনল যে জয়াদি অন্য কোনো কথা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে শুধু শেষ প্রশ্নের জবাবে বলছে, ছোটন আর দীপু পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে—তখন এখানে আসার জন্যে তার মনে এই প্রথম অনুতাপ দেখা দিল।

মাস্টারমশাই কোথায় জয়াদি?

মাস্টারমশাই! উনি বাড়িতে নেই।

তারপরে আর কি বলবে বুঝতে না পেরে বিশু বলল, আমি আজ উঠি জয়াদি।

এতক্ষণে যেন জয়াদির হুঁশ হল। প্রায় সেই আগের মতো গলার স্বর শুনতে পেল বিশু: বাঃ, বোসো, তোমার জন্যে কিছু খাবার বন্দোবস্ত করি। এতদিন পরে এলে!

বিশু চুপ করে রইল। চুপ করে ভাবতে লাগল, আগের মতো স্বরে সেও বলবে কিনা—আমি ভাত খাব জয়াদি।

মাস্টারমশাই কখন ফিরবেন জয়াদি?

মুখ তুলে দেখল, জয়াদি নেই, এত নিঃশব্দে জয়াদি সামনে থেকে চলে গিয়েছে যে সে টের পায় নি।

তারপরে কতক্ষণ পার হয়েছে বিশু খেয়াল করে নি। তার বুকের ভেতরটা আবার ঢিপঢিপ করছে। তার মনে এই ভয় ঢুকেছে যে জয়াদির কাছে খেতে চেয়ে সে হয়তো ভালো করে নি। কই, আগেকার মতো সে তো বলতে পারল না—আমি ভাত খাব জয়াদি।

কখন জয়াদি ফিরে এসেছে তাও সে টের পায় নি। ঠক করে শব্দ হতেই সে দেখল, জয়াদির একহাতে একটা প্লেটে দুটি সিঙ্গাড়া, আরেক হাতে এক পেয়ালা চা।

সিঙ্গাড়ায় কামড় বসিয়ে বিশু আবার বলল, তুমি সত্যিই বদলে গিয়েছ জয়াদি।

কোনো সাড়া না পেয়ে বিশু মুখ তুলে তাকাল। জয়াদি এবারেও আলোর নিচে দাঁড়িয়েছে বলেই স্পষ্ট দেখতে পেল জয়াদির চোখদুটো চিকচিক করছে। তখন বিশু বলল, জান জয়াদি, আজ আমি ইচ্ছে করেই তোমার কাছে ভাত খেতে চাই নি। আজ আমার পেটটা ভরা আছে কি না। তুমি কিছু মনে করো না, আরেক দিন এসে পেট পুরে ভাত খেয়ে যাব।

এই বলে বিশু মাথা নিচু করে সিঙ্গাড়া খেতে লাগল। বুকের ভেতরটা

টিপটিপ করছে। মাথা তুললেই হয়তো সে দেখতে পাবে, জয়াদির চোখের সেই চিকচিকে ফোঁটা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। জয়াদির হাসিমুখটুকুই সে শুধু দেখতে চায়। এই চিকচিকে ফোঁটাগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে শেষ হবার পরে জয়াদি আবার যখন হাসবে তখন মুখ তুলে তাকাবে সে।

বাইরে বেরিয়ে আসার সময় বিশু জিজ্ঞেস করল, মাস্টারমশাই কখন ফিরবেন জয়াদি?

জয়াদি চুপ করে রইল।

কাজে বেরিয়েছেন বুঝি?

জয়াদির মুখে তবুও কথা নেই।

জয়াদি, কী হল তোমার?

তখন জয়াদি বলল, তোর মাস্টারমশাইয়ের কোনো খোঁজ পাচ্ছি না বিশু। মাস্টারমশাইদের ব্যাপার তো কাগজেই পড়েছিস। অন্য সবাই যেদিন কাজে যোগ দিয়েছিল সেদিন তোর মাস্টারমশাইও যায় কিন্তু তারপর আর ফিরে আসে নি। শুনছি তোর মাস্টারমশাইয়ের নাকি শাস্তি হয়েছে। কোথায় কোন্ কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিয়েছে তা কেউ বলতে পারছে না।

আমাকে এতক্ষণ বলো নি কেন জয়াদি?

এতক্ষণ পরে জয়াদি হাসল। আলোর দিকে পেছন ফিরে থাকা সত্ত্বেও সেই হাসিটুকু দেখতে পেল বিশু। আর তারপরে সেই হাসিটুকু মুখে রেখে একটু উঁচু হয়ে বিশুর কাঁধে একটা হাত রেখে জয়াদি বলল, তুই মস্ত বড়ো হয়ে গিয়েছিস বিশু। আগে বুঝতে পারি নি।

আর তখন বিশু টের পেল, তার বুকের ভেতরটা আবার টিপটিপ করছে, ভয়ে নয়, আনন্দে।

মিসেস গ্রীন



নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বাই-ইলেকশন উপলক্ষে অস্থায়ী চাকরি। মাইনেও সামান্য। কিন্তু তাই বলে ঝামেলা সামান্য নয়। হঠাৎ সরকারী আদেশ এসেছে যাঁরা পার্লামেন্টে প্রতিনিধি পাঠাবেন সেইসব ভোটদাতা-ভোটদাত্রীদের ফোটো তুলতে হবে। ক্যামেরাম্যানকে সঙ্গে নিয়ে আমরা শহরভরে লোকের ফোটো তুলে তুলে বেড়াই। তারপর অফিস থেকে হুকুম হল শুধু ফোটো তুললেই চলবে না, তা যে আসল মানুষের প্রতিকৃতি নকল মানুষের নয়, ভোট দেবার লোভে একজন যে আর একজনের পরিচয় দিয়ে ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়ায় নি সে সম্বন্ধেও সংশয়-হীন হওয়া চাই। আমার সহকর্মী অবেন্দু সান্যাল যেসব ফোটো তুলেছে সেগুলি চেক করবার ভার পড়ল আমার ওপর। কলকাতা শহরে যে এত জাত এত বর্ণ আর এত রকমের পেশার মানুষ আছে এ কাজে না নামলে আমি তা জানতে পারতাম না। অবশ্য কাগজপত্রেও এসব তথ্য পেয়েছি। কিন্তু রাশ রাশ তথ্যের ওপর কয়েক মিনিটের মধ্যে চোখ বুলিয়ে যাওয়া এককথা আর সেই তথ্য যে সব সত্যিকারের মানুষের মূর্তি ধরে রয়েছে তাদের মুখোমুখি দাঁড়ানো সম্পূর্ণ আর এক ব্যাপার। মুখোমুখি দাঁড়ালেই কি আমরা প্রত্যেককে দেখতে পারি? আমি গত তিন সপ্তাহে অন্তত কয়েকজন নারী-পুরুষের সামনে গিয়েছি, তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, ফোটো তুলেছি, আসল চেহারার সঙ্গে মিলিয়েছি কিন্তু ক'জনের মুখ আমার

মনে আছে, ক'জনের সুখ-দুঃখের বিন্দুমাত্র অংশও জানবার জন্যে আমার কৌতূহল হয়েছে? হয় নি। আমি যে কাজের জন্যে গিয়েছি যত কম সময়ের মধ্যে সে কাজ সেরে আসতে পারি তাই ছিল আমার লক্ষ্য। আবার অন্যদিকে বেশির ভাগ গৃহস্থই আমার কাজকে অপ্রয়োজনীয় আর অবান্তর বলে মনে করেছেন। বিরক্ত আর বিরস মুখে তথ্যের জোগান দিয়েছেন। কেউ বা 'এখন ব্যস্ত আছি এখন হবে না' বলে মুখের ওপর দোর বন্ধ করে দিতেও সংকোচবোধ করেন নি। ফোটো তুলতে গিয়ে কত অচেনা মানুষের জীবনের টুকরো ছবি এক পলকের জন্যে দেখে নিয়েছি, কত অচেনা কণ্ঠের দু-একটি মিষ্টি কথা চকিতে শুনে ফেলেছি। ছেলেদের খেলনা বায়োস্কোপের ছবির মতো সব টুকরো টুকরো ছেঁড়া ছেঁড়া দৃশ্য। যেন কোনো সঙ্গতি নেই, পারম্পর্য নেই। ক্রোধ হিংসা, বাসনা ভালোবাসা, স্নেহ-মমতার সব টুকরো টুকরো ছবি।

সেদিন সন্ধ্যায় মিসেস গ্রীনের বাড়িতে গিয়েও এমনি একটি ছবি দেখে এসেছিলাম। মনে হয় চাকরি যতই অস্থায়ী হোক ঘটনাটি আমার স্মৃতিতে চিরদিনের জন্যে স্থায়ী হয়ে রইল।

সেদিন বিকেলে ভবেন্দুর তোলা ফোটোগুলি ভেরিফাই করবার জন্যে বেরিয়েছিলাম। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পাড়া। ইলিয়ট রোড আর ম্যাকলিওড রোডের প্রায় প্রত্যেকটা বাড়ির কড়া নেড়ে নেড়ে গৃহস্থের শান্তিভঙ্গ করলাম। অবশ্য বেশির ভাগ গৃহীকেই বাড়িতে পাওয়া গেল না। শনিবারের সন্ধ্যা। বাইরের আনন্দ-উৎসব নিয়েই বোধহয় সবাই এখন ব্যস্ত। ঘরের কথা মনে পড়বে আরো পরে।

তবু এরই মধ্যে ইলিয়ট রোডেরই একটা বাড়িতে পুরো একটি পরিবারকে পাওয়া গেল। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পরিবার। বাড়ির কর্তা-গিন্নী আর তাঁদের যুবক ছেলে তরুণী মেয়ে সবাইর সঙ্গে দেখা হল। প্রত্যেকের নাম আর চেহারা মিলিয়ে দেখলাম। বাড়িতে সবাই ভোটদানের অধিকার পেয়েছে। শুধু সাত-আট বছরের দুটি ছেলেমেয়ে ছাড়া। আমার হাতে তাদের ফোটো নেই কেন তারা জিজ্ঞেস করতে লাগল। আমি হেসে বললাম, 'এর পরে যেবার আসব তোমাদের ফোটো তুলে নেব।'

আরো দু-তিনটি বাড়ির রুদ্ধ দরজায় ঘা দিয়ে সাড়া পেলাম না। এর মধ্যে আর একটি মাত্র বাড়ি বাকি। তাহলেই আজকের মতো পাট শেষ।

শেওলাপড়া দেওয়ালের পাশ দিয়ে সরু গলিটা সাপের মতো এঁকে-বেঁকে পুরনো একটি একতলা বাড়ির দরজায় এসে থেমেছে। আমি কড়া নেড়ে নেড়ে সেই বাড়ির স্তব্ধতা ভাঙতে চেষ্টা করলাম।

একটু বাদেই কুকুরের ডাক শুনতে পেলাম। প্যাসেজে আলো জ্বলে উঠল। দরজা খোলার শব্দ হল। একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর বাস্তরক্ষী রোগাটে কুকুরটা তখনো ঘেউ ঘেউ করছে। আমি ভয় পেয়ে দু-পা পিছিয়ে গেলাম। মহিলাটি তাঁর কুকুরকে ধমক দিলেন, 'Behave yourself, Jack.'

জ্যাক নীরব হলে আমি একটু আন্দাজেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'Are you Mrs. Green ?'

মহিলাটি খুশি হয়ে বললেন, 'Yes, yes, please come in, come in।'

মিসেস গ্রীনের আমন্ত্রণে বেশ আগ্রহ আছে লক্ষ্য করলাম। এর আগে যে বাড়িগুলিতে গিয়েছি সেসব জায়গার আহ্বান হৃদ্যতায় এত উষ্ণ ছিল না। আমি একটু খুশি হয়েই তাঁর পিছনে পিছনে এগোলাম।

মহিলাটির বয়স হয়েছে। তা সত্ত্বেও তিনি দেখলাম চড়া প্রসাধনের পক্ষপাতী। ঠোঁট দুটি গাঢ় রক্তবর্ণের লিপস্টিকে উজ্জ্বল। মুখে রুজ পাউডারের পুরু প্রলেপ। গলায় সাদা পুঁতির মালা। মুক্তার মতো দেখতে। কানেও সাদা পাথরের ফুল। ডান হাতের আঙুলে গোটা-তিনেক আংটি। একেকটি পাথরের একেক রঙ। মহিলাটির বর্ণবিলাস তাঁর পোশাকেও লক্ষ্য করলাম। গাঢ় সবুজবর্ণের গাউন পরেছেন। পোশাকের ঊর্ধ্বাংশের ছাটকাটে কোনো সমতা নেই। যতখানি পেরেছেন ছেঁটে ফেলে দিয়েছেন। বাহুদুটি অনাবৃত। বুকের দুদিকের দুটি বিপুল স্তূপও যেন আবরণের আড়ালে থাকতে রাজী নয়। তাঁর এই দেহসৌষ্ঠব আমি যে একনিমেষেই সব দেখে ফেলেছিলাম তা নয়, তাঁর ড্রয়িংরুমে বসে আলাপ করতে করতে ধীরে ধীরে লক্ষ্য করেছিলাম।

প্রথম ঘরটিই বসবার ঘর। মেঝেয় গালিচা পাতা। সোফা-কোচে ঘরমতো সাজানো। ছোট একটা টিপয়ের ওপর একটি অ্যাশট্রে। মুখোমুখি বসবার জন্যে দুদিকে দুখানি সোফা।

পর্দার আড়ালে আর একটি ঘরের আভাস। বোধহয় শোবার ঘর। মিসেস গ্রীন আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন : 'Please sit down।'

তাঁর হাসির মধ্যে দৃষ্টির মধ্যে বেশ একটু মাদকতা আনবার চেষ্টা দেখে আমার অস্বস্তি লাগতে লাগল। আমার মতো চব্বিশ বছরের যুবককে এই প্রৌঢ়া মহিলাটি কেন তাঁর হাসি দিয়ে আর বিলোল কটাক্ষ দিয়ে ভুলাতে চাইছেন। তরুণী মেয়েরা আরো কত মধুরভাবে তাকাতে পারে আরো কত সুন্দরভাবে হাসতে পারে তা তো আর আমার একেবারে অদেখা নেই।

মিসেস গ্রীন আঙুল দিয়ে যে সোফাটা আমাকে দেখিয়ে দিলেন আমি সেটা এড়িয়ে গেলাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওই সোফায় বসলে মিসেস গ্রীনের মুখোমুখি বসতে হবে। আমার তা ইচ্ছা নয়। ওঁর মুখ থেকে সস্তা মদের গন্ধ বেরোচ্ছে বলেই যে এই আপত্তি তা নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে ওঁর হাবভাব ক্রমেই বিসদৃশ হয়ে উঠছে। আমি যেন অপরিচিত অতিথি নই, ওঁর বহুদিনের চেনা বন্ধুগোষ্ঠীর একজন।

কিন্তু ছোটো সোফাটা বাদ দিয়ে লম্বা কোচটার ধারঘেঁষে আমি একটু নিরাপদ দূরত্বে বসতে গিয়ে বিপত্তি ঘটালাম। ফার্নিচারটা ক্যাঁচ কাঁচ করে প্রতিবাদ করে উঠল। আর আমাকে যেন ক্রমেই নিচের দিকে টানতে লাগল। আমি পড়ে যেতে যেতে উঠে দাঁড়ালাম। আমি অপ্রস্তুত। মিসেস গ্রীনও অপ্রতিভ। কাউকে পড়ে যেতে দেখলে মানুষ হাসে। কিন্তু তাঁর মুখে একটু যেন আশঙ্কার ভাবই ফুটে উঠল।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে করুণভাবে বললেন, 'Why Baboo, take that seat, I request you to take that one।'

তাঁর করুণ দশা দেখে এবার আমারই একটু হাসি পেল। আধা-সংশয়ে স্বরে জিজ্ঞাসা করলাম, 'But is that alright ?'

তিনি আমাকে ভরসা দিয়ে বললেন, 'Yes, Baboo. It is alright. It is as good as a new thing. Please take that one।'

আমি এবার এগিয়ে সেই ছোটো সোফাটা দখল করলাম। যা ভেবেছিলাম তাই। তিনি এসে সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনের আসনে বসলেন। মাঝখানে ছোটো একটা টিপয়ের ব্যবধান। এ ব্যবধান ব্যবধানই নয়।

মিসেস গ্রীন এবার তাঁর সিগারেটের টিন খুলে ধরলেন, হেসে বললেন, 'Please !'

সিগারেট আমি কখনো-সখনো খাই। কিন্তু ওঁর হাত থেকে সিগারেট নিতে আমার ইচ্ছা করল না। বললাম, 'Thank you. I don't smoke'

মিসেস গ্রীন পরম কৌতুকে খিলখিল করে হেসে উঠলেন, 'My God ! Young man. You don't smoke at all ! How funny ! Or, you are a shy boy ! I have seen lots. They are shy in the begining।'

আমি তাঁর কথাবার্তার ধরন আর সুর শুনে স্তম্ভিত। বুঝতে পারছি কোথায় আমি এসেছি কার কাছে এসেছি। কিছুই আমার টের পেতে বাকি নেই। এবার উঠতে পারলে বাঁচি। কিন্তু উঠি কী করে। তিনি তাঁর সোফাটাকে আর একটু যেন টেনে আনলেন, তারপর হেসে বললেন, 'Don't get nervous Baboo. Sit comfortably, talk freely with your full heart. Take me as your friend।'

আর তো দেরি করা ঠিক নয়। আমি গম্ভীরভাবে আমার ব্যাগ খুলে ফেললাম। প্রৌঢ়া নারীর ফোটোটি তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম, 'Mrs. Green ! Is this your photograph ?'

তারপর তাঁকে বুঝিয়ে বললাম আমি সরকারী কাজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

মিসেস গ্রীন যেন মুহূর্তের মধ্যে নিভে গেলেন। লজ্জা দুঃখ নৈরাশ্য তাঁর মুখের সমস্ত লিপস্টিক রুজ পাউডারের প্রলেপ ছাপিয়ে ফুটে বেরোল।

ফোটোখানা আর একবার দেখে নিয়ে তিনি আস্তে আস্তে বিষণ্ণ স্বরে বললেন, 'Yes, young man, it is mine. I can't deny it. But look there. That was also mine।'

তাঁর আঙুলের সংকেতে আমি দেয়ালের দিকে তাকালাম। দেয়ালভরে মিসেস গ্রীনের যুবকবন্ধুদের বাঁধানো ফোটো। স্যুটপরা সব সাহেব। গ্রুপ ফোটো, আলাদা ফোটো সবই আছে। একখানি ফোটোতে তরুণী মিসেস গ্রীন বড়ো একটা ফুলের তোড়া হাতে হাসছেন। বেশ দেখাচ্ছে। তিনি নিজেই যেন একটা ফুলের তোড়া হয়ে গেছেন।

ফোটোখানা মিসেস গ্রীন আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'Take your photo Baboo. It is time. Time's cruel performance।'

আমি মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইলাম। আমার এই প্রথম যৌবনেও সেই কঠিন কালের পরম নির্মমতা আমি অনুভব করতে লাগলাম। এই ঘরের ছেঁড়া গালিচায়, ভাঙা কোচে, পালিশহীন ফার্নিচারগুলিতে, এই রঙচটা অ্যাশট্রেটায় সেই কালের ছাপ। এ ঘরের অধিবাসিনীর কলপ-দেওয়া চুলে,

বাঁধানো দাঁতে, বাসনার নিষ্ফল জ্বালায়, বাতিল হয়ে যাওয়ার পরেও বেঁচে থাকবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টার মধ্যে আমি কালের সেই কালো আতঙ্কের ছায়া দেখতে পেলাম।

হঠাৎ এই প্রৌঢ়া বারনারীর ওপর আমার মন গভীর সহানুভূতিতে ভরে উঠল। মিসেস গ্রীনের কী দোষ! তাঁর তো কোনো দোষ নেই।

আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমার উঠে যেতে মন সরল না। ভাবলাম দু-একটা সান্ত্বনার কথা আমার বলে যাওয়া উচিত। অন্তত অন্য দু-একটি প্রসঙ্গ নিয়ে একটু আলোচনা করে যাওয়া ভালো। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ইলেকশনের কথা আমার মনে পড়ে গেল। রাতদিন এই কাজ নিয়ে আছি অথচ এ প্রসঙ্গ খুঁজে আনতে এত দেরি হল আমার।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'Well, Mrs. Green. Are you interested in this election ? You are a voter !'

মিসেস গ্রীন বললেন, 'Oh, yes, yes !'

মিসেস গ্রীন হয়তো ততখানি উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু আমি যে তাঁর সঙ্গে কথা বলায় খুশি হলেন আর আমাদের উপনির্বাচন সম্বন্ধে কৌতূহল দেখাতে লাগলেন। মিসেস গ্রীন নিরক্ষরা নন। কাগজপত্র পড়েন। খুঁটে খুঁটে না হোক ছোটো-বড়ো শিরোনামাগুলির ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যান। আমি তাঁর তথ্যের তৃষ্ণা আর একটু ভালো করে মেটাতে লাগলাম। নির্বাচনে কোন্ কোন্ পার্টি দাঁড়িয়েছে, কার কী আদর্শ, কর্মসূচী, কোন দলের ক্যাণ্ডিডেটের কী নাম, কী পেশা, কারই বা কতখানি খ্যাতি প্রতিপত্তি তাই নিয়ে আলোচনা করতে লাগলাম। মিসেস গ্রীনও দেখলাম কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। তিনি নিজেও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমার জবাবগুলিও বেশ উৎসাহ নিয়ে শুনতে লাগলেন। যেন আমার কাছে তিনি অন্য কোনো প্রত্যাশা করেন নি। নির্বাচন ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো ব্যাপারেই যেন তাঁর আর কোনো আসক্তি নেই। তাঁর এই আগ্রহের সবটুকুই যে অভিনয় তা আমার মনে হল না। যে ভুলটুকু তিনি করেছিলেন তা শোধরাবার এবং ঢাকবার সুযোগ পেয়ে তিনি সত্যিই খুশি হয়ে উঠলেন।

ক্রমে আমারও আর সংকোচ রইল না। অস্বস্তির ভারও দূর হল। আমার মনে হতে লাগল আমরা একই কালের মানুষ, একই নগরীর বাসিন্দা। আমি নাগরিক, তিনি নাগরিকা।

তিনমাস ধরে সকলে জানে দুর্গাবতী আর বাঁচবে না। দুর্গাবতীর দুই ছেলে, ছেলে-বৌ, এক বিবাহিতা মেয়ে আর স্বামী বদ্যিনাথ বর্তমান। গত দু বছর যাবৎ একটু একটু করে সে অথর্ব হয়ে পড়ছিল। গত পুজোর পরই সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে যায়। কিছুদিন ভুগে খাড়া হয়ে ওঠে। আবার পড়ে কলতলায়, সেই থেকে শয্যাশায়ী। এর ওপর আছে শরীরের নানান রোগ। কোবরেজমশাই পাড়ার লোকের কাছ থেকে দর্শনী নেন না, তাকে জানা হয়েছিল, বলে গেছেন, এই শেষশয্যা।



মতি নন্দী

বদ্যিনাথের সংসার

বদ্যিনাথ ফিরছে কোবরেজখানা থেকে। ন বছর আগে সে অফিস থেকে রিটায়ার করেছে। সেই থেকে শরীর ভেঙে যাচ্ছে। এখন বয়স প্রায় সত্তর, কিন্তু খাটা-খাটুনিতে দড়। আজন্ম তাকে খাটতে হয়েছে, উন্নতির ফিকির-ফন্দী খুঁজতে হয়েছে, বাগাতে হয়েছে। এজন্য সৎ-অসৎ পথের বিচার করলে চলে না, বদ্যিনাথ তা করেও নি। করলে ঝরঝরে বাড়িটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ত পঁচিশ বছর আগেই, বাড়িতে ইলেকট্রিক, রেডিও, চাকর-বামুনও থাকত না; ছেলেদের মানুষ করা, মেয়ের বিয়ে উকিলের সঙ্গেও দেয়া হত না। বদ্যিনাথের ধারণা মানুষের মতো মানুষ হয়েছে তার মেজ ছেলে বঙ্কুবিহারী

লেখাপড়া না শিখলেও ব্যবসায় মাথা আছে। মাথা খাটিয়ে গাড়ি-বা করেছে। তিনটে বাড়ি থেকে আয় হয় মাসে সাড়ে আটশো টাকা।

বঙ্কিনাথের সংসার আস্তে আস্তে উন্নতি করেছে এখন যে রাস্তাটা দি হাঁটছে সেটার মতোই। গলিটা কুড়ি বছর আগেও ছিল মাটি আর খোয়া এখন পিচ আর পাথরের। চার বছর আগে গ্যাসবাতিগুলো ইলেকট্রি হয়েছে। টেলিফোনের তার মাটির নিচে দিয়ে গেছে। এসব বঙ্কিনাথের আনন্দ হয়েছে, ছোট ছেলে কুঞ্জবিহারীর স্কুল-ফাইনাল পাশে আনন্দ পেয়েছে। এ বংশে কুঞ্জই প্রথম। কিন্তু বড়বাজারের ব্যবসায়ীর মেয়ের সঙ্গে বঙ্কুবিহারীর বিয়েতে তাঁর আনন্দ সব কিছুকে ছাপি গিয়েছিল কিনা এ কথা শুনলে বঙ্কিনাথ এই বয়সেও থতমত খাবে। এই অবস্থাই হবে যদি বলা যায়, তাঁর বড় ছেলের মৃত্যুতে সে বেশি শো পেয়েছিল না বায়না দিয়েও মিত্তিরদের বাড়িটা হাতছাড়া হওয়াতে।

চলতে চলতে বঙ্কিনাথ হঠাৎ থামল। অনেক দূরে কে যেন হেঁকে অনেকটা 'শিল কোটাবে গো'-র মতো। শিলটা কুটিয়ে নেওয়া দরকার, বৌমা পরশুই সে কথা বলছিল। কানখাড়া করে বঙ্কিনাথ দাঁড়িয়ে রই আর একবার শোনার জন্য আর সেই সময়ই রাস্তার কচি-কাঁচা চেঁচামেচি শুরু করল। বঙ্কিনাথের মনে হল ধরে ধরে চড় কষায় এদে বাপ-মাকে। দিন রাত খালি রাস্তায়, আঁস্তাকুড় ছুঁচ্ছে, এটা-ওটা তুলে অপকর্ম কচ্ছে আর চীৎকার।

বঙ্কিনাথ ধমক দিল। ফল হল। মস্ত লম্বা, পাকাচুলওলা একটা চোখ পাকাচ্ছে দেখে বাচ্চারা হুট-সাট মিলিয়ে গেল। দূরের ডাকটা শোনা গেল না কিন্তু এ ব্যাপারটাও মন্দ লাগল না বঙ্কিনাথের।

মোড় ঘুরেই আনন্দ মোহনের জানলাটা। চেয়ারটা খালি, অন্ধকার-অন্ধকার, যতদূর চোখ যায় কেউ নেই। বঙ্কিনাথ গলা খাঁ আনন্দমোহনের নাতি উঁকি দিল। একটু পরেই প্রায় হামাগুড়ি আনন্দমোহন ভিতর থেকে এল। খালি গা, পরণে ধুতি, লিকলিকে হা চেয়ারের হাতল ধরে উঠে দাঁড়াল। হাঁপাচ্ছে।

"কোথায় গেছলে ?"

"পায়খানা, কাল থেকে আবার শুরু হয়েছে, বৌদি, কেমন ?"

বঙ্কিনাথ হাতের মোড়ক তুলে দেখাল।

"ওসবে হবে না, বড় ডাক্তার দেখাও।"

"দেখানো তো হয়েছিল, কোনো ফল হয় নি। যে যাবার সে যাবেই।"

"তা বটে।"

চেয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে আনন্দমোহন গা ছেড়ে দিল। ধপ করে চেয়ারের মধ্যে শরীরটা পড়ল। এ দৃশ্য দেখতে বঙ্কিনাথের মজা লাগে।

"খাচ্ছ কি এখন ?"

"কি আবার, বার্লি, লেবুর জল।"

"বুড়ো বয়সের অসুখ, ও তো আর সারে না।"

বঙ্কিনাথের কথার সুরে একটু-আধটু মজা পাওয়ার রেশ রয়েছে। আনন্দমোহন সেটুকু বুঝল। ঝুঁকে নিচু সুরে বলল, "মনে আছে উমেশ জ্যাঠাজিকে, রকে বসে গপ্পো করতে করতে বলল শরীরটা খারাপ-খারাপ লাগছে। সন্ধেয় বাড়ি ফিরল, রাতে টেঁসে গেল। আমিও যাব, তুমিও বুড়ো হয়েছ মনে রেখ।"

"আমার কোনো অসুখ-বিসুখ নেই।"

"পঞ্চাননেরও ছিল না, তবু তো গেল।"

"ছিল, ব্লাডপ্রেসার।"

"অতুল, কাকার ?"

"খেতে পেত না তাই, আমার সে ভাবনা নেই।"

আনন্দমোহন চেয়ারে নড়েচড়ে যুত হয়ে বসল। বঙ্কিনাথ রেগেছে।

"ভেতরে এস না। এ বয়সে দাঁড়ান পোষাবে কেন ?"

তা ঠিক। বঙ্কিনাথের কষ্ট হচ্ছে বটে কিন্তু এখন তা স্বীকার করা যায় না। বলল, "না, ভেতরে যাব না, গিয়ে ওষুদটা খাওয়াতে হবে।"

"তাহলে যাও। কিন্তু বৌদি কেমন আছে সে কথাটা তো বললে না ?"

দু'পা গিয়েছিল বঙ্কিনাথ, ফিরে এল, "বললুম তো আশা নেই।" একটু থেমে জুড়ে দিল, "শেষ দিকে ওকেও তোমার মতো হামা দিয়ে চলতে হত।"

এরপর বঙ্কিনাথ একদমে বাড়ি পৌছল। বাজার এসেছে। দালানে আনাজ কুটছে বড় বৌমা। বিয়ের ছ মাস পরেই ন্টুবিহারী মারা যায়। আজ থেকে কুড়ি বছর আগের কথা। ছেলেপুলে নেই, কাঁচা বয়সের রাঁড়। বঙ্কিনাথ চোখে চোখে রাখত। শেষে বুঝল মেয়েটা ভালো, তবে নোলাটা একটু বেশি। তাতে বঙ্কিনাথ কিছু মনে করে না। মেয়েমানুষের নোলা

থাকবে এ আর এমন বেশি কি! বড় বৌমাকে সে ভালবাসে, শ্বশুরকে টক-ঝাল এটা-সেটা লুকিয়ে খেতে দেয়।

আনাজের চুবড়িতে চোখ রেখে ওষুধের পুরিয়া কটা বড় বৌমার হাতে দিয়ে বলল, "তিন বেলা দেবে মধু, বাসকপাতার রস দিয়ে। মকরধ্বজ যেমন চলছে চলবে আর ওটা কি বৌমা?"

বস্তিনাথের আঙুলের লক্ষ্য অনুযায়ী বড় বৌমা চুবড়ি থেকে কলম্বা লেবুটা তুলে দেখাল।

"আমি ভেবেছিলুম বিলিতি আমড়া। কুঞ্জ কোথায়?"

"ওপরে।"

কুঞ্জবিহারী পদ্য লেখে। কাগজে ছাপাও হয়। বস্তিনাথ একবার জিজ্ঞাসা করেছিল, ওতে পয়সা-কড়ি কেমন পাওয়া যায়। যায় না শুনে আর গা করে নি। একদিন বিকেলে বিনোদ মুখুজ্যের রকে বসে বস্তিনাথ গল্প করছিল, হঠাৎ বিনোদ বলল, "তোমার ছোট ছেলে নাকি ভাল লেখেটেখে।"

"কি করে জানলে?"

"অসীম বলছিল, বেশ নামটাম নাকি হয়েছে। ওদের একটা কাগজ আছে সেখানেও ছাপা হয়েছে।"

অসীম বিনোদ মুখুজ্যের সেজো জামাই। প্রফেসরী করে। রকে আরো জন-তিনেক ছিল। শুনে বস্তিনাথের বুকের মধ্যে একদলা বাতাস আকুপাকু করে উঠেছিল। পাড়ার মধ্যে মুখুজ্যেরাই বনেদী ঘর। নাম ডাক খাতির আছে। কিন্তু কাগজে তো আর নাম বেরোয় না। সেইদিন থেকে বস্তিনাথ ছোট ছেলেকে সমীহ করতে শুরু করেছে। টাকা হয়েছে, গাড়ি বাড়িও হয়েছে, নামও হল। তাতে পয়সা নাই আসুক। ঠিক করেছে কুঞ্জকে ব্যবসায়ে ঢোকাবে না। ওর মাথাটা অন্য ধরনের।

দোতলায় কুঞ্জর আলাদা ঘর। ঘরটা ছিল না। কর্পোরেশনকে কলা দেখিয়ে রাতারাতি বানিয়ে দিয়েছে। একদিন কলেজ ফেরত কুঞ্জ একটি মেয়েকে এনে ঘরে বসে ঘণ্টা দুই গুজগুজ ফুসফুস করল। বস্তিনাথের ভাবনা হয়েছিল। বড়বৌমার কাছে শুনল, স্বজাতি। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেও বলেছিল, 'টিউশুনি করে পড়ার খরচ চালাক আর যে করেই চালাক, এটা কিন্তু ভাল নয়। বারটান হয়, ঘর সংসারে মন বসে না।' মেয়েটি আর আসে নি। তবু বস্তিনাথের অস্বস্তি কাটে নি।

কুঞ্জর ঘরে পরদা। গলা খাঁকিয়ে বস্তিনাথ ঢুকল। সিগারেটের গন্ধ আর কুঞ্জর বিরক্ত মুখকে অগ্রাহ্য করে বস্তিনাথ বলল, "গিয়ে অঞ্জুকে নিয়ে আয়, মার সঙ্গে দেখা করে যাক।"

"যাবার দরকার কি, জামাইবাবুকে ফোন করে দি, কোর্টে যাবার সময় দিদিকে পৌঁছে দিয়ে যাক।"

"সেটা ভাল দেখায় না, তুই নিজেই যা, বঙ্কু ফিরলে গাড়িটা নিয়ে যাস।"

বস্তিনাথ ঘর থেকে বেরিয়ে মেজবৌয়ের খোঁজ করল। মেজবৌ তখন শাশুড়ীর ঘরে। বস্তিনাথ ঘরে ঢুকল না, ইশারায় ডাকল।

"কি বলছেন?"

"ইতুন, নিতুনকে আনতে গেছে নীলু?"

"নীলুকে তো লণ্ড্রীতে পাঠানো হয়েছে, আপনার ছেলের পাঞ্জাবিটা এখনো দেয় নি তাই খোঁজ করতে গেছে।"

"পইপই করে বলেছি ও হারামজাদাকে অত বাইরে পাঠাবে না, আড্ডা জমিয়েছে কোথায় এখন দেখ।"

বস্তিনাথ রাগ করে নিজেই বেরোল দুই নাতনীকে স্কুল থেকে আনার জন্য। বড়টির বয়স তেরো। সঙ্গে লোক ছাড়া ওদের স্কুলে যাতায়াতে মানা সে-ই করে দিয়েছে। ভয় গাড়িঘোড়াকে নয়, ওদের বয়সকে।

আনন্দমোহনের জানলার সামনে দিয়ে যাবার সময় বলে গেল, "যাচ্ছি ইস্কুল থেকে ওদের আনতে। নবাবনন্দিনী সব, একা-একা আসতে পারেন না।"

বলে বস্তিনাথ খুশি হল। মুখুজ্যেবাড়ির মেয়েরা ইস্কুলের বাসে যেত। ওরা বনেদী ঘর। বঙ্কুকে একবার বলেও ছিল, বাসওলা-স্কুলে মেয়েদের ভর্তি করাতে। আধা-সাহেবী এক ইস্কুলে মেয়েদের ভর্তি করাতে নিয়ে গিয়ে গোমড়ামুখে বঙ্কু ফিরে এসে বলেছিল, "গোবরভরা মাথা, ভর্তি হবে কি?" শুনে বস্তিনাথ মাস্টার রেখেছে। ছোকরা মাস্টার, তাই কদিন চোখে চোখে রেখেছিল। পরে অবশ্য বুঝেছে যে ছেলেটা সত্যিই ভদ্রঘরের। ট্রাম রাস্তার ওপরেই স্কুল। পার হবার জন্য বস্তিনাথ দাঁড়াল—অফিস-যাত্রীদের ভিড় এখনো কাটে নি। বাসস্টপে লোকটি হাত দেখানো সত্ত্বেও বাসটা দাঁড়াল না, শুধু একটু গতি কমিয়ে দিল মাত্র। লোকটি ছুটে উঠতে গেল। হা-হা করে বস্তিনাথ হাত বাড়িয়ে বাধা দিতে গেল। তাঁর

আঙুলগুলো লোকটির পাশের পকেটে লাগতে টান পড়ায় বাসে উঠতে পারল না। পকেটের সেলাইও খানিকটা ছিঁড়ে গেল। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল লোকটি। বষ্ঠিনাথ অপ্রস্তুত হয়েও ভারিক্কী স্বরে বলল, "আপিসে না একটু দেরিই হল তাই বলে প্রাণটা খোয়াবেন ?"

"সে জন্য আপনার অত মাথাব্যথা কিসের ? জামাটা যে ছিঁড়ল তার দাম দেবেন ?"

বষ্ঠিনাথ সাবধান হল। দামের কথা এসে গেছে। এক গাল হেসে বলল, "বুড়ো মানুষ বাবা, ওভাবে উঠতে যাচ্ছিলে দেখে ভয় করল তাই। তুমি ছেলের বয়সী, অপরাধ নিও না। আমার ছেলেও তো ওভাবে বাসে ট্রামে ওঠে।"

লোকটি ভিজে চুপসে গেল যেন। বষ্ঠিনাথ নিজেকেই তারিফ করল। বেশ জব্বর করে বলা গেছে।

রাস্তা পার হল বষ্ঠিনাথ। সামনের বাড়ির বারান্দার দিকে একবার তাকাল। এটা তার কাঁচা বয়সের অভ্যাস। তখন অফিস-টাইমে মেয়েরা প্রায় আদুড় গায়ে দাঁড়িয়ে থাকত। সন্ধ্যে থেকে দরজায় বিড়ি-সিগারেট মুখে দিয়ে। অফিস যাওয়া এবং ফেরার সময় বষ্ঠিনাথ তাকাত। অভ্যাসটা আজও রয়ে গেছে। অবশ্য উপরতলায় এখন একটা হোটেল হয়েছে আর নীচে, রাস্তার কুড়োনো কাগজের গুদাম।

দুই নাতনী স্কুলের গেটে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের নিয়ে ফেরবার সময় বষ্ঠিনাথ অলিগলি দিয়ে ফিরল। বড় রাস্তায় এ সময়টায় ছেলে-ছোকরারা দাঁড়িয়ে থাকে। পাড়ার গলির মুখে এসে নাতনী দুজনকে ছেড়ে দিল বৈদ্যনাথ। বন্ধুর পাঞ্জাবিটা কেন পাওয়া যায় নি সেজন্য পশুপতির লণ্ড্রীতে এখন তাকে যেতে হবে।

পশু নেই, জামা ইস্ত্রি করছিল কর্মচারী। বষ্ঠিনাথ প্রথমে নরম সুরে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু নতুন কর্মচারী পাড়ার বনেদী বাসিন্দার সঙ্গে যতটা সমীহ করে কথা বলা উচিত, তা করে নি, সুতরাং বষ্ঠিনাথ লোকটি কে এবং যার পাঞ্জাবি তারা গাপ করেছে বা হারিয়ে ফেলেছে সে বষ্ঠিনাথের কে এবং পাঞ্জাবিটার দাম কত ইত্যাদি খবর জানাতে তৎপর হয়ে উঠল। পশুপতি কাছেই ছিল, চীৎকার শুনে ছুটে এল।

"জ্যাঠামশাই কি ব্যাপার, কি হল ?"

"পশু, তুমি বলেছিলে বলেই তোমার দোকান থেকে কাচাতে শুরু করেছি, তুমি পাড়ার ছেলে, জানই তো বরাবর আমাদের কাপড় বাড়ির ধোপায় কাচে।"

পশুপতি বুদ্ধিমান লোক। বষ্ঠিনাথকে তাড়াতাড়ি প্রণাম করে, মাপ চাইল এবং নিজে হাতে পাঞ্জাবিটা বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে বলে দিব্যি গালল। সামান্য দুচার জন লোক জমে গেছে। বষ্ঠিনাথ এতে খুশি হয়েছে। কথা না বাড়িয়ে বাড়ি ফিরল।

বাড়িতে পা দিয়েই শুনল মেজবৌয়ের চীৎকার। পাশের বাড়ির ছেলেরা ছাদে বল খেলছিল। বলটা এসে পড়ে উঠোনে। তারপর লাফাতে লাফাতে পায়খানায়। মেজবৌ এইমাত্র চতুর্থ কাপ চা শেষ করেছে। এখন একমিনিটও আর সবুর সইতে রাজী নয়।

"মায়েরা কি সব মরেছে ? ছেলেদের শাসনও করতে পারে না ? একি খেলা রে বাপু, খেলতে হয় যা না গড়ের মাঠ তো রয়েছে, পরের অনিষ্ট করে খেলা কেন ? এ সব হচ্ছে বড়দের ওসকানি, জানতে আর বাকি নেই।"

শুনল বষ্ঠিনাথ। তারপর গলাটা নামিয়ে বলল, "একটু চুপ কর মেজবৌমা, ওরা শুনতে পাবে যে।"

"পাক না, ভয় করি নাকি ?"

"ওরা প্রতিবেশী, অসদ্ভাব করতে নেই।" বষ্ঠিনাথ নিজেই প্যানের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বলটা তুলে নিল। পাশের বাড়ির ছাদ থেকে কয়েকটা কচিমুখ উঁকি দিয়ে দেখছিল। বষ্ঠিনাথকে তাকাতে দেখে চটপট সরে গেল। বলটা হাতে নিয়ে সে পাশের বাড়িতে দিয়েও এল। সে-বাড়ির মেয়েদের মুখ থমথমে।

"বোঝই তো মা, কত অসুবিধে হয়। ওদের একটু চোখেচোখে রেখো। আজ বল ফেলল, কাল হয়তো ইট ফেলবে।"

বষ্ঠিনাথ ওদের শ্বশুরতুল্য। তাই কেউ কথা বলল না। বাড়ির পুরুষরা কাজে বেরিয়ে গেছে। আর দুচারটে কথা বলে বষ্ঠিনাথ ফিরে এল। অন্যদিন আরো পরে সে চান করে, আজ এখুনি করতে হবে।

উঠোনেই সে দাঁড়িয়েছিল। বড়বৌমা গামছা, তেল এনে দিল। বষ্ঠিনাথ সাবান মাখে না। বড় বৌমাকে চুপিচুপি বলল, "এভাবে ঝগড়া করা ভাল নয়, মেজবৌমা অন্যায় করেছে। তোমার শাশুড়ির কাছে এখন কে আছে ?"

"আমিই তো ছিলুম। কেউ কখনো থাকে নাকি? মিনিটে মিনিটে চা আর নিজের ঘরটুকু গোছন-গাছন করতেই তো ব্যস্ত।"

বঙ্কিনাথ তাড়াতাড়ি কলঘরের দরজা বন্ধ করল।

দুপুরের ঘুমটুকু তার চাই-ই। রিটায়ার করার পর থেকেই বঙ্কিনাথকে এই অভ্যাসে ধরেছে। চৈত্রের দুপুরে ভাত খেয়ে, দরজা-জানলা বন্ধ করে পাখা চালালে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোনোরকমেই পারার জো নেই, ঘুম থেকে উঠে বঙ্কিনাথের নিজেকে ঝরঝরে লাগে।

খই-দুধ খেয়ে বঙ্কিনাথ বেরিয়ে পড়ল। মুখুজ্যেদের রকে সন্ধ্যে পর্যন্ত গল্প হবে এখন। যাবার সময় আনন্দমোহনের জানলায় দাঁড়াল।

"কাল দুলালবাবু থিয়েটার দেখতে গেছল, ওর ছেলের আপিসের থিয়েটার।"

"কেমন হল?"

"আজ শুনব।"

বঙ্কিনাথ চলে যাচ্ছিল, আনন্দমোহন ডাকল।

"ঘোষেদের বাড়ির কাজ কদ্দুর এগোলো?"

"কই আর এগোচ্ছে। প্লাস্টারিং হয় নি, বারান্দায় রেলিং বসে নি, জানলা দরজায় রঙ হয় নি, ইলেকট্রিক লাইনও বসে নি, বুঝলে না খুব বড়মানষী দেখিয়ে শুরু করেছিল, এখন 'এইটে' কম পড়েছে।" বঙ্কিনাথ বুড়ো আঙুল ও তর্জনি দিয়ে অদৃশ্য টাকা বাজাল।

"হ্যাঁ, বাড়ি করা যেন মুখের কথা। আসেন কি?"

"আসে মাঝে মাঝে। বড় বড় কথা বলে, আমিও ঠুসে দি।"

আনন্দমোহন হেসে উঠল, বঙ্কিনাথ দেখল সেটা। ভাল লাগল। ঘোষমশাইয়ের বাবার কাছ থেকে বঙ্কিনাথের বাবা একবার টাকা ধার করেছিল, সে কথা ঘোষমশাই এই সেদিনও গল্পছলে বলেছে।

"চলি।"

বঙ্কিনাথ আর দাঁড়াল না। আনন্দমোহনের হাসি দেখার থেকেও এখন বেশি ভাল লাগবে দুলালবাবু কাল কি দেখল সেই গল্প শোনায়।

মুখুজ্যেদের রকটা ফাঁকা অর্থাৎ দলের লোক কেউ নেই। সামনে স্যাকরার দোকানের দুজন কর্মচারী আর কে একজন অচেনা লোক বসে

আছে। বঙ্কিনাথ রকের ধার দিয়েও গেল না। অবশ্য ওকে দেখলে স্যাকরার দোকানের লোক দুজন নিশ্চয় উঠে যেত।

বঙ্কিনাথ একেবারে বড় রাস্তায় এল। তারপর উত্তরমুখো হাঁটতে শুরু করল। ট্রাম রাস্তা পার হয়ে পার্কে ঢুকল। একটাও বেঞ্চ খালি নেই। চক্কর দিতে শুরু করল সে। প্রথম চক্করেই চোখে পড়েছিল। দ্বিতীয় চক্করে ইচ্ছেটা দানা বাঁধল। তৃতীয়বারে সামনে এসে আর এগোল না। ফুচকাওলার সামনে বসে পড়ল।

অম্বলের ব্যারাম আছে বঙ্কিনাথের। এক আনার খেয়েই উঠে পড়ল। তবে এটুকু সে নির্ঘাত জানে যে, এই এক আনাই কদিন ধরে ভোগাবে। রাতে বুক জ্বলবে। ঘুম হবে না। ঢেঁকুর উঠবে। আর নাতনী দুটো মুখের ওপরেই ফ্যাচফ্যাচ করে হাসবে।

বঙ্কিনাথ বিমর্ষ বোধ করল। আজ এই প্রথম সে একটা বোকামি করে ফেলল। না করলেও তো হত।

গল্প শোনার জন্য রকে ফিরে গেল না। কিছুক্ষণ পার্কে কাটিয়ে বঙ্কিনাথ বাড়ি ফিরল। আস্তে রেডিও বাজছে। মাস্টারের কাছে ইতুন-নিতুন পড়ছে। তিনতলায় বাচ্চাদের হুটোপাটির শব্দে বঙ্কিনাথ টের পেল অঞ্জু এসেছে। বড় বৌমাকে জিজ্ঞাসা করল, "অঞ্জু কোথায়, মার ঘরে?"

"হ্যাঁ, এসে অবধি বসে। কথা বন্ধ হয়ে গেছে। মেজ ঠাকুরপো ডাক্তার-বাড়ি গেছে।"

"রেডিও চলছে কেন?"

"আমি কি জানি, তিনতলার ওনাকে জিজ্ঞেস করুন গিয়ে।"

বঙ্কিনাথ দোতলায় উঠল। উত্তর-পশ্চিমের ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। অঞ্জু টুল থেকে উঠে কাছে এল।

"কখন এলি?"

"বিকেলে, মার অবস্থা তো ভাল নয়।"

"হ্যাঁ, সেজন্য তো তোকে আনলুম। আর যাওয়াই ভাল। নিজেও কষ্ট পাচ্ছে, সকলকে ভোগাচ্ছেও। এখন কেমন?"

"মেজদা তো ডাক্তারবাড়ি গেল।"

বঙ্কুবিহারী একটু পরেই ডাক্তার নিয়ে ফিরল। যাবার সময় ডাক্তারবাবু বলে গেলেন, "আজ রাতটা কাটলে হয়।"

তাই শুনে রেডিও বন্ধ হল, মাস্টার চলে গেল। বাচ্চাদের হটোপাটি থামল, আশপাশের বাড়ির জানলা থেকে উঁকিঝুঁকি শুরু হল।

বাড়িটা থম মেরে গেছে। কিন্তু বস্তিনাথের বয়স প্রায় সত্তর, এমন অনেক ঘটনা সে দেখেছে বা জানে। প্রথমেই সে খোঁজ নিল রান্নার কর্দের। বাচ্চাদের খাইয়ে দেওয়া হোক। তারপর বঙ্কুকে পাঠাল আত্মীয়-কুটুম্ব বাড়িতে খবর দিতে, পরে যেন না বলতে পারে যে শেষ দেখাটাও হল না। বঙ্কুবিহারীকে শ দুই টাকা সিন্দুক থেকে বার করে রাখতে বলল আর নীলুকে দুটো টাকা দিয়ে বলল, পাঁচ-নয়া পয়সা করে ভাঙিয়ে আনতে।

বাড়িটা যেন জ্যান্ত হয়ে গেল। বাচ্চাদের টেনে টেনে খাওয়াতে বসান হল। অঞ্জু এক হাঁড়ি রসগোল্লা এনেছে। বস্তিনাথকে বলল, "বাবা তুমিও দুটো খেয়ে নাও।" খিদে নেই বস্তিনাথের। ফুচকা আর তেঁতুলের টকে পেটটা ভার। থেকে থেকে ঢেঁকুর উঠছে। বলল, "রেখে দে পরে খাবখন। তোর দাদা-বৌদিদের দিগে যা।"

বস্তিনাথ বৈঠকখানায় এসে বসল। কিছুক্ষণ পরে বঙ্কুবিহারীর বন্ধু গাড়ি হাঁকিয়ে এল, একটু পরে বস্তিনাথের শালারা, তারপর জামাই। ভিতর থেকে অঞ্জু বস্তিনাথকে ডাকিয়ে পাঠাল। বস্তিনাথ দুর্গাবতীকে দেখতে এল।

ছেলে-বৌয়েরা খাটের চারপাশে। বস্তিনাথ পায়ের কাছে দাঁড়াল। দেখার আর কি আছে। তবু দেখল। পেটটা ভরা মাস পোয়াতীর মত ফুলে উঠেছে। পায়ের পাতাও। মাথার পাতলা চুলের মধ্যে কে গুচ্ছের সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে।

কথা বন্ধ দুর্গাবতীর, কিন্তু শুনতে পায়। অঞ্জু মুখ নামিয়ে বলল, "মা, বাবা এয়েচে।"

দুর্গাবতী চোখ মেলে খুঁজল। মেজবৌ সরে গেল, বস্তিনাথ কাছে এগিয়ে এল। কিছু একটা বলতে হয় এখন। কিন্তু কি বলা যায়। বস্তিনাথ একদম দিশাহারা হয়ে যাচ্ছে।

"কষ্ট হচ্ছে?"

দুর্গাবতীর কথা বন্ধ। কিন্তু শুনতে পায়। দরদর করে জল নামল চোখ দিয়ে। বস্তিনাথ জল দেখল। জলটা কানের পাশ দিয়ে গড়িয়ে চুলে পড়ল।

"কিছু বলবে?"

দুর্গাবতীর কথা বন্ধ কিন্তু ঠোঁট কাঁপল। কিছু একটা বলতে চায়।

কি বলতে চায়? শোনার জন্য বস্তিনাথ মাথাটা সবে নামিয়েছে অমনি গোটাবাড়ির আলো দপ্ করে ফিউজ হয়ে গেল।

মুহূর্তের জন্য বাড়িটার দম আটকে গেল। তারপরই চীৎকার করে উঠল বাচ্চারা। বঙ্কুবিহারী বিরক্ত হয়ে ওদের থামাতে বলল। বৌয়েরা তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বস্তিনাথ দাঁড়িয়ে থাকল খাটের পাশে, নীচে বঙ্কুবিহারী চেঁচাচ্ছে ফিউজ তারের জন্য! কোথায় আছে কেউ জানে না। আলো না হলে খুঁজে বার করা যাবে না। হারিকেন লণ্ঠন কোথায়? বড়বৌয়ের গলা শোনা গেল—"বাবা সেদিন ঝেড়ে-ঝুড়ে কোথায় যেন তুলে রেখেছেন।"

বস্তিনাথ মাথাটা আবার নামাল। তখন দুর্গাবতী কি একটা যেন বলতে চাইছিল। কিছুই শোনা গেল না শুধু অতিকষ্টে নিঃশ্বাস নেবার শব্দ ছাড়া, আস্তে বস্তিনাথ বলল, "কিছু বলছ?"

তারপরই টর্চের আলো মুখের উপর এসে পড়ল। বিরক্ত বঙ্কুবিহারী বলল, "এখনও তুমি এখানে দাঁড়িয়ে, ওদিকে খুঁজে খুঁজে হয়রান, কি দরকার তোমার সংসারের সব ব্যাপারে মাথা ঘামাবার, তোমায় না হলে কি চলে না? কোথায় রেখেছ লণ্ঠন?"

শুনতে শুনতে কাঠ হয়ে গেল বস্তিনাথ, দুর্গাবতীর কথা বন্ধ কিন্তু শুনতে পায়, ও শুনতে পেল বঙ্কুবিহারী তাকে বলল, 'তোমায় না হলে কি চলে না।' লজ্জায় প্রায়-সত্তর বছরের বস্তিনাথ মাথা নামিয়ে ফেলল। ওর মার সামনে না বলে বঙ্কু আড়ালেও তো তাকে বলতে পারত।

বস্তিনাথ পায়ে পায়ে ঘর থেকে বেরোল। দালানের কুলুঙ্গির ওপরের তাকে পুরনো শিশি-বোতলের পিছনে লণ্ঠন আছে। তেল ভরা নেই। কোথায় তেল? আবার বঙ্কুবিহারী চেঁচাল, বস্তিনাথ রান্নাঘরে গিয়ে কুলুঙ্গিতে কেরোসিনের বোতলের জন্য হাতড়াল, হাতে কি ঠেকল গোল মতো। ভাবল আলু, নখ দিয়ে খুঁচিয়ে গন্ধ শুঁকল। বিলিতি আমড়া। বড়বৌমা লুকিয়ে রেখেছে নিজে খাবে বলে বোধ হয়।

লণ্ঠন জেলে খোঁজা হল ফিউজ তার, পাওয়া গেল না। নীলুকে পাঠান হল পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে আনার জন্য।

আলো জ্বলেছে। সবাই আগের মতো ব্যস্ত। বঙ্কিনাথ শুয়ে আছে চারতলার ছাদে। খিদে নেই। বুক জ্বলছে, রাগ হচ্ছে, দুঃখু হচ্ছে। কিন্তু সব কিছুই কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে, চাপা পড়ছে সে কথাটা মনে করে, কি বলতে চাইছিল ও। কষ্টের কথা? নিশ্চয়, কষ্ট তো হবেই। কিন্তু কষ্ট তো ও আজ নতুন পেল না। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মুখ দেখল তো শেষ বয়সে, বঙ্কু বড় হয়ে যখন টাকা রোজগার করতে শিখল। তার আগে?

বঙ্কিনাথ তার আগের কথা মনে করতে করতে অনেক পিছিয়ে গেল। কবে, কবে দুর্গাবতী মুখ ফুটে বলেছে তার কষ্টের কথা?

মনে পড়ল। বঙ্কু তখন পেটে। দুর্গাবতী আটমাসের পোয়াতি। সারাদিনের সংসারের কাজের পর ও হাঁপাত। পেটে হাত রেখে বলত, 'কি দুরন্তই না হয়েছে, খালি ঢুঁ মারে, একবার এদিক আবার ওদিক।'

'তাহলে শাসন কর।'

'তুমি কর।'

তলপেটটা গড়ানে, ঢালু, বঙ্কিনাথ হাত রেখে বলল, 'কোথায়?'

'ওই তো, আবার ধপ ধপ শুরু করেছে।'

'কই?'

বঙ্কিনাথ দুর্গাবতীর পেটে কান রাখল, কিচ্ছু শুনতে পেল না।

'বাজে কথা।'

'তাই না আর কিছু, হত তোমার তো বুঝতে।'

'আমার কেন হবে, সংসার তো তোমার। তোমাকেই সব কষ্ট পোয়াতে হবে।'

বুকে ব্যথা করছে বঙ্কিনাথের। কষ্ট হচ্ছে। সেই বঙ্কু আজ বলল, তোমায় না হলে কি চলে না? দুর্গাবতীর কষ্ট হচ্ছে কি সংসার ছেড়ে চলে যাবার জন্যে? সেই কথাই কি বলতে চাইছিল?

চিৎ হয়ে শুয়ে বঙ্কিনাথ আকাশ দেখতে লাগল। পরিষ্কার আকাশ। তারায় তারায় ছেয়ে আছে।

মনে পড়ল একটা শিলকোটাওলা ডাকতে হবে। শিলটা খয়ে গেছে। ভাল বাটনা বাটা যায় না। সংসারে অনেক কিছু নতুন হয়েছে, অনেক কিছু চলে গেছে। দুর্গাবতী ঐ শিলটায় বাটনা বাটত। ও মরে যাবে।

বঙ্কিনাথ আকাশটাকে ঝাপসা দেখতে শুরু করল। চোখ বুঁজে আকাশে

কানে অস্পষ্ট স্বরে ভেসে এল কে যেন অনেকদূর দিয়ে হেঁকে চলে যাচ্ছে। বঙ্কিনাথ কান খাড়া করে রইল আর তক্ষুনি নানান গলায় কারা কলরব করে উঠল। ধড়মড় করে উঠল বঙ্কিনাথ। বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে।

কিছুক্ষণ বসে থেকে বঙ্কিনাথ আবার শুলো আকাশের দিকে মুখ করে। আকাশে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। কোথায় আকাশ, যেন মস্ত একটা শিল। ফুট-ফুট তারা, যেন এইমাত্র কে কুটে দিয়ে গেল।

আকাশটা ভারি সুন্দর ঠেকল বঙ্কিনাথের।

ঘুম ভাঙতেই বঙ্কিনাথ শুনল নিচে কারা ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদছে। নেমে এল সে। শুনল দুর্গাবতী মারা গেছে। বাড়িটা গুম খেয়ে রয়েছে।

নাতনীকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "বাবা কোথায়?"

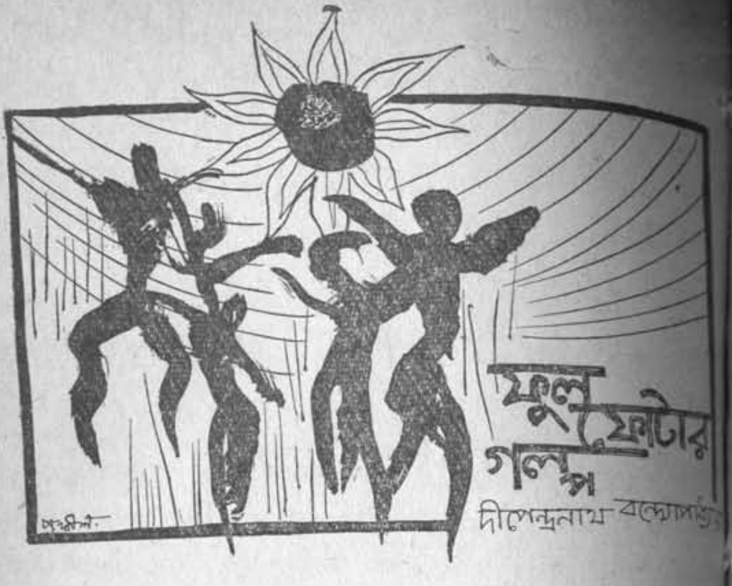
"নিচে বৈঠকখানায়।"

"ডাক।"

বঙ্কুবিহারী এল, কুঞ্জও।

"বসে থাকলেই হবে?" বিরক্ত হয়ে বঙ্কিনাথ বলল, "ডাক্তারের কাছে যাও, সার্টিফিকেট আন।"

বঙ্কুবিহারী চলে যাচ্ছিল, বঙ্কিনাথ ডাকল: "লোকের বাড়ি থেকে কিছু খাওয়া খারাপ, ফেরার সময় এক গজ ফিউজ তারও কিনে আনবে।"



এক

বারান্দায় কয়েকজন দাঁড়িয়েছিল। ছাড়াছাড়া, যেন কেউ কাউকে চে… না। দেখে তার মনে হয়েছিল কি এক বেদনায় কয়েকটা শিলা পাথর … কি এক মন্ত্রে সেই পাথর নম্র। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে রাস্তা দেখেছিল, … দেখেছিল, বিকেল দেখেছিল। অবাক হয়ে ভেবেছিল, কেউ জানে না … এতবড় চত্বরে এতগুলি বাড়ির এই অজস্র মানুষ তাদের রোগ, নিরা… জীবিকা এবং আনন্দ-শোকের আপন পৃথিবীতে নিজেই নিজের দাস। … মালি বেড়া-গাছের পাতা কাটে। গাছে ফুল ফোটে। ফুলে বিকে… রোদ। কেউ জানে না।

মহত্বকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু অজ্ঞাতে নিভে যাওয়ায় তার বড় … সে-কারণে এই গোপন, নির্জন এবং নিরহঙ্কার যন্ত্রণা তার কাছে অভিশাপ।

নীরবে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। আর মাথা নিচু করে রইল। … পৃথিবীতে জীবনের চরমতম লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের স্মৃতি তার মাথা … করল। কে যেন ফিসফিস করে তাকে ভেতরে যেতে বলেছিল। কিন্তু … তুলে চাইতে সাহস পেল না।

মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ-তীব্র আর্তনাদ মুহূর্তে স্তব্ধ হতে শুনছিল। সে … ওষুধের উগ্র গন্ধ পাচ্ছিল। সে তীক্ষ্ণ আর তীব্র কণ্ঠের দুটো একটা …

বিলাপ শুনছিল। আর সেই আর্তনাদ, সেই বিলাপ, সেই ঝাঁঝ বিষাক্ত বাষ্প হয়ে তার প্রতিটি স্নায়ুতে কি এক মরীচিকা জ্বালা সৃষ্টি করল।

পায়ের সামনে এসে দাঁড়াল। বিছানায় সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি মূর্তি দেখল। সাদা চাদরে ঢাকা শরীরে একটি মুখ সে চিনত। একটি রোগা মুখ। হালকা ভুরুর তলায় দুটি চোখ সে চিনত। দুটি সাধারণ চোখ। সে দেখেছিল ঔদাসীন্য। কিছুই যাকে স্পর্শ করতে পারে না। সে দেখেছিল নীরবতা। কিছুতেই যা ভাঙ্গে না। সে দেখেছিল শীর্ণ একটি হাত, কয়েকদিনের আয়াসে যে হাতে সে একটি ফুল দেবার অধিকার অর্জন করেছিল।

এই মুহূর্তে সে অন্য এক দৃশ্য দেখল। বিছানার চাদর মেঝেয় লুটোচ্ছে। মাথার একরাশ চুল আলুথালু। চোখের চাউনিতে যন্ত্রণা। বালিকার মতো ছোট্ট রোগা শরীরটায় যন্ত্রণা। তীক্ষ্ণ, তীব্র আর্তনাদে যন্ত্রণা। অস্ফুট বিলাপে যন্ত্রণা। সমস্ত শরীরটাকে দুমড়ে, কুঁকড়ে ছটফট করতে করতে প্রাণপণে তা সহ্য করার প্রয়াসে যন্ত্রণা।

মাথার কাছে প্রতিমার মতো একটি পুরুষ দাঁড়িয়ে। আইন যাকে শত্রু বলে ঘোষণা করেছিল, সেই পলাতক স্বামী প্রতিমার মতো দাঁড়িয়ে। শুধু দৃঢ় দুটি হাত, বীরের দুটি হাত গভীর আবেগে তার কপাল থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিচ্ছিল।

ঔদাসীন্য নেই, নীরবতা নেই। সে বুঝতে পারল এ কি অলৌকিক যন্ত্রণা—গোটা শরীরের যন্ত্রণা—যা তার চোখের দৃষ্টি পালটে দিয়েছে, তার কণ্ঠে আর্তনাদ এনেছে, বিলাপ জাগিয়েছে।

সেই প্রতিমার মতো পুরুষটির চোখের দিকে চেয়ে সে কি যেন বুঝতে চাইল। বীর ম্লান হাসল। সে বিছানার ওপর একরাশ চটকানো শিউলি ফুলের দিকে চেয়ে কি যেন বুঝতে চাইল। ফুল অস্ফুট আর্তনাদ করল। সে বুঝতে পারল না পালিয়ে যাওয়া ছাড়া তার কিছু করার আছে কিনা।

তারপর সে মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসল। কারণ জানত সে প্রতিমা নয়, বীর নয়। আর সেই থেকে থেকে অস্ফুট বিলাপ, হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠেই দাঁত চাপা স্তব্ধতা, সেই ওষুধের গন্ধ তাকে গমগম করে কি যেন বলল।

ঔদাসীন্য দেখেছিল, নীরবতা দেখেছিল। এবার দেখল অবহেলা। সে

বুঝল চীৎকার করে, কেঁদে, জ্ঞান হারিয়ে যন্ত্রণার কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার পথ সকলের নয়। সে অবাক হয়ে ভাবল এতবড় বোঝা বইবার দায়িত্ব এই ছোট্ট বিকল শরীরটা এখনও কিভাবে গ্রহণ করছে! কেন করছে!

তারপর সে অভিমানে, বেদনায় নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

দুই

একটি যুবক ছিল। সারাদিন সে কাজে-অকাজে ঘুরে বেড়াত। সারারাত ঘুমোত আর স্বপ্ন দেখত। যুবকটি প্রশ্রয়ের সঙ্গে তার স্বপ্নগুলিকে মনে রাখার চেষ্টা করত। আর রোজ শুতে শুতে ভাবত আজ আমি এই স্বপ্ন দেখব। সুতরাং বোধগম্য যে যুবকটির নিজের ওপর প্রচণ্ড আস্থা ছিল।

অথচ তার পরিবারে অভাব ছিল, জটিলতা ছিল। অথচ তার জীবনে অভাব ছিল, জটিলতা ছিল। অথচ তার সময়ে অভাব ছিল, জটিলতা ছিল। সে কি এক বিশ্বাসে, স্পর্ধায় সবকিছুকে অস্বীকার করে অধীর বিনয়ে অনিবার্য ভবিষ্যতের অপেক্ষা করত।

যুবকটি অনায়াসে পৃথিবীর কথা ভাবতে পারত। যুবকটি অনায়াসে যে-কোনো দেশে মনুষ্যত্বের মুক্তিতে নিজের মনে উৎসবের সুর শুনতে পেত। যুবকটির সব থেকে বড় ভরসা ছিল এই বোধ যে জীবনের কোনো মুহূর্তে সে একা নয়। সে চোখ বুজলে সাদা-কালো অনেক মুখ দেখতে পায়— ছবিতে যাদের প্রায়ই দেখা যায়। সে চোখ বুজলে নিরবয়ব এক চেহারা দেখে—বিদ্বানরা যাকে বলেন ইতিহাস। সে চোখ বুজলে পৃথিবীর হৃদস্পন্দনের মতো এক উদাত্ত অথচ নিঃশব্দ সঙ্গীত শোনে—গুণীরা যাকে বলেন জীবন। আর সে অনায়াসে এই বস্তুগুলির সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বোধ করে।

এ কারণে সে একবার নদীর ওপারে গিয়েছিল। সে দেশটা তখন 'নৌকো' হয়ে মোহানায় যাবার উৎসবে মেতেছে। গান ধরেছে।

বিকেলে ছেলেরা তাকে এক দুর্গে নিয়ে গেল। ছোট একটা ঘরে ছোট একটা বিছানায় সাদা চাদরে গলা পর্যন্ত ঢেকে একজন শুয়েছিল। ছেলেরা মুখ নামিয়ে বলল, এই আমাদের পারুল। যুবক শুদ্ধ তাকিয়েছিল। কারণ তখনও তার স্মৃতিভ্রংশ হয় নি। একটা রোগা মুখ, হালকা ভুরুর তলায় দুটি সাধারণ চোখ। আইন তাকে বন্দী করেছে। দাঁত দিয়ে, নখ দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে তার তরুণ নিষ্পাপ শরীরটা দিনের পর দিন, দিনের পর দিন

দিনের পর দিন কুরে নিয়েছে। আর লেহন করেছে খসখসে জিভে। আইনের ছোঁয়ায় যার যৌবন হারিয়ে গেল; আইনের ভ্রূকুটিতে যার ঘরে আগুন জ্বলল আর যার স্বামী পালাল আর শিশু ছেলেটা কোথায় তা কেউ জানে না— সেই-তাকে দেখেও যুবকটির স্মৃতিভ্রংশ হয় নি। সে ভাবছিল সাতটি ভাইয়ের দুজন এখানে উপস্থিত, আর পাঁচটি কোথায়? আর যুবকটির কানে সেই গান ভেসে এল—তার জন্যে ঘরে ঘরে লোকে যে গান বেঁধেছে, মুখে মুখে যে গান ছড়িয়েছে নদীর ওপারে, যে গান গাইতে গাইতে দক্ষিণের কটা বোকাসোকা চাষাকে হঠাৎ সে জ্বলে উঠে আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে দেখেছিল।

যুবকটি কিছু বলতে চেয়েছিল। কিন্তু তার মুখে কথা এল না। দিনের সমস্ত উৎসব তার কাছে নিষ্প্রভ হল। কারণ বুঝল এই নৌকোয় পারুলের স্থান নেই। কারণ তারা চেয়েছিল মোহানা ছাড়িয়ে সমুদ্রে যেতে। অথচ দুটিমাত্র ভাই উপস্থিত, আর পাঁচজন কোথায়?

যুবকটি লক্ষ্য করল বিকেল হলেই দলে দলে মানুষ দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। কিছু বলে, কিছু বলার চেষ্টা করে আর মাথা নিচু করে চলে যায়। লক্ষ্য করল অপরিচিত মুখ দেখলে তার চোখ বুজে আসে। কপালে ছায়া পড়ে। তারপর কি এক ঔদাসীন্যে হঠাৎ দৃষ্টিটা অনেক দূরে চলে যায়।

বিচারের সময় আইনের ছদ্মবেশ ঘোচাবার জন্য রমণী হয়েও নিজের ওপর সমস্ত অত্যাচারের বিশদ বিবরণ দিয়েছিল যখন, তখন কি সে জানত আবার বেঁচে উঠবে? আর আজ তার পঙ্গু, লাঞ্ছিত শরীরটার দিকে অজস্র চোখ যখন মমতায়, শ্রদ্ধায়, জ্বালায়, কখনও বা করুণায় অনিমেষ তাকিয়ে থাকে, তখন কি নিজের সেই বিস্তৃত বিবরণ লজ্জা হয়ে, আতঙ্ক হয়ে তার মেয়ে-মনটিতে বাজে? তাকে নিরুপায় করে দেয়? নাকি উদাসীন দৃষ্টি অনেক দূরে মেলে সে হারিয়ে যাওয়া পাঁচটি ভাইকে খোঁজে? যুবকটি ভাবল সন্ধ্যেবেলা শাঁখ শুনলে তার কি কখনও একটা শিশুমুখ মনে পড়ে? রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে সে কি নিয়ে স্বপ্ন দেখে?

যুবকটি দেখল সমবেত শ্রদ্ধা এবং জ্বালা তার মৌনকে স্পর্শ করতে পারে না। বাচ্চা মেয়ের মতো কুঁকড়ে যাওয়া 'ছোট্ট শরীরটা সাদা চাদরে ঢেকে রোগা মুখ আর সাধারণ দুটি চোখ মেলে সে শুয়ে থাকে। আর ইচ্ছে থাকলেও যুবক তাকে কিছুই বলতে পারে না। অথচ সে চায় তারই মহত্ত্বের

কথা শোনাতে, তার মৌন ভাঙ্গতে, সহজভাবে এই নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে গ্রহণ করতে পারার উদ্দীপনা যোগাতে। যুবকটি অথচ কিছুই বলতে পারে না। সে জানে বিশাল ত্যাগের পর যখন উত্তেজনা কমে যায়, যখন কিছু করার থাকে না, যখন নিজেকে বাতিল মনে হয়—তখন মহৎ মানুষও আস্তে আস্তে ছোট হয় বা পাগল হয় বা আত্মহত্যা করে। সে বোঝে না ঔদাসীন্য বা মৌনের আড়ালে এই নিঃসঙ্গ ব্যর্থতার বোধ জেগেছে কিনা। তাই তার ভয় করে।

এইভাবে পরপর তিনদিন সে গিয়েছিল। আর বিছানার পাশে বসে থাকত। কিছু একটা বলার চেষ্টা করত, কিছু একটা শুনতে চাইত—কিন্তু বলা হয় না, শোনা হয় না।

অবশেষে সেদিন সকালে সে ঝড়ের মতো একটা ফুল হাতে তার ঘরে ঢুকল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, আজ আমাকে চলে যেতে হবে। আমি জানি তুমি বাঁচবে। কারণ তুমি বোঝ জীবন তোমাকে চায়। তোমাকে আমরা ওপারে নিয়ে যাব। তারপর তোমাকে সমুদ্র ডিঙিয়ে সেই আশ্চর্য দেশে পাঠাব। এই ফুল নাও। পৃথিবীতে যত মানুষ মার খেয়েছে, তাদের হয়ে তোমাকে দিলাম। সে একটা সূর্যমুখী ফুল ছিঁড়ে এনেছিল।

যুবকটি যখন চলে আসবে, তখন সে কথা বলল। যুবকটি যেন দৈববাণী শুনল। সে বলল, বোলো সকলকে আমার মে দিবসের অভিনন্দন।

যুবক আচ্ছন্নের মতো বাইরে এল। সে ভুলে গিয়েছিল। এই দুর্গ, এই অত্যাচার, নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে এই উদাসীন মৌন তাকে সকালটার তাৎ… ভুলিয়ে দিয়েছিল।

যুবকটি এক নতুন উপলব্ধি নিয়ে ফিরল। শুধু ঔদাসীন্য বা নীরবতা নয়… বিশ্বাস। যাকে সে সান্ত্বনা দিতে, প্রেরণা দিতে গিয়েছিল—তার কাছ থেকে… ইতিহাসের সমর্থন নিয়ে যুবক তার শহরে ফিরল।

দিন পনেরো পরে খবর এল, সে এসেছে। গোপনে। কারণ আ… তার শত্রু। কারণ আইন তার পলাতক স্বামীর শত্রু। মাত্র কয়েক… আসে, দেখাশোনা করে। পাশের ঘরের লোকেরাও জানে না—এই সে… যাকে নিয়ে বই লেখা হয়, গান—এই সেই। গাঁয়ে গাঁয়ে যার না… মন্ত্রের কাজ দেয়—এই সেই। তার রোগা মুখ আর সাধারণ ছুটো… তাকে চিনবার উপায় ছিল না।

যুবকটি দৌড়ে গিয়েছিল। আর থমকে দাঁড়িয়ে সে দেখেছিল যন্ত্রণা, সে শুনেছিল যন্ত্রণা। প্রতিমার মতো একটি পুরুষকে, তার স্বামীকে এই প্রথম সে চোখের নাগালে পেয়েছিল।

যুবকটি মানুষকে মরতে দেখেছে—অসুখে, দুর্ঘটনায়, অত্যাচারে। শরীরের যন্ত্রণা সে দেখেছে—অসুখে, দুর্ঘটনায়, অত্যাচারে। কিন্তু তার সমস্ত স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার বাইরে যুবক যন্ত্রণার নতুন এক চেহারা দেখল—যা নিছক …আর মর্মান্তিক। আর দেখল অবহেলা।

যুবকটি ভাবল, সে ফুল দিয়েছিল, হায় রে সূর্যমুখী! সে বলেছিল, বাঁচো, হায় রে জীবন!

চিরদিন যাকে পঙ্গু আর বন্ধ্যা হয়ে থাকতে হবে, চিরদিন যাকে কতগুলো উজ্জ্বল আর অন্ধকার স্মৃতি বহন করতে হবে, চিরদিন যাকে এক দানবীয় লাঞ্ছনার মূর্ত সাক্ষ্য হয়ে দিন কাটাতে হবে এবং যাকে নিয়ে বই লেখা হবে, গান—তাকে সে ফুল দিয়েছিল; বলেছিল, বাঁচতে হবে। হায় রে সূর্যমুখী, হায় রে জীবন!

যুবকটি সেই প্রথম এক আশ্চর্য দ্বন্দ্ব ও বিষাদ বোধ করেছিল।

তিন

এখন কেমন আছেন?

একটু ভালো।

হাঁটা-চলা—

নাঃ। মৃদু হেসে বললেন, আর কি পারব কোনোদিন?

নিশ্চয়ই। বিশ্বাসে তেমন জোর না থাকলেও আমাকে বলতে হল, পারতেই হবে।

তারপর খানিক নীরবতা। কারণ কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

সারাদিন কি করেন?

শুয়ে থাকি।

কষ্ট হয় না?

হয়। মৃদু হেসে বললেন, ছেলেবেলায় আমি খুব খেলতে পারতাম। কাগজে একবার নাম বেরিয়েছিল স্পোর্টসে। তাই নিয়ে বাড়িতে কি হৈ চৈ।

হঠাৎ চুপ করে গেলেন। অন্যমনস্কের মতো কাগজে নাম বেরোনোর ক... বলে ফেলেই কি তাঁর মনে পড়েছে পরে একসময় তিনি কাগজের নিয়মিত খবর ছিলেন, যে খবরে মানুষ চোখ বন্ধ করে!

স্পোর্টসের অভ্যেস ছিল, তাই পেরেছেন। গাঁয়ে গাঁয়ে কি ঘুরতেই না হত আপনাকে।

মুখ জ্বলে উঠল। বললেন, ভাবলে স্বপ্ন মনে হয়। জল-কাদা ভেঙে মাঠে মাঠে ঘুরেছি। ক্ষ্যাপা গাঁ, ধানক্ষেত। সেই-আমি বিছানায় উঠে বসতে কাতরাব—কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলাম?

আচ্ছা, আপনি তো শহরের মেয়ে ছিলেন। বিয়ের পর গাঁয়ে গিয়ে কষ্ট হত না?

হত না আবার? সমস্ত অভ্যাসটি ছিল শহুরে। এদিকে আমার শ্বশুর-বাড়ি আবার বনেদী, কনজারভেটিব। কি একটু ভেবে ফিক্ করে হেসে বললেন, অভ্যাস হয়ে যায়। অভ্যাস করে নিতে হয় তো?

আমার খুব ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি, কি ভেবে আপনি হাসলেন? জীবনের মধুর স্মৃতিগুলি আপনাকে যন্ত্রণা দেয়, না ঠাট্টা করে? অথচ চুপ করে রইলাম।

শোন। তোমাকে একটা দরকারে চিঠি দিয়েছি।

বলুন।

শোন, আমি নেরুদার কয়েকটা কবিতা অনুবাদ করেছি।

তাই নাকি? বাহ্, এই তো সময় কাটাবার সুন্দর উপায় পেয়ে গেছেন।

শোন, আমি চেষ্টা করলে বোধহয় দু-একটা উপন্যাসও অনুবাদ করতে পারি।

খুব ভালো, করুন না। আস্তে আস্তে হয়তো আপনি নিজেও লেখা শুরু করবেন। আহ্, আপনি যদি লেখেন না—

তোমাকে কিন্তু একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই।

কি বলুন।

একটা প্রকাশকের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কিছু আয়ের তো দরকার।

বিমূঢ়ের মতো বললাম, কেন?

বা, টাকা লাগবে না? ছেলেটাকে স্কুলে দেব, তার ওপর—

ছেলেমানুষের মতো বললাম, সেজন্য আপনার এত ভাবনা কিসের?

ম্লান হাসলেন। আসলে আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন। বাস্তবিক মনে হত, তাঁর পক্ষে বেঁচে থাকাটাই আমাদের সময়কে, আমাদের জেনারেশানকে ক্ষমা করা। নিছক প্রাণধারণের জন্য তাঁকেও যে উদ্ব্যস্ত হতে হবে, এ ভাবতে পারি না।

বললেন, দেখ, আমার চিকিৎসার জন্য তো কম করা হল না। এখন ভবিষ্যতের কথা আস্তে আস্তে ভাবতে হবে বৈকি। অন্যের সাহায্যে দিন কাটানোয় আমার কি-ই বা অধিকার? আর এঁদেরও সাধ্য কতটুকু?

তাই বলে আজ? এখনই? সর্বস্ব দিয়েও কি কিছুই পাওয়ার অধিকার থাকবে না? আপনার সম্পর্কে বই লিখে, গান বেঁধে, আপনাকে ইতিহাস করে দিয়েই কি আমাদের দায়মুক্তি?

শোন, শুয়ে শুয়ে অন্যের সেবা পাব বলেই কি এই পঙ্গুতাকে গ্রহণ করেছি? পারিপার্শ্বিক, বাস্তবতা ভুলে নিজের মনে যদি অভিমানকে প্রশ্রয় দি, তাহলে মনটাও কি দুমড়ে যাবে না?

মাথা নিচু করলাম। আর, আমার গা ছমছম করতে লাগল। মহত্ত্ব আমি বুঝি। কিন্তু সবার অজ্ঞাতে, গোপনে নিরন্তর নিজের কাছে নিজে মহৎ থাকা কি দুরূহ! ত্যাগ আমি বুঝি। কিন্তু সবার অজ্ঞাতে, গোপনে নিরন্তর নিজের কাছে নিজের ত্যাগ কি দুষ্কর। এবং যিনি প্রায় ইতিহাস, যাঁর নাম একটা মন্ত্র; যাঁকে নিয়ে বই লেখা হয়, গান—তাঁর পক্ষে গোপনে, অজ্ঞাতে, মামুলী একটা মেয়ের মতো নিছক বাঁচা কি কঠিন।

আমি সাধারণ দুটো চোখে আবার যেন সেই ঔদাসীন্য দেখলাম। কিছুই যাকে স্পর্শ করতে পারে না। আমি রোগা একটা মুখে আবার নীরবতা দেখলাম। কিছুতেই যা ভাঙে না। আর মনে পড়ল, নদীর ওপারে একটা বাড়ির ঘরে ধবধবে বিছানায় সাদা চাদরে গলা পর্যন্ত ঢাকা একটি মুখ দেখেছিলাম। একটি মৌন মুখ। শুনেছিলাম তিনি বাঁচবেন না। আমি শহরে ছোট্ট একটা ঘরে ধবধবে বিছানায় বালিকার মতো ছোট্ট একটা দেহকে ছটফট করতে দেখেছিলাম। শুনেছিলাম তিনি বাঁচবেন না। এবং এই ছোট্ট একটা ঘরে, ছোট্ট আর মামুলী এই ঘরে ধবধবে বিছানায় সোজাভাবে বসে তাঁকে আমার সঙ্গে কথা বলতে দেখছি। তিনি ভবিষ্যতের জন্য ভাবছেন।

বিস্ময়ের সঙ্গে আমার মনে হল, এক মুহূর্তের জন্যও কি ভদ্রমহিলা সাধারণ হবেন না। হারবেন না? জীবনকে সমস্তভাবে স্বীকার করার এই আশ্চর্য জোর কোথা থেকে পান? মৃত্যুর দরজা ঘুরে এসেছেন বলেই কি মরে যাওয়াকে এত ভয়? নাকি জীবনের ওপর অভিমান করে, প্রতিশোধ নিয়ে একা বেঁচে থাকবেন? জীবন কত মধুর হতে পারে তা তো তিনি জানেন। জীবন কত ভয়ঙ্কর তা তো তিনি বোঝেন। উজ্জল আর অন্ধকার কতগুলো স্মৃতিকে বহন করে, জাগরণে বা নিদ্রায় কতগুলো স্মৃতি বহন করে থাকতে তিনি ভবিষ্যতের কথা ভাবেন কি করে? তবে কি ভালোবাসা? কিন্তু কি দেবে এই জীবন? শহরের অভ্যাস ভেঙ্গে নিজেকে গ্রামের করেছিলেন। গ্রাম থেকে ছিটকে এলেন শহরে। গ্রামের অভ্যাস ভেঙ্গে আবার শহরের যোগ্য হবেন। কিন্তু এই শহরকে তো তাঁর কিছু দেবার রইল না। এই শহর থেকেও তো তাঁর কিছুই নেবার নেই। পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবেন। চোখের সামনে দেখবেন ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। ছটফট করবেন কিন্তু অংশ নিতে পারবেন না। পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবেন, তারপর বুড়িয়ে যাবেন, তারপর মরে যাবেন—ছটফট করবেন, কিন্তু জীবন থেকে কিছু পাবেন না। আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে নিজের লাঞ্ছনা ও ত্যাগের মহত্বের ভারে শুয়ে থেকে চারপাশের দ্রুতগতি জীবনকে দেখে একদিন কি তাঁর অনিবার্যভাবে মনে হবে না এর থেকে সেই আশ্চর্য দিনগুলোয় মৃত্যু সুখের ছিল!

জানো, আমার ছেলেটা আমায় নিয়ে লেখা সব কবিতা মুখস্থ করেছে যখন আবৃত্তি করে আমি অবাক হয়ে শুনি। এসে প্রথম প্রথম তো আমার ধারই ঘেঁষত না। ভয় পেত। প্রথমদিন সে এক কাণ্ড একেবারে চিনতে পারে নি।

হুঁ, আপনার চেহারা অনেক, মানে এতদিন পরে দেখা। তায় সব সময় বাইরের লোকেরা ঘিরে থাকত।

সত্যি। এত শ্রদ্ধা, এত ভালোবাসা পেয়েছি—মনে হয় আমি কি এর যোগ্য? দুনিয়ার পৌরাণিক চরিত্রগুলির সঙ্গে আমার নাম জুড়ে দেয় লজ্জা হয়। ভয় হয়। তাইতো নিজেকে যোগ্য করে তুলতে চাই নইলে সমস্তই জীবনের বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

আমি বুঝলাম ইচ্ছে করলেও তিনি সাধারণ হয়ে হেরে যেতে পারেন না। আমি বুঝলাম ইচ্ছে থাকলেও অভিমানে জীবন থেকে মুখ ফেরানো তাঁর স্বভাব নয়। কিন্তু এইভাবে কতদিন, কতদিন এক গুরুভার বহন করবেন? কতদিন করতে পারবেন? শুধুমাত্র পরের জন্য বেঁচে থাকা, আহ্ যন্ত্রণা! শুধু মন্ত্র হয়ে থাকা—যা উচ্চারণ করে মানুষ উৎসব করবে!

আমি তাঁকে ফুল দিয়েছিলাম, হায়রে সূর্যমুখী! আমি বলেছিলাম বাঁচতে হবে, হায়রে জীবন! পাথরের প্রাচীন দেবীমূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে আমার গা ছমছম করতে লাগল।

গল্প

একটি যুবক ছিল। সারাদিন সে ভাবত, কারণ চাকরি ছিল না। সারারাত সে ভাবত, কারণ ঘুম আসত না। আর ভাবতে ভাবতে মাঝে মাঝে তার তন্দ্রা হত। একটু বা ঘুম। তখন সে স্বপ্ন দেখত। বস্তুত যুবকটি ঘুমোবার আগে ভয় পেত। কারণ সে স্বপ্ন দেখতে দেখতে ক্লান্ত।

আজকাল প্রায়ই সে একটা বাড়িকে স্বপ্ন দেখছে। বাড়িটা শক্ত, উঁচু, প্রাচীন।

একদিন সে দেখল তার একটা জানলার সামনে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে। বাড়িটার সামনে ছোট্ট ঘাসজমি। হঠাৎ বাড়িটার বন্ধ জানলার কাচে কোথা থেকে ঢিল পড়ল। তারপর জানলা খুলে পটের লক্ষ্মীর মতো একটি মুখ উঁকি মারল। তারপর ঘাসজমিতে কিভাবে অনেকগুলো মানুষ এল। তারা ওপর দিকে হাত তুলে চিৎকার করে কি সব বলল। জানলাটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সেই আশ্চর্য চোখ দুটো মেলে মারামারির দিকে তাকালেন। শান্তভাবে তাকালেন। বিকেলের আলো তাঁর পুরু চশমা আর মাথার পরিপাটি চুলে জ্বলছিল। হঠাৎ দেখা গেল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁ হাতটা কনুই থেকে কাটা এবং পাঞ্জাবির হাতা চুপসে গেছে। তারপর কে একজন ক্ষীণ্ডলিরীকের উপকথার রোখালো নায়কের মতো বুক ফুলিয়ে সম্ভবত সেই লক্ষ্মী মেয়েটির হাত হিঁচড়ে টানতে টানতে বীরদর্পে বেরিয়ে গেল। যুবকটি স্বপ্নের মধ্যে লক্ষ্য করল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিচের কোলাহলের দিকে একবারও না তাকিয়ে, অনেক অনেক দূরে কি যেন দেখছেন। আর বাতাসে তাঁর পাঞ্জাবির চোপসানো হাতাটা মৃদু কাঁপছে। আর নিচের সেই মানুষগুলো একপাশে বাড়ির বন্ধ জানলাটায় ঢিল ছুঁড়ছে।

সেই বাড়িতেই লাব্রেরী ঘরে যুবক কি একটা ভোজসভার স্বপ্ন দেখল। কতগুলি বই ছিল। শুধু একটা মুখকে তার পরিচিত মনে হল। মোটা গোঁফ, পৌরাণিক স্বাস্থ্য, হাতে পাইপ। চোখ দুটো হাসছে। গম্‌গম্ করে গল্প করছে লোকটা। আঙুল তুলে পৃথিবীর ছবির দিকে তাকিয়ে কি একটা কবিতা আবৃত্তি করল। তারপর গান হল। ভোজসভার শেষে লোকটা সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে একবার বাইরে গেল এবং খানিকবাদে যখন ফিরে এল তখন যুবকটি হঠাৎ শিউরে উঠে লক্ষ্য করল তার পা-জোড়া সারসের পায়ের মতো সরু আর লম্বা হয়ে পৌরাণিক শরীরটার ভারে সামনে বেঁকে গেছে। আর ভোজসভার সেই লোকগুলো অনেকে তাকে চিনছে না। তারা আর একজন কার আবৃত্তি শুনছে। তারপর ভূমিকম্পে লাইব্রেরীর একটা তাক থেকে বইগুলো খসে পড়তে লাগল।

যুবকটি আর একদিন স্বপ্নে দেখল সেই বাড়িটার সামনে ঘাসজমি চওড়ায় অনেক বেড়ে গেছে। আর সেখানে সারি সারি কবর। যুবকটি অন্যমনস্কের মতো হাঁটতে হাঁটতে এক জায়গায় দেখল ভীড়। আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মী, ছবিতে দেখা মৃত ও জীবিত অনেক মানুষকে সে দেখল। দেখল তাদের বিষাদ, বেদনা। খুব কৌতূহলী হয়ে ভাবল কার মৃত্যুতে এত শোক। উঁকি মেরে স্তম্ভিত বিস্ময়ে যুবক লক্ষ্য করল কফিনে তার নিজের মৃতদেহ। যুবকটি ফিসফিস করে বলল, কেন, আমি তো বাঁচতে চাই। এই তো আমি। কফিনটা ফুলে ঢেকে গেল। আর কার কণ্ঠ সে শুনল, না। এপিটাফ নয়। এই আমি ফুলের বীজ এনেছি। তোমরা হাতে হাতে ছড়িয়ে দাও।

পাঁচ

কেমন আছ?

ভালো না। পুলিশ রিপোর্টে চাকরি গেছে। অভাব, তারওপর সময় কাটে না।

সে কি? তোমার সময় কাটে না?

হুঁ। বাড়িতেও থাকতে পারি না। একটা ভাই পাগল হয়ে গেছে। আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল।

ও। তারপর চুপ করে রইলেন।

আপনি কেমন আছেন?

ভালো। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, মোটামুটি।

রোজ ক্লাস করছেন?

হ্যাঁ। লুকিয়ে। প্রফেসররা জানেন। আমাদের ছেলে-মেয়েরাও জানে। খবরটা গোপন রাখতে বলেছি।

প্রাইভেটে দিয়ে দিন। তারপর লেকচারারশিপ্ হয়ে যাবে।

দেখি।

শরীর একদম ভালো হয়ে গেছে?

না। তবে হেঁটে-চলে বেড়াতে পারি। মাঝে মাঝে একটা পেন্ হয়। ও আর যাবে না।

সেই বাড়িতেই আছেন?

না। কাছেই উঠে এসেছি। ঠিকানাটা লিখে নাও। এসো একদিন। একদম দেখা নেই।

বলতে পারলাম না যেতে আমার লজ্জা করে। নদীর ওপারে আমি সেই ঔদাসীন্য নীরবতা আর বিশ্বাস দেখেছি। এই শহরে আমি সেই নিরভিমান ঘৃণা, নম্র অবহেলা আর মুক্ত দৃষ্টি দেখেছি। আজ তাঁকে কলেজ স্ট্রীটে ফুটপাতে দেখছি। আমার লজ্জা করে। একদিন যাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়েছিলাম, আজ তাঁর সামনে কোন্ গৌরবে দাঁড়াব?

জান, আমার ছেলেটা অনেক বড় হয়ে গেছে। দেখলে চিনতে পারবে না। তুমিও কিরকম গম্ভীর হয়েছ। শুধু আমিই বোধহয় দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্ছি। হাসলেন। তাঁকে অপরূপ দেখাল।

সাদা শাড়ি, সাদা জামা আর রোগা একটা মুখ। চিন্তা করে দেখলাম প্রথম থেকে এই সাদা রঙটা তাঁর স্মৃতি ঘিরে আছে। চিরজীবন এই বৈধব্যের রঙ অঙ্গে বহন করেই যদি বাঁচবেন, জীবন থেকে নতুন করে কিছুই যদি না পাওয়ার থাকে, নিজের মনে কোনো রঙই যদি না ধরল—তবে কেন এই তপস্বিনীর ব্রত? আর, আবার মনে পড়ল পরের জন্য বাঁচা কি দায়। কারণ নিজের জন্য বেঁচে থাকার ভারই যে আমি অনেক সময় বইতে পারি না।

আমার মধ্যে একটা নিষ্ঠুরতা এল। বললাম, ক্লাসের প্রজাপতি সহপাঠিনীদের কেমন লাগছে?

হাসলেন। বললেন, আমার সঙ্গে তো বিশেষ আলাপ নেই। ওদের দেখে অতীতকে খুঁজে পাই।

শিউরে উঠলাম। বন্ধু নেই। রোজ যেখানে আসতে হয়, থাকতে হয়, প্রতিমুহূর্তে যেখানে প্রাণ উত্তাল—সেইখানে বসে কি করে ভুলবেন তাঁর জীবন অন্ত। অজস্র উজ্জ্বল আর অন্ধকার স্মৃতিভরা একটা জীবন। মহত্বের বোঝা বওয়া একটা জীবন।

আর আমার হঠাৎ অদ্ভুত লাগল। যে নাম ইতিহাসের, যে নাম এখনও শহরে-গাঁয়ে মানুষকে জাগায়—কলেজ ষ্ট্রীটের ফুটপাতে কটা বই হাতে সেই-তিনি রোগা একটা মুখে সাধারণ ঢুটো চোখে দাঁড়িয়ে। কেউ জানে না। আমিও ভুলে যাই।

আর জীবনের প্রতি আমাদের অভিমান কত প্রবল। আর জীবনের প্রতি আমাদের দাবি কত বেশি। আর আদর্শের সঙ্গে বাস্তবতার যে কোনো সংঘাতে আমরা কি সহজে হতাশ হই, বিষণ্ণ হই, একা হই। আর যে সত্যকে ধ্রুব বলে জেনেছিলাম, আজও জানি, তা ফুল হয়ে না ফুটলে কত তাড়াতাড়ি আমরা অধৈর্য হয়ে গোটা বসন্তকে অস্বীকার করি। নিজের কাছেই নিজে একটা সমস্যা হই।

অথচ বলেছিলাম বাঁচতে হবে। আর ফুল দিয়েছিলাম। হায়রে, তখন কি জানতাম সময়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কোন, অসতর্ক মুহূর্তে সময়েরই শিকার হয়ে যাচ্ছি?

এই নাও ঠিকানাটা। যেও কিন্তু একদিন।

ঠিকানা হাতে তারপর আমি তাঁর ধীর এবং ঢুর্বল পদক্ষেপ দেখতে দেখতে ভাবলাম, আমারও তো পালাবার পথ নেই। আমাকেও তো সমস্ত হতাশা গ্লানি এবং নৈরাজ্যের ভেতর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে।

চোখের সামনে একটি হলুদ ফুলকে আমি পাতা নাড়তে দেখলাম। আমি একটি ফুল দেখলাম।

ছয়

সেই যুবকটি বিয়ে করল। উৎসবে আত্মীয়-বন্ধু-সহকর্মীদের ভীড়। সব শেষে তিনি এলেন। আর যুবক স্তব্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করল নদীর ঢুপারে শাল... যাঁর স্মৃতি ঘিরে আছে, তাঁর শাড়ির গায়ে এতদিনে সবুজ সুতোর ফুল উঠেছে...



"কী ব্যাপার, তুমি এসে দাঁড়িয়ে আছ?"

"হুঁ"

"কতক্ষণ?"

"এই আধঘণ্টা—" পঁয়তাল্লিশ মিনিটটা আর বলতে ইচ্ছে করল না।

"তোমার না কথা ছিল সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে আসার?" উমা কলেজ ষ্ট্রিট-হ্যারিসন রোডের মোড়ের সবকিছুকে ছটফট করে দেখল। এখন ওকে চমতে না-বললেও চলবে না।

"আজ অমিতাভ-সুরেনদের সঙ্গে দেখা হয় নি?" উমা খেয়াল করে নি ওর আগের কথার জবাব পায় নি। উমা যেন একটু সেজেছে মনে হচ্ছে,

ব্লাউজের হাতাটা কি একটু ছোট ? নাকি আঁচলটার সবটুকু কাঁধে [illegible] বলে এ-রকম মনে হচ্ছে ? শাড়ির রংটা অবিশ্যি ভালো। বোধহয় উমা পাট করে চুল আঁচড়েছে—দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।—বাঁ দিকে তাকিয়ে আছে, দীপক উমার ডান দিকে। এতক্ষণের ঔদাস্য উমাকে ভালোভাবে দেখবার ইচ্ছায় কেটে গেল। এক-পা এগিয়ে গেল। উমা টের পেয়েই মুখ ঘোরালো বোধহয়। নেহাতই অপ্রাসঙ্গিক হেসে বলল—"এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল ?" উমা এবারও খেয়াল করে নি, আগের কথাটার জবাব সে পায় নি। উমা মুখ ঘুরিয়ে নিল। তাহলে উমা সেজেছে নিশ্চয়ই, ওর চোখে যেন তেমনি লজ্জা। সেজেগুজে সুন্দরী হয়ে একজনের দিকে তাকিয়ে মেয়েরা হাসে। বরানগর থেকে বাসে আসতে-আসতেও উমা হাসিটা মনে রেখেছে। "কিছু বলল না—?" উমা এত অন্যমনস্ক কেন। আমার কি উচিত ওর পোশাকের প্রশংসা করা। আর এক-পা সামনে গেল। উমা কোনাকুনি তাকিয়ে আছে। 'কী ব্যাপার, আজ এত সেজেছ [illegible] বলতে গিয়ে দীপক দেখল বাসনের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক যুবক উমাকে পেছন থেকে দেখছে। উমা হঠাৎ দু পা সরে গিয়ে, হাত [illegible] টান দিল দীপকের। একটা লোহার লম্বা শিক ভর্তি ঠেলা। ভাঙা-দালানের আস্তর-খসে-পড়া শিক। নতুন দেয়ালের শেষ দিকের বাড়িয়ে রাখা শিক। বাড়ির ছাতে ত্রিশূলের মতো কী রকম সব শিক পোঁতা থাকে, তাতে নাকি বাজ পড়ে না। উমা বাস থেকে নেমে এটুকু সময় দীপককে দিয়েছে। এক, হয় উমা আজ সবার সঙ্গে আড্ডাতে চাইছে, দুই, নয় উমা আজ আমার কাছে একা একা খুব একা-একা মেয়ে হতে চাইছে। উমার চাওয়াটা বুঝতে হবে। উমা যা চাইবে, দীপক তাই করবে।

"কফি-হাউসে যাবে নাকি একবার ?" যে-হাসি মিশিয়ে দীপক কথাটা বলবে ভেবেছিল, কথাটা শোনার পর যখন উমা মুখ ফেরাল, তখন হাসি হাসতে পারল।

"কি হল তোমার ? আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কফি-হাউস যাব কিনা ?"

"আজ ছুটোর সময় এ-পাড়ায় এসেছি, আমার শেষ ঘণ্টায় ক্লাস ছিল না। একা-একা কফি-হাউসে বসে ছিলাম, ভীষণ ঘুম পেল, তারপর থেকে মেজাজ খিঁচড়ে গেল। চা-খাওয়ার জন্য নিচে নেমে, পরে গিয়ে দেখি বসবার জায়গা নেই, ওরা কেউ আসে নি, তোমার জন্য সেই", এই-যে উমা, আমি, [illegible]

বলছি, তুমি তো আমাকে ভালোবাস, তোমাকে আমার-সব বলা উচিত। অনেক কিছু-ই তো—

"ও হো-হো, সেই কারণে বাবুর এমন মুখ শুকনো। তাই বলি, তুমি আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছ, এমন দুর্ঘটনাও ঘটে। চল।"

"কোথায় ?"

"ময়দানে, আমাদের সেই জায়গাটায়।"

"ময়দানের কোন্ জায়গাটা আবার তোমাদের হল ?" উমার পাশে হাঁটা শুরু করতেই দীপক খুশি মনে করল নিজেকে, তারপর ঘাড় বেঁকিয়ে কথাটা বলতে পেরে নিজেকে প্রেমিক মনে হল। ময়দানের বাসে চড়বার জায়গায় যেতেই থমকে গেল দীপক—ময়দানে সে যাবে না, "শোন, চল ঐ চায়ের দোকানে একটু বসি।"

"মাথা খারাপ ! ঐ চায়ের দোকানে ? যে-ভ্যাপসা গরম !"

"এক-কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছিল।"

"ভাঁড়ে খাব।"

"এস, ওঠ" উমা ডাকল। এগিয়ে গেল। উমার হাতধরে আটকাল দীপক। এক বুড়ো ভদ্রলোক দেখলেন: একটি মেয়ের হাত ধরে একটি ছেলে আটকাল। এক যুবক দেখল: হাত ধরে ডাকায় একটি মেয়ে খুশি হয়ে যুবকের দিকে তাকিয়ে আছে। এখন দীপকের হাসা উচিত, ছেলেমানুষি করা—তার চ্যাংড়ামি আর 'ব্যক্তিত্ব'ই-না উমাকে টেনেছে।

"প্লিজ লেডি একঠো সিগারেট পিয়েগা।"

"সে-জন্য ট্রাম ছেড়ে দিয়ে আমাকে সবার সামনে টানাটানি করছ।"

"ডী-ফেমেশন কেস আনবে নাকি ? দাও পয়সা দাও।"

"না।"

"রোজ রোজ প্রেম করব, পয়সা দেবে না ?"

"এত খারাপ-না তোমার মুখ ?"

"পয়সা দাও, নইলে আরো মুখ খারাপ করব—"

"কর"

"তা কি আর বুঝি নি ? ইচ্ছে করে আমার কাছ থেকে যত সব খিস্তি-খাস্তা শুনে একটু মজা লুটবে !" রসিকতা হল না।

"কী হচ্ছে !"

"যা হচ্ছে, তাই-ই হচ্ছে—পয়সা দাও"—

হাতের ছোট-ব্যাগটাই দিয়ে দিল দীপককে। দীপক তা থেকে পয়সা বের করতে-করতে বলল, "এস", ভাবল—এটা কী পাগলামি হল? উমা কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে, আমি কী ঠাট্টা করতে পারলাম না? "ক্যাপস্টান" —এখন কী করে ময়দানে যাওয়া বন্ধ করা যায়। এক হতে পারে, উমা রাগ করেছে এবং এখন উমাকে যা-বলা যাবে, তাই করবে—পরে এক সময় শোধ তুলবে। নিচু হয়ে দড়ি থেকে সিগারেট জ্বালিয়ে উমার দিকে একটা অর্ধদৃষ্টি দিল। উমা সে-দৃষ্টি না দেখে নিজের দৃষ্টি দেখাতে লাগল: ময়দানের দিকে প্রবাহিত যানবাহনের দিকে তাকিয়ে। আমাদের মধ্যে কি ঝগড়া হল? এই মাত্র? একটুখানি। উমা দেখাতে চাইছে-কি যে ও আমার ওপর রাগ করেছে। যেন তাই হয়। নাকি—এমনি তাকিয়ে আছে? তখন আর-একটু স্পষ্ট ভাবে ঝগড়া করা উচিত ছিল। উমাকে আর একটু রাগাতে হবে। নইলে, ও ময়দানে যাবেই।

"চল" শেয়ালদার দিকে পা বাড়িয়ে দীপক। উমা সোজা দীপকের চোখের দিকে— "আমি ও-চায়ের দোকানে যাব না—তুমি খেয়ে এস, আমি দাঁড়িয়ে আছি।"—দীপক পুলকিত হল।

"এদিক দিয়ে-ও ময়দানে যাবার গাড়ি আছে! চা-খাব না, সিগারেটটা তো শেষ করতে হবে!"

উমা হাঁটতে শুরু করল দীপকের পাশাপাশি। দীপক উমার দিকে তাকাল। নিজেকে প্রেমিক মনে হল। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মৃদু হাসল—যেন খুব মজা করা গেছে। পরমুহূর্তে হাসিটা ... করে ভূরু কোঁচকাল। উমা নীরবে পাশাপাশি হাঁটছে। উমা কি প্রতি মুহূর্তে আশা করছে আমি তার রাগ ভাঙাব। রাগ ভাঙাব—তবে এখন নয়, ময়দানে যাওয়াটা বন্ধ করার পর।

দীপক ময়দানে যেতে ভয় পায়। ময়দান দীপকের মনে নানাবিধ আশা জাগায়। দীপক আশা করতে ভয় পায়। সিনেমা-থিয়েটার দেখতে-দেখতে যেমন নিজেরই নায়ক-নায়িকা হতে ইচ্ছে করে, বা,—একেবারে পাশ-... একটা গাড়ি চলে গেল, গাড়ির পেছনের কাঁচ দিয়ে দীপক দেখল ভদ্রমহিলা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে 'হাসলেন'—উমা-ও তো আমার দিকে তাকিয়ে যে-কোনো মুহূর্তে হাসতে পারে—তবু ঐ হাসি আর এই হাসি কেন

আলাদা-আলাদা মনে হয় ময়দানে গেলে। তাছাড়াও চারপাশে অত রং, অত মানুষ, অত গাড়ি, অত শব্দ, অত অন্ধকার, অত আলো দেখে কেমন দিশ হারিয়ে যায়। তখন আমাদের ইচ্ছে করে একটা বেশ সাংঘাতিক ব্যাপার হোক, উমারও ইচ্ছে করে—ইচ্ছাটা স্পষ্ট করে জানি না, ফলে ছটফট করি—সুতরাং দূরে-দূরে থাকাই ভালো। দীপক কিছু-হতে চেয়ে ছটফটাতে চায় না। পাছে চেয়ে ফেলে এজন্য ভয়।

আমহার্স্ট স্ট্রীট পেরিয়ে দেখল তার পাশে উমা নেই। পেছন ফিরে দেখলো উমা ওপারে দাঁড়িয়ে; অন্যদিকে তাকিয়ে। গাড়ির জন্য রাস্তা পেরোচ্ছে না, এ-পারে দীপককে দাঁড় করিয়ে রেখে উমা নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। বড় হোটেলের বারান্দার বড় টবের গাছের পাতার দিকে দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে রইল দীপক। উমা পাশে এসেছে বুঝতে পেরে আবার হাঁটা শুরু করল।

কিন্তু কোথায় যাবে? কোথায় যাবে উমাকে নিয়ে? একটা চায়ের দোকানে বসলেই সবচেয়ে ভালো হত ঘণ্টাখানেক। তারপর উমা চলে যেত। কিন্তু বসবার দরকার কি? এ-রকম ভাবে কিছুক্ষণ হাঁটার পর উমা চলে যাক বাড়িতে, আমি চলে যাই বাড়িতে।

এ-রকম ভাবে হাঁটার দরকারটাই বা কি? উমা আসে কেন? আমিই বা উমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকি কেন? আমি উমাকে বিয়ে করতে পারব না—এ তো ধ্রুব সত্য। উমার এক দাদা ছিল, একই ভাই, পঁচিশ বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন। উমার অনেকগুলো বোন আছে। উমার বাবা আর বছর দুয়েক পরে রিটায়ার করবেন। উমা ওর বাবার 'বড় ছেলে'। দীপকের মায়ের শক্ত অসুখ—কী তা জানে না দীপক—বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রয়োজন, বিশেষ ওষুধের—সবই কিছু কিছু আনতে হয়। দীপকের দাদা আছেন—তাঁর বিয়ে হয়েছে—একটি ছেলেও, বোন অনেকগুলো, তারা পড়ছে। দীপক বা উমা কারো পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়—এত বড় মোটা একটা ঘটনা বিস্মৃত থেকে আমরা দুজন পথ হাঁটছি কেমন করে? উমা আমার পাশে—আবার কী-হতে চাওয়ার যন্ত্রণা—উমা তুমি কেন আস? আমি ময়দানে যাব না। উমা, তুমি আসবে না।

"আচ্ছা", থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপক "তুমি কেন আস?"

উমা দাঁড়িয়ে পড়ে শুধু চোখ তুলে চাইল? আমি কেন উমার চাইতে

"যা হচ্ছে, তাই-ই হচ্ছে—পয়সা দাও"—

হাতের ছোট-ব্যাগটাই দিয়ে দিল দীপককে। দীপক তা থেকে পয়সা বের করতে-করতে বলল, "এস", ভাবল—এটা কী পাগলামি হল? উমা কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে, আমি কী ঠাট্টা করতে পারলাম না? "ক্যাপস্টান" —এখন কী করে ময়দানে যাওয়া বন্ধ করা যায়। এক হতে পারে, উমা রাগ করেছে এবং এখন উমাকে যা-বলা যাবে, তাই করবে—পরে এক সময় শোধ তুলবে। নিচু হয়ে দড়ি থেকে সিগারেট জ্বালিয়ে উমার দিকে একটা অর্ধদৃষ্টি দিল। উমা সে-দৃষ্টি না দেখে নিজের দৃষ্টি দেখাতে লাগল: ময়দানের দিকে প্রবাহিত যানবাহনের দিকে তাকিয়ে। আমাদের মধ্যে কি ঝগড়া হল? এই মাত্র? একটুখানি। উমা দেখাতে চাইছে-কি যে ও আমার ওপর রাগ করেছে। যেন তাই হয়। নাকি—এমনি তাকিয়ে আছে? তখন আর-একটু স্পষ্ট ভাবে ঝগড়া করা উচিত ছিল। উমাকে আর একটু রাগাতে হবে। নইলে, ও ময়দানে যাবেই।

"চল" শেয়ালদার দিকে পা বাড়িয়ে দীপক। উমা সোজা দীপকের চোখের দিকে— "আমি ও-চায়ের দোকানে যাব না—তুমি খেয়ে এস, আমি দাঁড়িয়ে আছি।"—দীপক পুলকিত হল।

"এদিক দিয়ে-ও ময়দানে যাবার গাড়ি আছে! চা-খাব না, সিগারেটটা তো শেষ করতে হবে!"

উমা হাঁটতে শুরু করল দীপকের পাশাপাশি। দীপক উমার দিকে তাকাল। নিজেকে প্রেমিক মনে হল। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মৃদু হাসল—যেন খুব মজা করা গেছে। পরমুহূর্তে হাসিটা ... করে ভূরু কোঁচকাল। উমা নীরবে পাশাপাশি হাঁটছে। উমা কি প্রতি মুহূর্তে আশা করছে আমি তার রাগ ভাঙাব। রাগ ভাঙাব—তবে এখন নয়, ময়দানে যাওয়াটা বন্ধ করার পর।

দীপক ময়দানে যেতে ভয় পায়। ময়দান দীপকের মনে নানাবিধ আশা জাগায়। দীপক আশা করতে ভয় পায়। সিনেমা-থিয়েটার দেখতে-দেখতে যেমন নিজেরই নায়ক-নায়িকা হতে ইচ্ছে করে, বা,—একেবারে গা-ঘেঁষে একটা গাড়ি চলে গেল, গাড়ির পেছনের কাঁচ দিয়ে দীপক দেখল ভদ্রমহিলা ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে 'হাসলেন'—উমা-ও তো আমার দিকে তাকিয়ে যে-কোনো মুহূর্তে হাসতে পারে—তবু ঐ হাসি আর এই হাসি কেন

আলাদা-আলাদা মনে হয় ময়দানে গেলে। তাছাড়াও চারপাশে অত রং, অত মানুষ, অত গাড়ি, অত শব্দ, অত অন্ধকার, অত আলো দেখে কেমন দিশ হারিয়ে যায়। তখন আমাদের ইচ্ছে করে একটা বেশ সাংঘাতিক ব্যাপার হোক, উমারও ইচ্ছে করে—ইচ্ছাটা স্পষ্ট করে জানি না, ফলে ছটফট করি—সুতরাং দূরে-দূরে থাকাই ভালো। দীপক কিছু-হতে চেয়ে ছটফটাতে চায় না। পাছে চেয়ে ফেলে এজন্য ভয়।

আমহার্স্ট স্ট্রীট পেরিয়ে দেখল তার পাশে উমা নেই। পেছন ফিরে দেখলো উমা ওপারে দাঁড়িয়ে; অন্যদিকে তাকিয়ে। গাড়ির জন্য রাস্তা পেরোচ্ছে না, এ-পারে দীপককে দাঁড় করিয়ে রেখে উমা নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। বড় হোটেলের বারান্দার বড় টবের গাছের পাতার দিকে দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে রইল দীপক। উমা পাশে এসেছে বুঝতে পেরে আবার হাঁটা শুরু করল।

কিন্তু কোথায় যাবে? কোথায় যাবে উমাকে নিয়ে? একটা চায়ের দোকানে বসলেই সবচেয়ে ভালো হত ঘণ্টাখানেক। তারপর উমা চলে যেত। কিন্তু বসবার দরকার কি? এ-রকম ভাবে কিছুক্ষণ হাঁটার পর উমা চলে যাক বাড়িতে, আমি চলে যাই বাড়িতে।

এ-রকম ভাবে হাঁটার দরকারটাই বা কি? উমা আসে কেন? আমিই বা উমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকি কেন? আমি উমাকে বিয়ে করতে পারব না—এ তো ধ্রুব সত্য। উমার এক দাদা ছিল, একই ভাই, পঁচিশ বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন। উমার অনেকগুলো বোন আছে। উমার বাবা আর বছর ছয়েক পরে রিটায়ার করবেন। উমা ওর বাবার 'বড় ছেলে'। দীপকের মায়ের শক্ত অসুখ—কী তা জানে না দীপক—বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রয়োজন, বিশেষ ওষুধের—সবই কিছু কিছু আনতে হয়। দীপকের দাদা আছেন—তাঁর বিয়ে হয়েছে—একটি ছেলেও, বোন অনেকগুলো, তারা পড়ছে। দীপক বা উমা কারো পক্ষে বিয়ে করা সম্ভব নয়—এত বড় মোটা একটা ঘটনা বিস্মৃত থেকে আমরা দুজন পথ হাঁটছি কেমন করে? উমা আমার পাশে—আবার কী-হতে চাওয়ার যন্ত্রণা—উমা তুমি কেন আস? আমি ময়দানে যাব না। উমা, তুমি আসবে না।

"আচ্ছা", থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপক "তুমি কেন আস?"

উমা দাঁড়িয়ে পড়ে শুধু চোখ তুলে চাইল? আমি কেন উমার চাইতে

লম্বা ? নইলে কি উমা এমন করে তাকাতে পারত, যা দেখেই আমার ইচ্ছে করে ওর মাথায় হাত বোলাতে। দীপক চোখটা সরিয়ে নিল দাঁড়িয়ে থেকেই। দৃষ্টিটা ছটফটিয়ে সে বলল—"তোমারই বা দোষ কি? দুটো থেকে কেমন একা-একা ঘুরছি, কোথাও যেতে ইচ্ছে করছিল না, কী দুঃখ যে লাগে না, অনেকক্ষণ একলা-একলা হাঁটলাম—তারপর বাস স্টপে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম এক-ঘণ্টা—"

"এক ঘণ্টা ?"

"আধ ঘণ্টাও হতে পারে, চব্বিশ ঘণ্টাও হতে পারে," শুকনো ঠোঁটে হাসল দীপক, উমা নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে—প্রতিমার চোখের মতো উমার চোখ, উমার ভুরুটা মাঝে মাঝে কাঁপে—উমার ভুরুর মতো প্রতিমার ভুরু নয়, "তাতে কিছু এসে যায় না, আমি তো না-দাঁড়িয়ে পারি নি।" উমা ঠোঁট ফাঁক করেছে, সম্মুখের দাঁতের সামান্য আভাস—কিছু বলবে বোধ হয়, না, এ সময় উমা কিছু বলে না। "উমা, তুমি না আসতে পারলে এস না, আমি অভ্যেস করে নেব।" "অ্যাঁ!"—উমা ধ্বনিটা উচ্চারণ করল, একজন লোক যেতে-যেতে অন্যমনস্কতার ভাণে উমার পিঠে এক ধাক্কা দিল, উমার ঠোঁট একেবারে ফাঁক হয়ে গেল। সে ঘাড় ঘুরিয়ে লোকটাকে দেখল, তারপর দীপককে। দুই ভুরুর মাঝখানে দু-একটা রেখা তৈরি হয় আর মুছে যায়—এমন অসহায় উমা! উমা! দীপক হাত বাড়িয়ে উমার কনুই ধরে বলল "চল"—উমা মাথা নিচে নামিয়ে চলতে শুরু করল। উমা ভুলে গেছে সে সেজেছে। দীপক দু-পা হেঁটে ভাবে লোকটার ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমিও তাড়াতাড়ি দৌড়ে পালিয়ে যেতাম, উমা কি আর জীবনে কখনো আমার সঙ্গে দেখা করত? কী কেন দৌড় দিলাম না? উমাকে এখন আমার কিছু বলা উচিত। কী বলব ?

"উমা"

"উঁ"

"আমি ময়দানে যাব না"

"না-গেলে। চল কোথাও বসি"

"কোথায় বসি ?"

"তুমি চা খাবে বলেছিলে"

"দোকানে বসতে তো তোমার ভালো লাগে না"

"না, ভালো লাগে"

"আচ্ছা, আমাদের যখন একটা বসবারও জায়গা নেই, সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি বসে থাকলে কি হয়"

"তোমার কি হয়েছে বল তো"

"কেন"

"আবার বোধহয় অসুখটা হয়েছে"

"কার"

"তোমার, আবার কার"

"ও, তুম অসুখ বল কেন"—

"অসুখ ছাড়া কি ? সাতদিন বেশ চলল, তারপরই তোমার অসুখ—উমা তুমি এস না, কী হবে এসে, আমার ভালো লাগে না—যত সব অলক্ষুনে কথা—"

সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখল দীপক। তারপর লোকজন, একটা মেয়েকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। এক ছবির দোকানে মা-মা গোছের এক ভদ্রমহিলার বড় ছবি—চোখে চশমা, শাড়ির পাড়টা চমৎকার—

"আমার তো মনে হয়, ঐ সাতদিন—আমরা স্বাভাবিক ব্যাপারটা ভুলে থাকি—"

"কী সে স্বাভাবিক ব্যাপার ?"

"সব কিছুর অর্থহীনতা"—অতি আস্তে বলল দীপক।

"আচ্ছা, যদি আমাদের ইয়েটা এত অস্বাভাবিকই হবে, তবে আমরা একদিন দেখা না-হলে অস্থির হই কেন ?"

"সেটাই তো অসুস্থতা, যখন বুঝছ, রোজ, দেখা হলেও কোনো নিষ্পত্তি নেই, তখনো রোজ দেখা করার ইচ্ছা—"

"নিষ্পত্তি আবার কি ?"

"তোমার মাথা !"

শেয়ালদার মোড়ে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। মোড়টা কাদা-কাদা। মিষ্টির দোকান, চশমার দোকান, সাইকেলের দোকান, ফলের দোকান। চারপাশের মানুষের স্রোতে বোঝা যাচ্ছিল না ওরা দাঁড়িয়ে আছে।

"কী করবে এখন ?" উমার জিজ্ঞাসা।

"আপাতত একটা সিগারেট খাব"

"আর কিছু করার নেই বলে ?"

দীপক পকেট থেকে উমার ব্যাগটা বের করে পয়সা ঢালল। "এক প্যাকেট নিয়ে এসো না কেন ? তবে তো আর বারবার থামতে হবে না।"

ব্যাগটা উমার হাতে দিতে-দিতে—"তখন থামলে তো আর সিগারেট কেনার ছুতো থাকবে না।" লোকজনের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যই যেন সরে দাঁড়াল উমা। দড়ি থেকে আগুন ধরিয়ে উঠেই দীপকের নজরে পড়ল শেয়ালদার ঘড়ি।

"এক কাজ করি চল"

"কি কাজ ?"

"শেয়ালদায় ছুটো প্লাটফর্ম টিকিট কিনে ভেতরে গিয়ে বসি"

যেন খুব মজা পেয়েছ উমা—"যাঃ"

"হ্যাঁ, চল না"

"কিছু বলবে না! তো ?"

"কী বলবে ?"

গাড়ি ঘোড়ার জন্য থেমে থেমে ওরা রাস্তা পার হল। শেয়ালদার পাড়ে গিয়ে কাদা থেকে বাঁচবার জন্য সাবধানে পা ফেলে ফেলে গেট দিয়ে ঢুকল। "কী রকম লাগে না!" উমা দীপকের দিকে চাইল, "কোথাও যাচ্ছি না, অথচ ইষ্টিশনে এসেছি।" দীপক উমার দিকে তাকিয়ে দেখল উমার চেহারা বদলে গেছে। স্টেশনের আলোগুলোর রঙের জন্য। "এত কম লোকজন কেন ?" উমা জিজ্ঞাসা করল। "কাছাকাছি বোধহয় কোনো বড় গাড়ি নেই।" শেডে ঢুকতেই উমা কেমন বদলে গেল। দু-পাশে উদ্বাস্তদের সংসার, মাঝখানে সরু একফালি রাস্তা। "ঈস।"

"কি হল ?"

"কী-রকম লাগে দেখতে!" এক বৃদ্ধ মাদুরের ওপর দাঁড়িয়ে একদিকে তাকিয়ে পিঠ চুলকাচ্ছে।

"পাঁচ মিনিট উদ্বাস্তদের জন্য দুঃখপ্রকাশ।"

"সব তাতেই তোমার বেশি বেশি।" উমা থামল। "গান গাইছে কে ? এখানে ?" এগিয়ে দীপকও থেমেছিল। সে বলল "কেন এখানে গান গাওয়া বারণ নাকি ?"

"চল না শুনি।"

"না" দীপক এগল, পিছু-পিছু উমা। কাউণ্টারের সম্মুখে দুটি ছেলেমেয়ে বাঘবন্দী খেলছে। দীপক উমাকে দেখাবার ইচ্ছেটা দমন করে উমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে টিকিট কিনতে গেল। উমা চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল—একজন লোক দু-হাত ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে, তার বৌ পাশে শুয়ে চোখ খুলে, লোকটার একটা হাত উল্টো হয়ে বৌটার গলায় পড়েছে। পড়ে আছে। এক বুড়ি পান চিবুচ্ছে। এক মায়ের পায়ের ওপর বসে বাচ্চা মা ঝিমুচ্ছে। কোথায় যেন গান হচ্ছে। কোলাপসিবল্ গেটের মধ্যে ইস্টেশনের ভেতরটায় চাইল। দীপক এসে বলল "চল" "কোথায় ? দিল্লী আজমীর, কানপুর এলাহাবাদ, কাশ্মীর, অমরনাথ, পেশোয়ার, পাঞ্জাব, কন্যাকুমারী, রামেশ্বর, পুরী, আর, কোথাকার সমুদ্র যেন—" লোহার গেটে টিকিট, প্রায় শূন্য প্ল্যাটফর্ম, গলিয়ে গেল ভেতরে উমা,—ছড়িয়ে দিল নিজেকে উমা, গুটিয়ে নিল নিজেকে দীপক, দেখবে বলে এসেছে যেন, উমাকে দেখবে বলে এসেছে যেন, "এই, দীপু, শোন, কী-যেন সেই জায়গার নাম, মাদ্রাজী নাম, আর, কোথায় যাবে, দু নম্বরে, না, চল যেটা সামনে সেটাতে যাই, না, এটা দিয়ে গেলে একেবারে শেষে ফাঁকায় তো ? এটাতেই চল" উমার পিছু পিছু এ-ধার ওধার সেধার করে অবশেষে তারই ইচ্ছেমতো একটাতে প্রবেশ করল দীপক, "শোন, পাশে এস, আর, সত্যি, তোমার টেস্টই আলাদা, কিসের ময়দান ? চারপাশে ভিড়, কী সুন্দর, আমরা প্রত্যেকদিন এখানে আসব, অ্যাঁ, আচ্ছা, কী যেন নাম জায়গাটার, খুব ভালো সমুদ্র, পুরী না, ওয়ালটেয়ার না, কী পুরম্, ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, মহাবলিপুরম্, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, এই কুলি, দেখ না, একটু কুলির পেছনে, এই কুলি, আচ্ছা এখানে ধর্মশালা কোথায় ? ও, আচ্ছা, টাঙা, ঘোড়া, উট, ঈস, কী মজা, আমরা রোজ এখানে আসব।"

দীপক একটু বোকা-বোকা হয়ে গেল। সে যাকে ফাঁকি দেবার জন্য ময়দানে না গিয়ে এখানে এসেছে, তাকেই এখানে দেখতে পেল যেন। পাছে সে কিছু বলে ফেলে এই ভয়ে দীপক সিগারেট দিল মুখে। তবু বলে ফেলল, "জান, কয়েকগজ দূরে কলকাতা শহর।"

"তাতে কি হয়েছে!"

"সেখানে রাস্তায় তুমি ভয় পাও।"

"এখন তো আর রাস্তায় নেই।"

"তাহলে তো পালানো হল।"

"হল একটু পালানো!"

"তবে আমি যখন বলি আমাদের কোনোরকম ভবিষ্যতের কথা না-ভেবে জীবনযাপন করা উচিত—তখন যে বড় বলা হয় জীবন থেকে পালাচ্ছি। জান উমা, আমার না ইচ্ছে করতে সবচেয়ে ভয় করে।" একটা বেঞ্চির সামনে দাঁড়িয়ে বলল দীপক। "এস, এখানে একটু বসা যাক।"

"না, ঐ দূরের বেঞ্চটাতে।"

"কোনো মানে হয়, একদিন যদি তোমার সঙ্গে দেখা না-হয় প্রায় পাগল হয়ে যাবার যোগাড়, অথচ প্রতিদিনের দেখার শেষে, আর একটা দিনের কথা ভাবার মতো রসদ নেই।"

"তা-ও তো রোজ দেখা হচ্ছে—এটুকুও যদি না-থাকত আমরা বাঁচতাম কি নিয়ে?"

"কিছু না-নিয়ে স্বচ্ছন্দে বাঁচা যায়, বুঝলে, আধখানা নিয়ে বাঁচা যায় না।"

"মা কি রকম আছেন?"

"সামনের মাসে রে দিতে হবে।"

"তবে তো আবার খরচা।"

"বৌদির বোধহয় বাচ্চা হবে।"

উমা মৃদু সলজ্জ হাসি হাসল—চোখ তুলে নামিয়ে। "তাতে তোমার আপত্তি আছে নাকি? এটাতে বসব না, চল ওই ব্রিজ পর্যন্ত হাঁটি।"

"আচ্ছা বাচ্চাদের দেখতে তোমার কখন্ সবচেয়ে ভালো লাগে?"

"তা দিয়ে তোমার দরকার?"

"উমা, আমার কিছু ভালো লাগে না।"

"সেই সেকেলে কথা।"

"ও-রকম মাসী-মাসী কথা বল না তো। আমি ময়দানে যাই না কেন তোমাকে নিয়ে, জান?"

"না। এস, বসি।"

বসলো দুজন। দীপকের মুখে আলো এসে পড়েছিল। সে অল্প পাশে সরে গেল, আলোটা উমার মুখে পড়ল। উমা হেসে ফেলে মুখ ঘোরাল।

"তোমার মাথা না সত্যি একটু খারাপ।"

"যাতে খারাপ না-হয় সেজন্যই তো ময়দানে যাই না, ময়দানে গেলেই কত কী হতে ইচ্ছে করে।"

ওরা ইষ্টিশানের দিকে পেছন ফিরে সমুখের বিস্তারিত অস্পষ্টতার দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। বুঝেছিল পেছনে একটা বিরাট ফাঁকা চত্বর, ইষ্টিশনের আলোর রং আলাদা; কাকে ফাঁকি দিতে ময়দান ছেড়ে এখানে এসেছে বোকা দীপক? দীপক পাশে চাইল, উমার দিকে। উমার গালের ওপর চুল। হঠাৎ ভীষণ বিরক্তিকর ঠেকে। এখন ইচ্ছে করছে হাত ধরার, তারপর ইচ্ছে করবে চুমু খেতে, চুমু খেতে না পারার জন্য দু জনের মুখ বারবার দু জনের কাছাকাছি এসে ফিরে যাবে, শরীর বেষ্টন করার ইচ্ছেও হবে। অবশেষে এতগুলো ইচ্ছা বহন করে বাড়ি ফেরা, বাড়িতে মা-বাবা-দাদা-বৌদি-বোন—।

"কাল এস না।"

"কেন।"

"আমি আসব না।"

"কেন?"

"কাজ আছে।"

"কেন?"

"কাজ আছে বলছি, আবার কেন কোথায় কি?"

"সব কথায় অত বিরক্ত হও কেন, ভালোভাবে দুটো কথা বললে কী এমন ক্ষতি হয়?"

কোনো জবাব না-দিয়ে দীপক আর একটা সিগারেট ধরাল। দেশলাইয়ের কাঠিটা ফেলে দেবার আগে সেই আলোতে একবার উমাকে দেখল, উমা যেন কিছু ভাবছে।

"শোন" বলে উমা তার ব্যাগের ওপর হাত রাখতে গিয়ে, রাখল দীপকের হাতের ওপর। দীপক হাতের স্পর্শে সুখবোধ করল ও ভাবল এই শুরু হল। উমা—"আজকে তোমাকে একটা কথা বলবো ভেবেছিলাম।" "বল" দীপক উমার দিকে মুখ না ফিরিয়ে বলল। "আমাদের বিয়ে করা দরকার।"

"সেকি?" চমকে এমনভাবে ফিরল দীপক যে প্রায় উমার ঘাড়ে এসে পড়ল। উমা দীপকের চোখের দিকে তাকিয়েই কথা শুরু করল, "তা তুমিই তো বল এভাবে চলে না" চোখের পাতা নেমে গেল উমার—"অবস্থা

তো আর হঠাৎ করে বদলাবে না, আর মনের দিক থেকেও বোধ হয় এখন—গত ছ-সাত বছর তো এ রকমই আছি।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি ? আমরা যে-রকম আছি, সে রকমই থাকব, আমি আমার বাড়িতে তুমি তোমার বাড়িতে। কিন্তু দরকার হলেই আমি তোমার কাছে যেতে পারব, তুমি আমার কাছে আসতে পারবে। এত একা-একা বোধ হবে না। তারপর একটা কিছু হবেই।" খুব সন্তর্পণে উমা দীপকের একটা আঙুল ছুঁয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল। দীপক চুপ করে থাকল। "চুপ করে আছ যে ?"

"ভাবছি"

"ভাবাভাবির কিছু নেই, তুমি রেজিষ্টার-এর কাছে খবর নিও, নাকি ওটাও আমাকে করতে হবে ?" একটু রসিকতার আমেজ আনল উমা। "না, ওটুকু আমারই করা ভালো—"

কিছুক্ষণ পর ওরা উঠল। দুজনই দুজনকে লুকিয়ে দুজনের দিকে চাইছিল মাঝে মাঝে। দীপক দেখল উমা উজ্জ্বল, সেকি ইষ্টিশনের আলোর জন্য ? তবে তো আমিও উজ্জ্বল। ভেবেই লজ্জা পেল। সামনে ফাঁকা লম্বা বিরাট প্লাটফর্ম। দীপক চোখ আধখানা বুঁজে ভাবতে চেষ্টা করল—কত পথ, কত পথ, কত, ইচ্ছার পর ইচ্ছা। কিছু একটা বলার জন্যই যেন দীপক বলল—

"ময়দানে গেলাম না, আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে, আর তুমি হিমালয় পর্বত চাপিয়ে দিলে মাথার ওপর—"

উমা কোনো জবাব দিল না। কোনো জবাব না। দীপক মনে মনে শুনতে পেল তার বাক্যের শেষাংশই উমা প্রত্যুত্তরে বলল। কয়েকমুহূর্ত পর ওদের নিজেদের জুতোর আওয়াজ নিজেদের কাছেই বিচ্ছিরি শোনাতে দু জনই একসঙ্গে পরস্পরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে-ই হেসে ফেলল। সেই হাসির মুহূর্তে দীপক লক্ষ্য করল—উমার পরণে বাসন্তীরঙের শাড়ি (দীপকের প্রিয় রঙ), গায়ে নতুন-নতুন সবুজ ব্লাউজ, হাতাটাও নতুন নতুন। সে উমাকে মনে পড়িয়ে দিল সে সেজেছে—"আজ এত সেজেছ কেন ?" উমা গলা হেলিয়ে, মুখ তুলে বলল—"তোমাকে আজ কথাটা বলব বলে।"

স্রোত

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যখন যেখানে যাই অবিরল
মুহূর্ত ভাঙার শব্দ হয়
অবিরল মুহূর্ত ভাঙার শব্দ হয়।

নত মুখে চলে যায় এ পথে সে পথে কত শরীরের ভিতরে মানুষ
কেউ কারো মুখের দিকে স্পষ্টতঃ তাকায় না
মৃত ভিখারীর হাত তবু অমরত্ব যাজ্ঞা করে।

কে ঐ একলা শয়ান অন্ধকার ঘরে ?
দুর্বল স্থাপত্য, ভাঙা কারুকার্য করা ক্ষীণ দেহ ;
এ ঘরে রোদ্দুর নেই, তবু এক চকচকে আয়না
রাখা আছে, শিল্পের বিনাশ নেই—এ দৃঢ় প্রত্যয়
বুকে নিয়ে—প্রণয় সমাপ্ত করে ঘুমন্ত নিতান্ত ক্লান্ত
মেয়েটির পাশে
একা জেগে তৎক্ষণাৎ ঐ যুবক কোন কোন দিন
আঙুলে কলম নিয়ে কাব্যের রহস্যে ডুব দেয়।

মায়াবী দর্পনে যেন ভেসে থাকে শরীরের বিহ্বল বিষাদ
জলন্ত যৌবনে ঘিরে রমণীটি দ্বারে করাঘাত করে
আহা বড় ভয় হয়, যদি ব্যর্থ হয় এই যুবকের
অনন্তকালের প্রতি ব্যাকুল হাতছানি
যদি ওর শরীরের মাল্যখানি ধুলায় লুটায়।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

অলৌকিক

অন্ধকারে ফিরে গেছ প্রাগৈতিহাসিক সেই বিপন্ন বিবর।
এদিকে ফিরাব মুখ ?…নিরুপায়, শর্তহীন, বাঁকানো ধীবর
সহস্রাক্ষ জাল ছুঁড়ে তুলে আনে নির্বিকার—রাতের রুপালি,
উৎসব, রমণী, কীর্তি…কণ্ঠের চিৎকার ; রক্তে রক্তে ভিজে যায় বালি।

এইমতো মাঠে, রৌদ্রে খুলে রাখি নীলিমার চোখের আদর
যাবোনাক' প্রতিধ্বনি, উঁচু-উঁচু খিলানের শীতে, কক্ষে, ঘুরানো নগর।
যেখানে অজ্ঞাতবাস ঠাকুমার মতো খুব ঠাণ্ডা এক দুপুরের
গল্পের সোনালি…
উড়ায় অঘ্রাণ-চৈত্রে, সেইখানে জাগরণে…উড়োপাতা, আমার ভোরালি।

তারাপদ রায়

সমুদ্র ও জ্যোতিষী

জনৈক জ্যোতিষী তাকে বলেছিল, 'তুমি কোনদিন
সমুদ্রে যাবে না' ;…তিমি কিংবা হাঙরের সাথে দেখা
তোমার হবে না কোনদিন। এ সরল কররেখা
কোথাও সমুদ্রযোগ নেই, দ্যাখো, চারিদিক সমতল, ধূসর, মসৃণ।

কোথাও যাবে না তুমি ; এই ঘরে থাকবে চিরকাল,
এই অন্ধকার ঘর বৃষ্টি এলে শীর্ণ কাঁপা হাতে
জানলা টেনে বসে থাকবে, শীতের দুপুরে বারান্দাতে
জবুথবু ম্লান রৌদ্রে, একই ঘর বারান্দা-দেয়াল।

সমুদ্র সমীপে তার গৃহ নয়, বংশে কেউ ছিল না নাবিক।
তবুও কোথায় এক অনির্দেশ দিগন্ত সীমায়
নীল লবনাম্বু রাশি বনরাজি আভাতি বেলায়
সেও খুঁজেছিল তাকে ; স্রোতে কাঁপা ঢেউয়ে দোলা শূন্য চতুর্দিক।

সব ইচ্ছা বহমান, ভাগীরথী মকরবাহিনী
নিশ্চিন্ত নির্দিষ্ট পথে ভেসে গেছে সচ্ছল জোয়ারে ;
নিশ্চল জাহাজ এক সুদূর মন্থর অন্ধকারে
চিররাত্রি চিরদিন চিত্রপটে অদ্যাবধি সমুদ্রগামিনী।

দাম : দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

পরিচয়

